সামাজিক জীবনে পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের (বিধি-বিধান) প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

শামীমা নাছরিন

পিএইচ. ডি গবেষক

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ এপ্রিল ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক জীবনে পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের (বিধি-বিধান) প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া

অধ্যাপক

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পিএইচ. ডি গবেষক

শামীমা নাছরিন

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ এপ্রিল ২০১৯

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের পিএইচ. ডি গবেষক শামীমা নাছরিন কর্তৃক উপস্থাপিত **‘সামাজিক জীবনে পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের (বিধি-বিধান) প্রায়োগিক বিশ্লেষণ’** শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে রচনা সম্পন্ন করেছে। আমি অভিসন্দর্ভটি মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং ভুল-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করেছি।

অভিসন্দর্ভটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে সম্পন্ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণার বিষয়, যেখানে তাঁর শ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

অভিসন্দর্ভটি বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি প্রাপ্তির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়া)
পিএইচ. ডি গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রসঙ্গকথা

অবতরণিকা

প্রথম অধ্যায় : পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ

দ্বিতীয় অধ্যায় : শীলের শ্রেণিবিন্যাসের তত্ত্বালোচনা

তৃতীয় অধ্যায় : পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্ব

চতুর্থ অধ্যায় : শীলচর্চা ও সুফল

পঞ্চম অধ্যায় : মানবতার বিকাশে শীল প্রয়োগ

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গকথা

‘সামাজিক জীবনে পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের (বিধি-বিধান) প্রায়োগিক বিশ্লেষণ’ শিরোনাম শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমি পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. বিমান চন্দ্র বড়ুয়ার নির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধায়নে রচনা করেছি। আমার গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, রূপরেখা প্রণয়ন, তথ্য নির্দেশ, তথ্য পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং বিষয়-বিন্যাস প্রভৃতি গবেষণা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অসীম ধৈর্যসহকারে উপদেশ এবং নির্দেশনা প্রদান করে অভিসন্দর্ভ রচনায় তিনি সার্বিক সহযোগিতা করেছেন গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে। এছাড়া তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকার ফলে সেমিনার আয়োজনসহ অন্যান্য কাজে তাঁর একনিষ্ঠ সহযোগিতা, পরামর্শ এবং আন্তরিক উৎসাহ আমাকে এমন দুরূহ গবেষণাকর্মে একনিষ্ঠ হতে অনুপ্রাণিত করেছে। ফলে আমি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও মনোযোগের সাথে গবেষণা সম্পন্ন করতে পেরেছি। এজন্য প্রথমেই আমি তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতাচিত্তে স্মরণ করি বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক ড. নীরু বড়ুয়া কে। যিনি সবর্দা যেকোনো অবস্থায় থেকে কঠোর শ্রম দিয়ে গবেষণার নানাতথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সার্বিক সহযোগিতা করছেন কখনো বিরক্তি প্রকাশ করেনি। যার ফলে আমার গবেষণাকর্মটি সমাপ্ত করাটা অনেকাংশে সহজ হয়েছে।

এছাড়াও, অভিসন্দর্ভ রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাজ্ঞ ও সুধীজন মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট বিভাগের অনারারি অধ্যাপক ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া, বিভাগের সদ্য অবসারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, বিভাগীয় অধ্যাপক ড. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, অধ্যাপক ড. বেলু রানী বড়ুয়া, সহকারী অধ্যাপক ড. শান্টু বড়ুয়া প্রমুখ। তাঁদের সহযোগিতা ও আন্তরিক অনুপ্রেরণার কথা আমি কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি।

Dhaka University Institutional Repository

আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের প্রভোস্ট ও পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট এর অধ্যাপক ড. নিজামূল হক ভুঁইয়া, রাষ্ট বিজ্ঞানের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আইনুল ইসলাম। যাঁরা আমাকে নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে গবেষণায় সহযোগিতা করেছেন।

আমি আরো কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোজাম্মেল হক, ফার্মেসী বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আমার ভাইয়া শরিফ মো. আনিসুজ্জামান (বর্তমানে Iowa State University of USA তে পিএইচ. ডি গবেষক। তাঁরা গবেষণাকর্মটি সামনে এগিয়ে নিতে এবং সমাপ্ত করণের ক্ষেত্রে নানাভাবে পরামর্শ দিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন।

অভিসন্দর্ভের তথ্যসংগ্রহের জন্য আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতা চিত্তে স্মরণ করছি। বিভাগীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সহযোগিতাও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরন করছি। সকলের উৎসাহ এবং সহযোগিতায় এ অভিসন্দর্ভ সফলভাবে সমাপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি।

পিএইচ. ডি গবেষক

শামীমা নাছরিন

পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

প্রস্তাবনা

পালি সাহিত্যের পরিধি বিশাল ও বিস্তৃত। ব্যাপকতাই পালি সাহিত্যের ক্ষেত্র। পালি সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নাম হলো 'শীল'। শীল বা নৈতিক চরিত্র প্রত্যেক ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'শীল' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো সংকল্প করা, অনুশীলন করা এবং নৈতিক চরিত্রের উন্নতি সাধন করা। অধিকন্তু সৎচরিত্র, সদাচার ইত্যাদি শীলার্থে ব্যাখ্যা করা হয়। শীল বলতে সেই সকল চেতনা এবং মানসিক অবস্থাকে বোঝায় যার দ্বারা কোনো ব্যক্তিপাপময় কর্ম থেকে বিরত হয়ে সুন্দর কর্ম ও সুন্দর বাক্যের অনুশীলনের মাধ্যমে সম্যক মার্গ অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। নৈতিক উন্নতর জীবন যাপনের জন্য শীলের অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে। শীল পালনের মাধ্যমে দেহ ও মনকে পবিত্র বিশুদ্ধ করা যায়। বলা যায়, শীল ব্যতীত চারিত্রিক বিশুদ্ধিতা লাভ পুরোপুরি অসম্ভব। বৌদ্ধধর্মের অনুসারী গৃহী (Laymen), ভিক্ষু (Buddhist monk) এবং ভিক্ষুণী (Buddhist nun) সকলের জন্য শীল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পালি সাহিত্যে শীল নিয়ে বিচ্ছিনভাবে কিছু লেখালেখি হলেও আমার জানামতে, ইতোপূর্বে গভীর বিশ্লেষণপূর্বক কোনোরূপ প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। এ কারণে আমি 'সামাজিক জীবনে পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের (বিধি-বিধান) প্রায়োগিক বিশ্লেষণ' শিরোনামে অভিসন্দর্ভটি রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আলোচ্য বিষয়বস্তু মোট পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভটি বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ে পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছি। যেহেতু অভিসন্দর্ভটি পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীল সম্পর্কিত তথ্যের আলোকে রচিত, সেহেতু পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা আবশ্যক বলেই মনে করি। পালি সাহিত্যের ব্যাপকতা ও প্রসারতা অনেক বেশি বিস্তৃত। সুতরাং পালি সাহিত্যে কোথায় কীভাবে শীলের কথা ও শীল প্রসঙ্গে আলোচনা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করার তাগিদ থেকে প্রথম অধ্যায়ে পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ বিষয়টি সন্নিবেশিত করেছি। পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখেছি, শীলের

Dhaka University Institutional Repository

প্রকারভেদ, শীলের গুরুত্ব, শীলের চর্চা, শীলের সুফল এবং মানবতার বিকাশে শীল প্রভৃতি বিষয়গুলো আমাদের সমাজজীবন ও জাতীয় জীবনে খুবই গুরত্ব বহণ করে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরবর্তী অধ্যায়সমূহে উপরিউক্ত বিষয়াবলি ব্যাখ্যাপূর্বক শীল সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট গাঠনিক রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শীলের স্বরূপ স্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা থেকেই দ্বিতীয় অধ্যায়ে শীলের শ্রেণিবিন্যাসের তত্ত্বালোচনা জরুরী হয়ে পড়ে। কেননা শীল সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করা যায় তা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে। এ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে শীলের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

শীলের প্রকাভেদ হলো পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল, পাতিমোক্খ সংবর শীল, ইন্দ্রিয় সংবর শীল, আজীব পারিসুদ্ধি শীল ও পচ্চয় সন্নিস্সিত শীল। উপরিউক্ত ভাগ গুলো শীলের প্রধান প্রকারভেদ। শীলের প্রকারভেদ যেমন অনেক ঠিক একইভাবে শীল পালন করার একটি ধারাবাহিকতা রয়েছে। যে যতবেশি শীল পালন করবে ততবেশি তাঁর জীবন পরিশুদ্ধ হবে এটাই স্বাভাবিক। তবে ক্ষেত্র বিশেষে শীল পালনকারীর ভিন্নতা রয়েছে। যেমন বৌদ্ধ গৃহীগণ যেসকল শীল পালন করেন তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি শীল কঠোরভাবে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা পালন করেন। যেখানে শীল ভঙ্গে পারাজিকা আপত্তি সংঘটিত হয় এবং পারাজিকা আপত্তির কারণে ভঙ্গকারীকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। এমন নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যার মাধ্যমে শাস্তি ভোগ শেষে আবার সংঘে ফেরত আসার সুযোগ রয়েছে এবং ফেরত আসা সম্ভব হয়। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আমি বলতে চাই পঞ্চশীল পালনকারীর আনুপাতিক সংখ্যা অনেক বেশি। এছাড়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজজীবনে, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জীবনে পঞ্চশীলের ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি সামাজিক গুরুত্ব অনেক বেশি বলেই গণ্য করা হয়। সুতরাং এসকল কথা চিন্তা করে তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্ব নানা আঙ্গিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ব্যবহারিক যে নিয়ম পালনের মাধ্যমে মানুষ উন্নত থেকে উন্নতর জীবন লাভ করতে পারে, সমাজ জীবন সুন্দর হয় এবং পরিবেশ শান্ত থাকে তা শীলের মাধ্যমে হয়ে থাকে। শীলের বহুমাত্রিক গুণাবলী মানবজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। পঞ্চশীলের যেসকল সামাজিক গুরুত্বের আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর সাথে সমন্বয় করে মানবজীবনে শীলেরচর্চা এবং এর সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী ধারণা প্রদান করার প্রধান লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি এবং সেই আলোচনাকে তথ্যবহুল করে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্ব যেভাবে উপস্থাপন করেছি ঠিক একইভাবে শীলের চর্চা ও সুফল আলোচনা করা হয়েছে। শীলের চর্চা এবং শীলের সুফল পাওয়ার কথা আমি চতুর্থ অধ্যায়ে তুলে ধরতে সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। সেই ধারাবাহিকতায় মানবতার বিকাশে শীল কীভাবে প্রয়োগ করে বা ব্যবহার করে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধন করা যায় তা পঞ্চম অধ্যায়ে পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

পরিশেষে, গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল উপস্থাপনপূর্বক অভিসন্দর্ভের উপসংহার টেনেছি এবং সর্বশেষে তথ্যপঞ্জি উপস্থাপন করে অভিসন্দর্ভের উৎস নির্দেশ করেছি।

গবেষণার উৎস

অভিসন্দর্ভ রচনায় প্রাথমিক এবং দ্বৈতীয়িক-দু'ধরনের উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করি। প্রাথমিক উৎস হিসেবে মূলপিটকীয় গ্রন্থসমূহ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। যেহেতু আমার গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করেছি 'সামাজিক জীবনে পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের (বিধি-বিধান) প্রায়োগিক বিশ্লেষণ' সেহেতু মূল ত্রিপিটক (পালি ও বাংলা) কে প্রাথমিক উৎস হিসেবে গণ্য করেছি যেন অভিসন্দর্ভটি যথার্থই সমৃদ্ধ হয়। এছাড়া ত্রিপিটক বর্হিভূত মৌলিক গদ্য গ্রন্থ, যেমন- নেত্তিপকরণ,

Dhaka University Institutional Repository

মিলিন্দপণ্হ, ত্রিপিটকের অট্ঠকথা (পালি ও বাংলা, যেগুলোতে শীল সম্পর্কিত তথ্য রয়েছে), টীকা, যেমন- বিভঙ্গমূলটীকা : বিভঙ্গ এর টীকা, ঐতিহাসিক গ্রন্থ : বংস সাহিত্য, কাব্য গ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র, সাংঘিক বিধি-বিধান ও জীবনী গ্রন্থ ইত্যাদি দ্বিতীয়িক উৎস হিবেবে ব্যবহার করেছি। বিষয়বস্তুর যথার্থ প্রতিপাদনের জন্য দেশে-বিদেশে বিভিন্ন গবেষকের বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থ ও প্রবন্ধ হতেও তথ্য সংগ্রহ করি, যেগুলোকে দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে গণ্য করেছি। এভাবে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহপূর্বক অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি।

প্রত্যাশা

আমার বিশ্বাস অভিসন্দর্ভটি মহামানব বুদ্ধের শীল সম্পর্কিত অমোঘ মহামূল্যবাণ বানী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানবের নৈতিকতার শিক্ষাকে আরো সুদৃঢ় করবে। আমাদের সমাজজীবনে, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে যেনো কোনো কর্মের মধ্যে নৈতিকতার পরাজয় না সংঘটিত হয় সেই আশাবাদ থাকবে। এছাড়া বৌদ্ধ গৃহী ও নির্বাণগামীদের জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন হবে বলে মনে করি। বর্তমান বিশ্বে মানবের নৈতিকতার শিক্ষা ফলপ্রসু হওয়া বেশ জরুরী। সেই প্রত্যাশার যদি কিয়দাংশ সফল হয় তবে আমার পরিশ্রম সার্থক প্রতিপন্ন হবে। ভবিষ্যতে অন্যান্য গবেষকগণ আলোচ্য বিষয়ে আরো বিস্তারিতভাবে গবেষণা করে আমার অভিসন্দর্ভের অপূর্ণতাটুকু এবং প্রত্যাশার কোনো অংশ যদি বাকী রয়ে যায় তা পরিপূর্ণতায় সমৃদ্ধ করবেন সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে অনাগত দিনের এ বিষয়ের গবেষকদের অগ্রিম অভিনন্দন জানিয়ে এখানেই সমাপ্তি টানছি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ

ভূমিকা

পালি সাহিত্যের আলোকে শীলের রূপ-রূপান্তর, সমাজ ও জাতীয়জীবনে শীলের গুরুত্ব ও উপকারিতা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে 'সামাজিক জীবনে পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের (বিধি-বিধান) প্রায়োগিক বিশ্লেষণ' করাই আমার অভিসন্দর্ভের মূল উদ্দেশ্য। অভিসন্দর্ভের আলোচ্য বিষয়ের যথার্থতা প্রতিপন্ন করার জন্য পালি সাহিত্য এবং পালি সাহিত্যকে ভিত্তি করে রচিত অন্যান্য পুস্তকে প্রাপ্ত তথ্য কতটুকু বস্তুনিষ্ঠভাবে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় ইতিহাস ও হৃদয়স্পর্শী হয়ে আমাদের সমাজ, জাতীয়জীবন এবং আর্ন্তজাতিক অঙ্গনকে প্রভাবিত করছে তা নির্ধারণ করা একান্ত আবশ্যক। বিষয়টি পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্পষ্ট করা যায়। তাই এ অধ্যায়ে পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথমে পালি সাহিত্যের বিন্যাসশৈলী সংক্ষিপ্ত করে তুলে ধরে শীলের আলোচনায় প্রবেশ করা হবে। কারণ প্রথম অধ্যায়ের শিরোনামের সাথে সংগতিপূর্ণ বলেই পালি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত বিন্যাসশৈলী দেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।

পালি সাহিত্যের বিন্যাসশৈলী

পালি সাহিত্যের উদ্ভব কাল হলো খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতক। সেই সময় মহামানব গৌতম বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্প ও ভাস্কর্য প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছিল। বুদ্ধ তাঁর আবিস্কৃত নব ধর্মের সেই বাণীগুলো তিনি সর্বজীবের কল্যাণে প্রচার করেছিলেন বুদ্ধত্ব লাভের পরবর্তী ৪৫ বছর ব্যাপি। যা পরবর্তীতে প্রথম ও দ্বিতীয় সংগীতির নীতি অনুসরণে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় সংগীতির মাধ্যমে বুদ্ধবাণী তালপাতায় খোদিত করে প্রকাশ করা হয়। তৃতীয় সংগীতিতে ধর্ম-বিনয় পুনঃ আবৃত্তি করে এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে কিনা গভীর মনোযোগের সাথে তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এই সংগীতিতে অভিধর্ম পিটক গ্রন্থনের মাধ্যমে পূর্বকৃত দ্বি-পিটক 'ত্রিপিটক' নামে আখ্যায়িত হয়। এটি বৌদ্ধদের ধর্মীয় পবিত্র গ্রন্থ।

Dhaka University Institutional Repository

এখানে কোনো অস্বচ্ছ ও ভ্রান্ত ধারণা নেই। পুত-পবিত্র বিশুদ্ধ মননশীলতার উৎকর্ষ ত্রিপিটকে বিদ্যমান। পালি ভাষায় রচিত এই ত্রিপিটককে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে এক বিশাল সাহিত্য ভাণ্ডার যা পালি সাহিত্য নামে পরিচিতি। এই ধারাবাহিকতায় এ সাহিত্যকে ভিত্তি করে আরো অনেক গ্রন্থ নানা বিজ্ঞজনের হাত ধরে রচিত হয় সেগুলোও পালি সাহিত্য ভাণ্ডার হিসেবে স্বীকৃত। ত্রিপিটক তিনটি বিভাগ হচ্ছে : ক. সুত্তপিটক (সূত্রপিটক) খ. বিনয় পিটক ও গ. অভিধম্ম পিটক (অভিধর্ম পিটক)। বিপুলায়তন ত্রিপিটকের গ্রন্থ সংখ্যা হচ্ছে ৩২টি। আবার খণ্ড হিসেবে গ্রন্থের সংখ্যা আরো বেশি। তবে বিনয় পিটকের অন্তর্গত চুলবগ্গ ও মহাবগ্গ গ্রন্থ দু'টি পৃথকভাবে দেখলে মোট গ্রন্থ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৩টিতে। আবার খণ্ড হিসেবে যোগ করলে দাঁড়ায় ৫২টিতে। ত্রিপিটকে ৮৪০০০ চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ বা বিভাগ আছে। ত্রিপিটককে ব্যবহারিক দিক দিয়ে শ্রেণিবিন্যাস করলে দেখা যায়–আটবর্ণ বা অক্ষরে একপদ, চার পদে একটি গাথা, ১৫০ গাথায় একটি ভাণবার বা পরিচ্ছেদ। সমস্ত ত্রিপিটক ১১৮৩ ভাণবার হিসেবে ভাগ করলে অক্ষরের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৬,৬৪,০০০ (ছিয়ানব্বই লক্ষ চৌষট্টি হাজার)।

সুত্ত পিটক পাঁচটি নিকায়ে বিভক্ত। যথা : ক. দীর্ঘনিকায় ৩ খণ্ডে সমাপ্ত; খ. মজ্‌জিম নিকায় ৩ খণ্ডে সমাপ্ত; গ. সংযুক্ত নিকায় ৫ খণ্ডে সমাপ্ত; ঘ. অঙ্গুত্তর নিকায় ৩ খণ্ডে সমাপ্ত ও ঙ. খুদ্দক নিকায় ১৬ খণ্ডে সমাপ্ত। যথা : ১. খুদ্দক পাঠো; ২. ধম্মপদ; ৩ .উদান; ৪. ইতিবুত্তক; ৫. সুত্তনিপাত; ৬. বিমান বত্থু; ৭. পেতবত্থু; ৮. থেরগাথা; ৯. থেরীগাথা; ১০. জাতক (৬ খণ্ড) ১১. মহানিদ্দেস; ১২. চুলনিদ্দেস; ১৩. পটিসম্ভিদা মগ্‌গো; ১৪. অপদান; ১৫. বুদ্ধ বংস ও ১৬. চরিয়া পিটক।

বিনয় পিটক মূলত তিনভাগে ভাগ করা হলেও এর অন্তর্গত পাঁচটি গ্রন্থ আছে। যথা : ১.পারাজিকা; ২. পাচিত্তিয়া; ৩. চুলবগ্‌গ; ৪. মহাবগ্‌গ ও ৫. পরিবার পাঠো। বিষয় অনুসারে বিনয় পিটক তিনভাগে বিভক্ত। যেমন : ১. সুত্তবিভঙ্গ। এটি ক. পারাজিকা ও খ, পাচিত্তিয়া এই দুই খণ্ডে সমাপ্ত। এটিকে আবার পাতিমোক্ষও বলা হয়। অর্থাৎ ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ নীতি এতে সন্নিবেশিত বলেই এ নামে আখ্যায়িত করা হয়। ২. খন্ধক। এটি মহাবর্গ ও চুলবর্গ এই দুই ভাগে বিভক্ত এবং ৩. পরিবার পাঠো।

Dhaka University Institutional Repository

অভিধর্ম পিটকের গ্রন্থসমূহ বিষয়ভিত্তিক সাতটি স্বতন্ত্র গ্রন্থে অভিধর্ম পিটকের বিষয়বস্তুর আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে। যথা : ১. ধর্মসঙ্গণি; ২. বিভঙ্গ; ৩. কথাবত্থু; ৪. পুগ্‌গলপঞ্‌ঞত্তি; ৫. ধাতুকথা; ৬. যমক ও ৭. পট্‌ঠান। এই সাতটি বিষয়ভিত্তিক বিভাজনকৃত গ্রন্থকে একত্রে পালিত "সত্তপকরণ" বলে। বাংলায় যাকে বলা হয় সপ্ত প্রকরণ।

ত্রিপিটকের 'পিটক' শব্দের অর্থ হলো পেঁটরা, বাক্স, পেটিকা ইত্যাদি। অর্থাৎ, যেখানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা হয়।

বৌদ্ধধর্মের মূলতত্ত্ব ও তার তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং গৃহীদের প্রতি বুদ্ধের উপদেশ ইত্যাদি নিয়েই সূত্র পিটক। তাছাড়া শীল, সমাধি এবং প্রজ্ঞা, আর্যসত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতীত্য সমুৎপাদ নীত, নির্বাণ সবই সূত্র পিটকে সুব্যাখ্যাত হয়েছে। এ ছাড়াও পাক্ বৌদ্ধযুগের ধর্মীয় বিশ্বাস কিংবা মতবাদ, দার্শনিক চিন্তা-চেতনা এবং বুদ্ধকালীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক বিবরণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে সূত্র পিটকে।[১]

বুদ্ধ প্রবর্তিত সংঘের নিয়ম-কানুন, আচার-ব্যবহার, শাসন-অনুশাসনই বিনয় পিটকের মূল বিষয়বস্তু। এখানে 'বিনয়' শব্দটি পারিভাষিক যার অর্থ নিয়মানুবর্তিতা, নৈতিক এবং মানসিক শিক্ষা। বুদ্ধ ছিলেন সুবিবেচক। ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি কোনো রকম নিয়ম-কানুন বিধি-বিধান ভিক্ষুদের উপর সরাসরি চাপিয়ে দেননি। যখন ভিক্ষুরা কোনো একটি ঘটনা সংগঠিত করে বুদ্ধ তা নিজে ঘটনাটির কারণ অনুসন্ধান করে দেখেছেন ভিক্ষুরা তার জন্য কতটুকু দায়ী। যখন অপরাধ হয়েছে বুঝতে পেরেছেন তখন বুদ্ধ অনুশাসন করে দিলেন। বুদ্ধ নিজে অনুভব করতে পারলেন যে, আচার সংহিতা ছাড়া কোনো বড় সংস্থা টিকে থাকতে পারে না। তাই তিনি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে অনুসরণ করে সংঘের জন্য প্রণয়ন করলেন আচার সংহিতা। তিনি একসঙ্গে তা সম্পাদন করেননি। এটি একটি করে শিক্ষাপদ তৈরী করে সমগ্র বিনয় পিটক প্রতিষ্ঠা করেন।[২]

বুদ্ধের জীবদ্দশায় বুদ্ধবাণীসমূহ ত্রিপিটকে বিভক্ত ছিল না। তখন 'ধর্ম-বিনয়' নামেই প্রচলিত ছিল। 'বিনয়' হচ্ছে বুদ্ধ প্রতিষ্ঠিত ভিক্ষুসংঘ এবং ভিক্ষুণী সংঘের নিয়ম-কানুন বিষয়ক বিধিবিধান। বিনয়কে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বুদ্ধবচনকে 'ধর্ম' বলা হতো। ধর্মকেই সূত্রপিটক এবং অভিধর্ম পিটক দুইভাগে বিভাজন করা হয়েছে। অতএব, 'অভি' উপসর্গ যোগে 'ধর্ম' শব্দ যোগ করে অর্থবোধক

পদ ‘অভিধর্ম’ গঠিত হয়। ‘অভি’ উপসর্গের অর্থ অতি বা অধিকতর এবং ‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ চিন্তনীয় বিষয়। এখানে ‘অভি’ উপসর্গ দিয়ে এটাই বোঝানো হয় যে, সূত্র পিটকে যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়েছে অভিধর্ম পিটকে তারই পুঙ্খানুপঙ্খরূপে বিস্তারিত ও বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয়েছে। বিষয়ের দিক দিয়ে সূত্র পিটক এবং অভিধর্ম পিটকের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। পার্থক্য রয়েছে পিটক দুটির আকৃতিতে। বিভিন্ন বিষয়ের বিশ্লেষণ ও শ্রেণিবিভাজন অভিধর্ম পিটকের অন্যতম বৈশিষ্ট। অভিধর্ম পিটককে সূত্র পিটকের পরিপূরক বলা যায়। সূত্রকেই বৌদ্ধ ঐতিহ্যে অভিধর্মের ভিত্তি বলা হয়।[৩]

ত্রিপিটকের মূল গ্রন্থগুলো অবলম্বন করে পরবর্তী সময়ে সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ভারত, কম্বোডিয়া প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে বহু পালিগ্রন্থ, অট্‌ঠকথা, টীকা, অনুটীকা ও অনু-অনুটীকা রচিত হয়েছিল। এসব গ্রন্থগুলো যদিওবা ত্রিপিটক বর্হিভূত সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত কিন্তু এর মধ্যে বেশ কিছু গ্রন্থ আছে যা ত্রিপিটক মর্যাদায় পর্যবসিত। যেমন বিসুদ্ধিমর্গগ ও মিলিন্দ প্রশ্ন। যদিও এগুলো ত্রিপিটক সঙ্কলিত হওয়ার পরবর্তীকালে রচনা, তবুও এ জাতীয় গ্রন্থ রচনার অব্যবহিত পরে পর পর দু'টি সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু সেসব সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী পণ্ডিত ভিক্ষু বা সঙ্গীতিকারকেরা কেন যে এ দু'টি গ্রন্থকে ত্রিপিটকে অন্তর্ভূক্ত করলেন না তা আমাদের বোধগম্য হয় না। এ রকম আরও কয়েকটি গ্রন্থ আছে যেগুলোকে ত্রিপিটকের অন্তর্ভূক্ত করা যেতো এবং ত্রিপিটকের এসব গ্রন্থ অন্তর্ভূক্ত করলে গ্রন্থগুলোর মর্যাদা আরও বহুলভাবে বৃদ্ধি পেতো। যেমন : রূপারূপ বিভাগ, নেত্তিপ্পকরণ, মহাবংস, দ্বীপবংস, শাসনবংস, নিধানকথা প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থসমূহ। এ গ্রন্থগুলো যেমন বিভিন্ন দিক থেকে দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, তেমনি পালি চর্চার অগ্রযাত্রাকেও আরো বিস্তৃত করে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, ত্রিপিটক বহির্ভূত পালি সাহিত্যকে আমরা নিমোক্ত আটভাগে বিভক্ত করে দেখাতে পারি। যেমন : ১. অট্‌ঠকথা পূর্ববর্তী মৌলিক গ্রন্থ; ২. পালি অট্‌ঠকথা বা টীকা, অনুটীকা গ্রন্থ; ৩. ইতিহাস বা বংস সাহিত্য সম্পর্কীত গ্রন্থ; ৪. সঙ্কলন বা সারগ্রন্থ; ৫. অন্যান্য কাব্য ও গদ্য গ্রন্থ; ৬. ব্যাকরণ; ৭. ছন্দ ও অলঙ্কার শাস্ত্র সম্পর্কীত গ্রন্থ; ৮. অভিধান বা শব্দ কোষ। ৯. অধিবিদ্যা সম্পর্কীয় গ্রন্থ; ১০. সংকলিত গল্প সংগ্রহ; ১১. নীতিশাস্ত্র; ১২. গল্পগ্রন্থ; ১৩. সাংঘিক বিধি-বিধান; ১৪.

জীবনীগ্রন্থ; ১৫. ভবিষ্যদ্বক্তা-সম্মন্ধীয় গ্রন্থ; ১৬. চিকিৎসাশাস্ত্র; ১৭. চিঠি ও অনুশাসন।[৪] ত্রিপিটকের অর্ন্তগত এবং বহির্ভূত গ্রন্থসমূহকে নিয়ে গড়ে উঠে পালি সাহিত্য। এতে নৈতিক জীবনবিধান প্রণালী, প্রাত্যহিক জীবনের করণীয় কর্ম, জীবনবোধের ধারণা, সম্প্রীতি-সদ্ভাব, কল্যাণকর ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ার অনন্য সাধারণ উপদেশ ও নির্দেশনা এখানে রয়েছে।[৫]

শীল কী?

বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের শৃঙ্খলাপূর্ণ সৎ জীবন যাপনের জন্য বেশ কিছু পালনীয় নীতিমালা প্রবর্তন করেছিলেন। এসব বিধিবদ্ধ নীতিমালার নাম শীল। শীল হলো সচ্চরিত্র গঠনের প্রধান উপায়। শীল সৎ জ্ঞান ও মহৎ গুণাবলী অর্জনের দ্বার স্বরূপ। শীল শব্দের অর্থ স্বভাব। "পৃথিবীতে প্রত্যেকটি জিনিসের একটা স্বভাব বা প্রকৃতি আছে। যেমন বর্ষাকালে বৃষ্টি পড়বে। যদি তা না হয় এটা প্রাকৃতিক নয়। অশ্ব সর্বদা তার পায়ের উপরই দাঁড়িয়ে থাকে, এমনকি ঘুমানোর সময়ও। যদি এটা শুয়ে পড়ে তাহলে এটা রুগ্ন এবং স্বাভাবিক অবস্থায় নেই"।[৬] আর যদি কোন ব্যক্তি শীল পালন না করে তাহলে সেই ব্যক্তি আর মানুষ নয়। কেননা সে শুধু আকারগত মানুষ। তার কোনো শান্তি বা কোনো সুখ থাকবে না। সে শুধুমাত্র নিজের জন্য নয় সমাজের জন্যও বোঝাস্বরূপ। 'শীলের প্রকৃত অর্থ মানবের প্রকৃতির মধ্যে তা সংরক্ষণ এবং নিজের এবং অপরের কষ্ট আনয়নে বিরতি।'[৭]

শীলের অর্থগত বিশ্লেষণ

'সীল' পালি রূপ এর বাংলা হলো শীল। সাধারণ অর্থে শীল হলো চরিত্র, স্বভাব, প্রকৃতি, অভ্যাস, আচরণ, রীতি, সত্যের সহিত উপযোগিতা। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে শীল অর্থ নৈতিক আচরণ, নৈতিক উৎর্কষ, ধর্মাচরণ নীতি, নীতি সম্বন্ধীয় জীবন, নৈতিকতার নিয়মাবলী। বিশেষ অর্থে শীল ধর্মসংহিতা, সচ্চরিত্র, সৎস্বভাব, সদাচার, ধর্মসম্মত অভ্যাস, সংযম, সংকল্প বা অনুশীলন করা, আনুগত্য থাকা।[৮] আচার্য বুদ্ধঘোষ এর মতে, সীলনট্‌ঠেন বা শীলন অর্থে শীল বা অভ্যাসগত এবং অনুশীলনার্থে 'সীল' শব্দের প্রয়োগ দেখিয়েছেন। সমাধান এবং উপকরণ অনুসারে 'সীলন' দুইভাগে বিভক্ত।[৯] বুদ্ধঘোষ সমাধান-এর ব্যাখ্যা করেছেন সদাচারজনিত অবিক্ষিপ্ত দৈহিক ক্রিয়া।

Dhaka University Institutional Repository

সমাধান অর্থ হলো, সুব্যবস্থাপিত বা সুবিন্যস্ত করা। কায়িক সুবিন্যস্ত ক্রিয়ার দ্বারা ইহ ও পরলোকের কল্যাণ সাধিত হয়, কায়িক সৎক্রিয়া ভারসাম্যতা রক্ষা করে। 'উপকরণ' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন : কুশলধর্মের সুস্থিতির প্রভাবে আধার ভাবই উপধারণ। অর্থাৎ কুশল ধর্মসমূহের পুনঃপুনঃ সহজাত উৎপত্তি হলো উপধারণ।[১০] বিমুক্তিমার্গ নামক গ্রন্থে শীল অর্থ শীতলতা, শির, শান্তি।[১১] ভদন্ত জিনবংশ মহাস্থবির তাঁর রচিত 'সদ্ধর্ম্ম-রত্ন-চৈত্য' গ্রন্থে "শীল" শব্দের নিম্নরূপ অর্থ করেছেন :

১। যাহার দ্বারা মনের পরিদাহ নির্বাপিত হইয়া শীতল হয় তাহার নাম 'শীল'।

২। বিচ্ছিন্ন শির-প্রাণি যেমন মৃত, শীল বিহীন দুঃশীল ব্যক্তিও তেমন মৃতপ্রায় এই অর্থে শীলের অপর নাম 'শির'।

৩। শীলের মধ্যে সমস্ত কুশল ধর্ম প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় লাভ করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই অর্থে শীলের অপর নাম 'প্রতিষ্ঠা'।

৪। শীলের সংস্পর্শে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলা দূর হইয়া ইন্দ্রিয় নিয়ে সুদান্ত সুসংযত হয়। এই অর্থে শীলের অপর নাম 'দমগুণ'।[১২]

ইংরেজিতে শীলের প্রতিশব্দ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে :

Character, Mental or moral nature, Decency, Ethics, Ethos, Rectitude, Integrity, Propriety, Righteousness, Indoctrinate, Penalize, Keep in check, Chastise, Peculiarity, Idiosyncrasy, Uniqueness, Scruples.[১৩]

শীলের সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে, 'শীল' হচ্ছে সচ্চরিত্র সৎস্বভাব ধর্মাচরণের সংহিতা নৈতিকতার নিয়মাবলী কর্তব্যবিষয়ক জ্ঞান সম্বন্ধীয় সংকেত বা ধর্মসম্মত অভ্যাস বা ধর্মাচরণ নীতি। প্রকৃত অর্থে, মানব চরিত্র গঠনের নিয়মাবলীকেই শীল বলা হয়। ব্যবহারিক অর্থে, সামাজিক মঙ্গলের বিধান পালনের মাধ্যমে মানুষ উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতর জীবন লাভ করতে পারে এবং সমাজ জীবন সুসংহত হয় এবং পরিবেশ শিষ্ট থাকে তাকে শীল বলা হয়। ভিক্খু পাতিমোক্খং নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে :

Dhaka University Institutional Repository

‘শীলসমূহ পালন দ্বারা নিজেকে সংযত করা এবং আচরণে আত্মদমনই শীল’।[১৪] বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে বলা হয়েছে : মানবিক কল্যাণ বিরোধী কর্ম অকরণীয় বা এরূপ কর্ম থেকে বিরত থাকার যে নীতি অনুশীলিত হয় তাই শীল।[১৫] আরো বলা হয়েছে যে, সু-কর্মে নিয়োজিত থাকার নীতি অনুশীলনকেই শীল নামে অভিহিত করা হয়। সহজ বাংলা অভিধান এ বলা হয়েছে : শীল হলো বৌদ্ধদের অবশ্যপালনীয় নীতি।[১৬]

শীলকে নিয়ম-নীতি বা শৃঙ্খলাও বলা যেতে পারে। তথাগত বুদ্ধ মানুষের চরিত্র বিশুদ্ধির জন্য যে সমস্ত নিয়ম বিধিবদ্ধ করেছেন সেই সকল নিয়মকে শীল বলা হয়।

এ প্রসঙ্গে মিসেস T. W. Rhys Davids বলেন : “It has now and again been put forward that Buddhism is neither a religion nor philosophy, but only a system of morals or ethics, in so far as it contains anything beyond mere negation”.[১৭]

শীলের বর্ণনা দিতে গিয়ে T. W. Rhys Davids ও William Stede বলেন : …nature, character, habit, behaviour; usually as function "being of such a nature," like, having the character of..., e. g. adāna of stingy character, illiberal.[১৮]

T. W. Rhys Davids এ প্রসঙ্গে আরো বলেন : The Discipline of the Buddhist Mendicants, the rules of their order – probably the most influential; as it is the oldest, in the world……..[১৯]

Nyanatiloka শীলের বর্ণনায় বলেছেন :

Who does no harm to anyone,
Who never utters any lie,
Who never takes what is not his,
Nor ever wishes in all his life.[২০]

Dipak Kumar Barua শীল সম্পর্কে বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

Thus in short "Sila means those particular volitions and mental states, etc. by which a man who desists from committing sinful actions maintains himself on the right path".[২১]

Oxford dictionary তে শীল সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে : Morality a system of people of moral principles followed by a particular group of people.[২২]

সুতরাং শীলসংজ্ঞার শেষ কথায় বলা যায় যে, শীল হলো মানুষের সকল গুণ সমষ্টির উৎস। শীলতা যেন সুকর্ষিত ভূমি, সকল গুণের আধার ও সমাজের মেরুদণ্ড। নৈতিক ধর্মসম্মত বিধি এবং চরিত্র শুদ্ধি বা তদানুরূপ ব্যবহার। আর শীল সম্পন্ন ব্যক্তি ধর্মসম্মত উপদেশসমূহ পালন করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সর্বজীবের সতত হিত ও সুখ সাধন করাই সর্বশ্রেষ্ঠ শীল।

সংখ্যা তাত্ত্বিক বিচারে শীল

দুঃখ বিমুক্তির জন্য প্রত্যেক মানুষের যথাযথভাবে শীল প্রতিপালন করা একান্ত অপরিহার্য কর্তব্য। বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির জন্য সকল বোধিসত্ত্বগণকে দান পারমী পূর্ণ করার পর শীল পারমী পূর্ণ করতে হয়। গৃহীদের প্রতিপাল্য পঞ্চশীল, উপোসথিকদের জন্য অষ্টশীল, দশ সুচরিত শীল, মিথ্যাজীব শমথ শীল, প্রব্রজিতদের জন্য (শ্রামণদের) প্রব্রজ্যার দশশীল, ভিক্ষুদের ২২৭ শীল, ভিক্ষুনীদের ৩১১টি শীল, ভিক্ষুদের জন্য চতুর পরিশুদ্ধিশীল। যথা : পাতিমোক্ষ সংবর শীল, ইন্দ্রিয় সংবরশীল, আজীব পরিশুদ্ধি প্রত্যয়শীল, সন্নিশ্রিত শীল ইত্যাদি। উক্ত ২২৭ শীলকে প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল বলে। এগুলোকে আবার চারিত্র ও বারিত্র হিসেবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সমস্ত প্রকার ব্রত প্রতিব্রত রক্ষা করার নাম চারিত্রশীল। আর সমস্ত শিক্ষাপদ প্রতিপালন, দশ অকুশলকর্ম বর্জন ও কুশলকর্ম আচরণ এবং সমস্ত শীল পরিপূর্ণ ভাবে প্রতিপালন করার নাম বারিত্রশীল। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক বা কায় এই সংসযত করা এবং স্মৃতি ও প্রজ্ঞার সাহায্যে সতর্কতার সাথে ইন্দ্রিয় সমূহকে দমন করার নামে ইন্দ্রিয় সংবরশীল। কায় বাক্য সম্পাদিত প্রাণী ইত্যাদি সপ্তবিধ অকশুল কর্ম বা ইন্দ্রজাল ও ছলনাপূর্ণ অলীকবাক্য ইত্যাদি গর্হিত উপায়ে লাভ সৎকার উৎপাদন হতে বিরত থেকে ধর্মত লব্ধ আহার বিহার পরিধানের চীবর ও ভেষজ্যাদি চতুপ্রত্যয়ে জীবিকা নির্বাহ করার

Dhaka University Institutional Repository

নাম আজীব পরিশদ্ধি শীল। ধর্মত উৎপন্ন চারিপ্রত্যয়ে লোভ দ্বেষ ও মোহ উৎপাদন না করে স্বল্পে সন্তুষ্ট হওয়া অধিক পাবার ইচ্ছায় যাচঞা না করাকে প্রত্যয় সন্নিশ্রিত শীল বলা হয়। এটি ব্যতীত ১৩ প্রকার ধূতাঙ্গ ১৪ প্রকার খণ্ডব্রত ৮০ প্রকার মহাব্রত ছাড়াও সমগ্র বিনয় পিটক অসংখ্য শীলের বর্ণনা রয়েছে।

পণ্ডিত ভাষ্যকারগণ যেভাবে বিনয় শীলের সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন তা নিম্নলিখিত গাথায় পরিস্ফুট হয়েছে :

নবকোটি সহস্সানি অসীতিং সতকোটিযো,
পঞ্ঞাসং সত সহস্সানি দত্তিংসাচ পুনাপরে।
এতে সংবরা বিনযা সম্বুদ্ধেন পকাসিতা,
পেয্যাল মুখেন নিদ্দিট্ঠা সিক্খা বিনয সংবরো।[২৩]

উপরি-উক্ত গাথানুসারে প্রথম সংখ্যা হলো নয় হাজার কোটি, দ্বিতীয় সংখ্যা আশীশত কোটি, তৃতীয় সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ এবং চতুর্থ সংখ্যা ছয়ত্রিশ অতএব বিনয় শীলের সর্বমোট সংখ্যা হল সতর হাজার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ ছয়ত্রিশটি। বিনয় পিটকের পাঁচটি গ্রন্থ পারাজিকা, পাচিত্তিয়া, মহাবর্গ, চুল্লবর্গ এবং পরিবার পাঠো নামক গ্রন্থে এসকল শীলের বিশদ বর্ণনা রয়েছে। এখানে শুধুমাত্র গ্রহীদের এবং প্রব্রজিত শ্রামণদের নিত্য প্রতিপাল্য শীল ও ভিক্ষুদের ধূতাঙ্গশীল সমূহ আলোচনা করা হয়েছে।

শীল ও জীবনের উদ্দেশ্য

শীলকে জীবনের উদ্দেশ্য বলা হয়। শীল মন ও চরিত্রের উন্নত অবস্থা। অনুভূতিকেও জীবনের লক্ষ্য বলা হয়। শীল ও জীবনের উদ্দেশ্য হলো পুণ্য লাভের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মকর্ম বা তপস্যা। যারা উত্তম শীলসম্পন্ন তাদের মতে সংযম দ্বারা শুদ্ধি প্রাপ্তি হয়; ব্রত গ্রহণ পূর্বক তারা সেবারত হোন; এটি হতেই আমরা তার শুদ্ধি জানতে পারব, যারা জীবনে আসক্ত তারা আপনাদেরকে ‘দক্ষ’ ঘোষণা করে।[২৪] আচার্য শান্তিদেব বলেন : বাইরের অসংখ্য দুর্জন ব্যক্তির মধ্যে কতজনকে আমি

ধ্বংস করব? এর চেয়ে আমার স্বীয় অন্তরের ক্রোধশত্রুকে ধ্বংস করতে পারলেই তা সকল শত্রুর ধ্বংস হয়ে যায়।[২৫]

সুতরাং নিজেকে সংযত, সুরক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখাই হলো শীল এবং এটি স্বচিত্তের আবেগ, অনুভূতি ও আচারের মাধ্যমেই সম্ভব। চিত্তের আকুলতা ও আকাঙ্খা ছাড়া এটি কখনই সম্ভব নয়।

শীলের অন্তরায় ও কারণ

ক্রোধ, দ্বেষ, কপটতা, চঞ্চলতা, লোভ, ঈর্ষা, প্রতারণা, ধূর্ততা, প্রতিহিংসা, তর্কপ্রিয়তা, অহংকার, আত্মশ্লাঘা, ঔদ্ধত্য, অবহেলা, আলস্য, কামপ্রবৃদ্ধি, অল্পে অতৃপ্তি, পণ্ডিত সংসর্গ বর্জন, স্মৃতি-হীনতা, কর্কশ বাণী, অসৎ-সংসর্গ, মন্দ জ্ঞান, পাপ-দৃষ্টি, অসহিষ্ণুতা, অশ্রদ্ধা, অশিষ্টতা, অশ্লীলতা, কায়ে, বাক্যে ও স্বাদে অসংযম, অসভ্যতা, নারী সংস্পর্শ, আচার্য্যের প্রতি অসম্মান, ইন্দ্রিয় সংযমে অনভ্যাস, রাত্রির প্রথম ও শেষ রাতে সমাধি অনুশীলন, রাত্রির প্রথম ও শেষ প্রহরে সূত্র অনাবৃত্তি এই চৌত্রিশ প্রকার ধর্ম শীলের অন্তরায়।[২৬] এগুলোর যে কোনো একটি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হলে সাধক তাঁর শীল বিশুদ্ধ করতে পারেন না। যদি তাঁর শীল বিশুদ্ধি না হয়, তিনি নিশ্চয় অধঃপতিত হবেন। এই সকল 'অন্তরায়' নিবারণকারী অন্যতর চৌত্রিশ প্রকার ধর্ম 'শীলের কারণ'। লোভ-দ্বেষ ও মোহ যুক্ত হলে ক্রোধ চেতনা বলবতী হয়। 'অঙ্গুত্তর নিকায়ে'[২৭] ক্রোধের কারণে মানুষের সাত প্রকার দোষাগ্রস্থের কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন :

১. দোষগ্রস্থ ব্যক্তির চেহারার শ্রী নষ্ট হয়;

২. দোষাগ্রস্থ ব্যক্তির ঘুম নষ্ট হয়;

৩. দোষাগ্রস্থ ব্যক্তি সব সময় চঞ্চল বিধায় কোন বিষয়েই সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে না;

৪. দোষাগ্রস্থ ব্যক্তি ভোগ্যবস্তুতে সন্তুষ্ট হয় না;

৫. সমভিব্যবহারী বা উপযুক্ত সঙ্গী পায় না;

৬. কারো সাথে বন্ধুত্ব রক্ষা করে চলতে পারে না; এবং

৭. প্রায়ই অপরাধে যুক্ত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিক জীবন গঠনে শীল

শীল গঠনের জন্য পরিবেশ বহুলাংশে দায়ী। মাতা-পিতা, আত্নীয়-স্বজন হতে আরম্ভ করে সমস্ত পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে শিশুর চরিত্র গড়ে উঠে। দীর্ঘ সাধনার দ্বারা শীল অর্জন করতে হয়। লোভ-লালসা ও অসৎ প্রবৃত্তির নানা কুপ্রলোভন মানুষকে পাপের পথে টানে। এসব পাপ পথ সর্তক ও দৃঢ়চিত্তে পরিহার করে লোভকে জয় করার শক্তি অর্জন করে শীলবানের আদর্শকে মশাল হিসেবে জ্বালিয়ে উন্নত জীবনের সাধনায় নিযুক্ত হলেই সুশীল গঠনে এগিয়ে যাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, শীল রক্ষার জন্য ও মানুষকে আমৃত্যু নিরন্তর সাধনা করে যেতে হয়। তাই সংযমশীলতা ও সাধনা শীল গঠন ও রক্ষার জন্য একান্ত অপরিহার্য। ধর্ম মানুষকে নিষ্ঠাবান করে অসত্য ও অন্যায় থেকে বিরত থাকার অনুপ্রেরণা দেয়। আদর্শ জীবন গঠনে মহামানবের আদর্শ প্রেরণার উৎস। পৃথিবীর যে সকল মহামানব তাঁদের কীর্তিতে প্রাতঃস্মরনীয় হয়ে আছেন তাদের সকলেই সচ্চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। কোন প্রলোভনই তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। অন্যায়, অসত্য ও পাপের বিরুদ্ধে তারা আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। আর উন্নত জীবন গঠনের জন্য কিছু স্বভাব বৈশিষ্ট্যের পরিচর্যা করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেগুলো হলো : মহত্ব (Generosity), নৈতিকতা (Morality), ধৈর্য (Patience), দৃঢ়তা (Vigour), মনোযোগ (Concentration) এবং প্রজ্ঞা বা জ্ঞান (Wisdom)। এগুলো মানবীয় বৈশিষ্ট্যের অনন্য সম্পদ।

কেবল দীর্ঘ জীবনের মধ্যেই মানুষ অমরত্ব লাভ করতে পারে না বরং মহৎ কার্যাবলির জন্যেই সে জগতে চির অমর হয়। মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন হয় তাঁর কর্ম দ্বারা। ইংরেজিতে একটি কথা আছে,

Man does not live in years but in deeds .

তাই আমরা বলতে পারি, শীল হচ্ছে এমন একটি ক্ষেত্র যার উপর ভিত্তি করে দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায়। আর জীবনকে সুন্দর, সুখময় ও সত্যনিষ্ঠ নান্দনিক সফলতায় উজ্জীবিত করার জন্য শীলের প্রভাব অত্যাধিক।

Dhaka University Institutional Repository

শীলের লক্ষণ[২৮]

শীল আমাদের সবচেয়ে বড় শক্তি। কেননা, এটা আমাদের অর্ন্তনিহিত সম্পদ। আত্মিক শক্তি বলে একে রক্ষা করতে হয়। শীল পালন করা বৌদ্ধধর্মের প্রথম সোপান। মূলত সকল কুশল ধর্মই শীল। শীলের প্রধান লক্ষণ কি? মহত্ত্ব দ্বারা হীনতার অপসারণ। হীনতা কাকে বলে? শীল লঙ্ঘনকেই হীনতা বলে। বিবিধ শীল লঙ্ঘন আছে। ভিক্ষু সংঘের নিয়ম প্রণালী[২৯] (প্রাতিমোক্ষ-সংবর শীল) সম্পর্কে শীল লঙ্ঘন; ব্যবহার্য্য বস্তু[৩০] (প্রত্যয়-সন্নিশ্রিত শীল) সম্পর্কে শীল লঙ্ঘন; ইন্দ্রিয়-ধর্ম[৩১] সম্পর্কে শীল লঙ্ঘন। ভিক্ষু-সংঘ সম্পর্কে শীল লঙ্ঘন কি? পাপ কর্মে লজ্জাহীনতা[৩২] ও ভয়হীনতার[৩৩] দরুণ তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধার পরিহানি। ব্যবহার্য্য বস্তু সম্পর্কে শীল লঙ্ঘন কি? যখন সাধারণ মানব সারা জীবন স্বীয় দেহ সুশোভনে লিপ্ত থাকেন, তিনি তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না। ইন্দ্রিয়-ধর্ম সম্পর্কে শীল লঙ্ঘন কি? ষড় ইন্দ্রিয় দ্বার অনাবৃত রেখে তীক্ষ্ণ মনস্কার প্রদানে বিরতি। এই ত্রিবিধ (লঙ্ঘন) অযশ উৎপন্ন করে। এটিই শীলের প্রধান লক্ষণ বল হয়। শীলের লক্ষণ সর্ম্পকে মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থে উল্লেখিত বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

রাজা মিলিন্দ ঃ শীলের লক্ষণ কি?

ভিক্ষু নাগসেন ঃ শীল হলো ভিত্তি। এটির উপরে অন্য সকল কুশল ধর্ম প্রতিষ্ঠিত। শীলকে আশ্রয় কওে, ভিত্তি করে, সাধক পঞ্চেন্দ্রিয় ভাবনা বৃদ্ধি করেন।

রাজা ! ভন্তে নাগসেন, উপমা প্রদান করুন?

নাগসেন ঃ বীজ হতে গাছের জন্ম তার শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তর। ধরিত্রীকে আশ্রয় করেই বীজের শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি। সেই প্রকার সাধক ও শীলকে আশ্রয় করে ও তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন। তার বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি করেন।

রাজা মিলিন্দ বিষয়টি আরও সহজভাবে বুঝাতে বললে ভিক্ষু নাগসেন বললেন, মহারাজ! স্থপতি নগর নির্মাণ কল্পে প্রথমে ভূমি পরিস্কার করে, কণ্টক ইত্যাদি অপসরণ করে, ভূমি সমতল করায়। তার পর রাস্তা, চৌরাস্তার সংযোগস্থল ইত্যাদির নকশা ঠিক রেখে নগর নির্মাণ করে। সেইরূপ সাধক যোগী শীলকে আশ্রয় করে ও তাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন। তার বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা আরও সহজ উপমা দিতে বললেন।

অতঃপর ভিক্ষু নাগসেন বললেন, মহারাজ! উচ্চ লম্ফনকারী ক্রীড়াবীদ ভূমি হতে কাঁকর, পাথর, কণ্টক ইত্যাদি পরিস্কার করে ভূমি সমতল করে তারপর কোমল জমিতে খেলা প্রদর্শন করে। ঠিক সেইরূপ সাধক যোগীও ভূমি স্বরূপ শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ও সেটিকে আশ্রয় করে পঞ্চেন্দ্রিয়ের ভাবনা করেন।

শীল ধরিত্রীর ন্যায় প্রাণিদের আশ্রয়স্থল। সকল কুশল কর্মের এটিই মূল। বুদ্ধের অনুশাসনে এটিই মূখ্য বস্তু। যে জ্ঞানী শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমাধি ও প্রজ্ঞার উন্নতি করে, সেই দৃঢ় বীর্যবান জ্ঞানী তৃষ্ণার জটাজাল ছিন্ন করতে সক্ষম হন। শীল পালনেই মানুষের চারিত্রিক উন্নতির মাধ্যমে বুদ্ধের দেশনা মোক্ষলাভের সোপান। এটিই নির্বাণ লাভের প্রথম পদক্ষেপ। তথাগত গৌতমবুদ্ধ স্বীয় জীবনের একাগ্র সাধনা ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতার আলোকে অনিত্য ও অনাত্মা বিষয়ে যে পরম দার্শনিক জ্ঞান অর্জন করেছেন এর অভিযাত্রার সূচনা হয়েছিল তাঁর শীল চর্যার মাধ্যমে। গৌতমবুদ্ধ ছাড়াও অতীতবুদ্ধগণও শীল পালনের মাধ্যমে পূর্ণতা অর্জন পূর্বক বুদ্ধত্বে উপনীত হয়েছিলেন। তাই ঋদ্ধ সমৃদ্ধ পরম জ্ঞানালংকারে বিভূষিত হওয়ার জন্য সদাচার বা সত্যনিষ্টভাবে জীবনযাপন করা অপরিহার্য।

শীল চর্চা : জাতকের আলোকে

শীল-মীমাংসা জাতক[৩৪], শঙ্খপাল নাগরাজ জাতক[৩৫], মাতৃ পোষক জাতক[৩৬], চাম্পেয় জাতক[৩৭], বোধিকুমার জাতক[৩৮], মহিষ জাতক[৩৯], রুরুমৃগ জাতক[৪০], মাতঙ্গ জাতক[৪১], জয়দ্দিস জাতক[৪২], শঙ্খপাল জাতক[৪৩] প্রভৃতি জাতক কাহিনি পাঠে বুদ্ধের শীল অনুশীলনের কাহিনি জানা যায়। ভূরিদত্ত জাতকে[৪৪] বোধিসত্ত্বের শীল পূর্ণতার যে কাহিনি পাওয়া যায় তা আলোচনা করা হলো- বোধিসত্ত্ব একবার নাগরাজ হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল ভূরিদত্ত। একদিন তিনি দেবরাজ বিরূপাক্ষের সাথে দেবলোকে গমন করেন। দেবলোকের বৈভব দর্শন করে সেখানে উৎপন্ন হবার মানসে শীলসমেত উপোসথ ব্রত পালন করতে লাগলেন। এসময় একজন সাপুড়ে তাঁকে বেঁধে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে গিয়ে ক্রীড়া প্রদর্শন করতে বাধ্য করেন। তাঁকে শারীরিকভাবে বহু

Dhaka University Institutional Repository

কষ্ট প্রদান করেন। কিন্তু ভূরিদত্ত এই বলে স্বীয় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে আমার দেহ খণ্ড খণ্ড করে কাটুক, আমার মাংস পাক করুক বা আমাকে শূলে বিদ্ধ করুক; আমি কিছুতেই তার উপর ক্রুদ্ধ হব না। আমি যদি এর দিকে দৃষ্টিপাত করি, তাতেও আমার উপোসথ ভঙ্গ হবে। মনে মনে এরূপ প্রতিজ্ঞা করে ভূরিদত্ত শীল ভঙ্গ না করে সাপুড়ের প্রতি আক্রোশ ভাব পোষণ করেননি। কিন্তু শীলব্রত ভঙ্গ করা আমার কাছে পৃথিবী উল্টে যাবার মত ঘটনা সম ছিল।[৪৫] মহাকপি জাতকে[৪৬] দেখা যায়, বোধিসত্ত্ব এক জন্মে বানর রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক বনে বাস করতেন। গাছ থেকে গর্তে একজন মানুষকে অসহায় অবস্থায় দেখে বানরের চিত্ত কৃষকের কল্যাণে অনুপ্রাণিত হলো। তখন বোধিসত্ত্ব নিজের জীবন বিপন্ন করে হলেও সেই কৃষককে উদ্ধার করার সংকল্প হলো। সুতরাং মানব জীবনে চিত্তের অভিপ্সা পূরণের ভিত্তি হলো শীল। তাই শীলকে প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় সযত্নে প্রতিপালন করতে হয়। জল দ্বারা যেমন শরীরের ময়লা দূর করা যায়, সেরূপ মনের ময়লা বা কলুষ দূর করার উত্তম পন্থা হলো এই শীল পালন। শীল পালনের দ্বারা মহৎ গুণাবলী অর্জন করা সম্ভব। তাই একমাত্র পরিশুদ্ধভাবে শীল পালনের দ্বারা সাধক নির্বাণ দর্শন করতে পারেন। প্রাসঙ্গিকভাবে আরো বলা যায় যে, বুদ্ধঘোষ রেবত স্থবিরের নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করে পালি গ্রন্থের অর্থকথা লিখতে মনস্থ করেন। আচার্য্য রেবত স্থবির তা অবগত হয়ে তাকে সিংহলে গিয়ে অর্থকথা (অট্ঠকথা) প্রনয়ণের জন্য পরামর্শ দেন। এভাবে উপদিষ্ট হয়ে তীক্ষ্ণ ধীসম্পন্ন এই খ্যাতিমান পণ্ডিত সিংহলে গমনের স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৪৭] খৃষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধে মহানাম রাজার রাজত্বকালে সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুরের মহাবিহারস্থ অতি রমণীয় "মহাপদান" প্রাসাদে প্রবেশ করেন এবং মহাবিহারের আচার্য্য সংঘপালের নিকট তাঁর অভিলাষ ব্যক্ত করেন। বিহারাধ্যক্ষকে বিনীত অভিবাদনান্তে নিবেদন করেন : "আমি অট্ঠকথা লেখার সংকল্প করেছি : আপনি আমাকে আপনার সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ প্রদান করুন"। বিহারাধ্যক্ষ তাঁর প্রজ্ঞার পরিধি এবং কর্মদক্ষতা অনুধাবনের জন্য তিনি সক্ষম কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আচার্য্য সংঘপাল তাকে নিম্নোক্ত গাথা অবলম্বনে তার সঠিক ব্যাখ্যা করতে বলেন :

'সীলে পতিট্ঠায় নরো সপঞ্ঞো,

চিত্তং পঞ্ঞঞ্চ ভাবযং,

আতাপী নিপকো ভিক্খু

সো ইমং বিজটয়ে জটন্তি।’[৪৮]

অর্থাৎ,

“শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নর প্রজ্ঞাবান,

সমাধি আর বিদর্শন দুই করে ধ্যান,

বীর্যবান প্রজ্ঞাবান ভিক্ষু সেই জন,

সেইজন এই জটা করেয়ে ছেদন।”

দৃঢ়বীর্য প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিত্ত ও প্রজ্ঞা ভাবনা করলে এই জটারূপ সংসার-বন্ধন হতে মুক্ত হতে সমর্থ হন। তখন লোভ-দ্বেষ-মোহ-মদ-মাৎসর্য প্রভূতি রিপুচয় চিত্ত হতে চিরতরে বিদূরিত হয় আর তখন চিত্ত হয় প্রসন্ন ও প্রভাস্বর। এতাদৃশ চিত্তেই প্রজ্ঞার জ্যোতি বিকীর্ণ হয়। তারই শুভ্র আলোকে নির্বাণ উপলব্ধি সম্ভব। এ তিনটি পরস্পর আপেক্ষিক। শীল দ্বারা দুশ্চরিত্র-সংক্লেশ বিশোধন, সমাধি দ্বারা তৃষ্ণা-সংক্লেশ বিশোধন এবং প্রজ্ঞা দ্বারা দৃষ্টি-সংক্লেশ বিশোধন হয়। চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জিত না হলে চিত্তের উৎকর্ষতা লাভের সাধনা পূর্ণ হয় না। সাধনার অভাবে প্রজ্ঞার উৎপত্তি হয় না। প্রজ্ঞাহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন মন নির্বাণের সন্ধান পায় না। অতএব নির্বাণ উপলব্ধির জন্য চারিত্রিক পবিত্রতা, চিত্তের উৎকর্ষতা এবং প্রজ্ঞা একান্ত প্রয়োজন। অর্থাৎ শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার প্রকর্ষ ব্যতীত নির্বাণ উপলব্ধি সম্ভব নয়। নির্বাণ উপলব্ধির চার স্তর-স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। শীলের সাহায্যে স্রোতাপত্তি ও সকৃদাগামী ভাবের কারণ প্রকাশিত হয়ে থাকে। সমাধি দ্বারা অনাগামী ভাবের এবং প্রজ্ঞা দ্বারা অর্হত্ব ভাবের প্রকাশ হয়। নির্বাণ কোনো বস্তু নয়, পদার্থ নয়। নির্বাণ সর্বসংস্কার মুক্ত ও সর্বোপাধিবর্জিত চিত্তের অবস্থা, আলম্বন বা অনুভূতি।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ দুঃখমুক্তির একমাত্র পথ। মহামানব বুদ্ধের ছয় বৎসর কঠোর ধ্যান সাধনার ফল চতুরার্য সত্য এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ মার্গ অনুসরণ করলে মানুষ সর্বদুঃখের অন্তসাধন করে পরম সুখকর নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হন। দুঃখ নিরোধের জন্য বুদ্ধ আটটি পথের নির্দেশ

দিয়েছেন যা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ নামে অভিহিত। প্রজ্ঞা, শীল ও সমাধি ভেদে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের অঙ্গসমূহ হলো :

সম্যক দৃষ্টি প্রজ্ঞা
সম্যক সঙ্কল্প

সম্যক বাক্য
সম্যক কর্ম শীল
সম্যক জীবিকা

সম্যক ব্যায়াম
সম্যক স্মৃতি সমাধি
সম্যক সমাধি

সম্যক দৃষ্টি

দিট্ঠি বাংলা দৃষ্টি। √দিস ধাতু থেকে উৎপন্ন, দেখা অনুভব করা। সম্যক গুণযুক্ত বলে এ শব্দের অর্থ হয় সৎ দৃষ্টি বা সত্যদর্শন উত্তমরূপে দেখা। সাধারণ অর্থে দৃষ্টি বলতে দেখা। সম্যক দৃষ্টি মানে নির্ভূলভাবে দেখা বা যথাযথ ধারণা অর্থাৎ শুদ্ধ শোভন, প্রশান্ত ও সত্য দৃষ্টি হচ্ছে সম্যক দৃষ্টি। সম্যক দৃষ্টি অত্যন্ত গম্ভীর ও ভাবদ্যোতক। তা প্রজ্ঞা প্রধান। প্রজ্ঞা দৃষ্টি যার অন্তরে জাগ্রত তাঁর মধ্যে শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ বিশ্বাস, শুদ্ধ দৃষ্টি ও শুদ্ধ জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে। যার দৃষ্টি ভঙ্গি সৎ ও শুদ্ধ তার চিত্ত সর্বদা প্রসন্ন এবং উদারতায় ভরপুর হয়। কিন্তু যার হৃদয় সংকীর্ণতা পূর্ণ, অনুদার তার মধ্যে এ শুভ দৃষ্টির উদ্ভব অসম্ভব। যাঁরা বর্জনীয় এবং অবর্জনীয় কর্ম সম্যক জ্ঞাত হয়েছেন, সেরূপ সম্যক দৃষ্টি সম্পন্ন লোকেরা সুগতি প্রাপ্ত হয়।[৪৯] সুতরাং সম্যক দৃষ্টি মুক্তিসাধকের পক্ষে অপরিহার্য। সম্যক দৃষ্টি দুই প্রকার - লৌকিক সম্যক দৃষ্টি ও লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টি। লৌকিক অর্থে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক ভালমন্দ কার্যের যথার্থ জ্ঞানকে সম্যক দৃষ্টি বলা হয়। আর যারা মার্গফল লাভ করে স্রোতাপন্ন, সকৃতাগামী ও অনাগামী এ তিন স্তরের ফলজ্ঞান লাভ করেছেন তারা

Dhaka University Institutional Repository

লোকোত্তর সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। বস্তুত যারা সৎকর্ম ও মূল জ্ঞাত হয়ে অবিদ্যা ধ্বংস করে নির্বাণ উপলব্ধি করেন তারাই সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন। আর যারা এ প্রক্রিয়ায় রত আছেন তাদের লৌকিক দৃষ্টিসম্পন্ন বলা হয়।

সম্যক সংকল্প

সংকল্প অর্থ প্রতিজ্ঞা, সৎচিন্তা ও অভিলাষ ইত্যাদি বুঝায়। অর্থাৎ সৎ বা উত্তম সংকল্পই সম্যক সংকল্প। রাগ (কাম-তৃষ্ণা), হিংসা ও প্রতিহিংসাকে বর্জন করার সংকল্পকে সম্যক সংকল্প বলা হয়। সত্য পরায়ণ অনুসারে জীবন গঠনের নিমিত্ত সকলকে অবশ্যই সৎসংকল্পবাদী হতে হবে। সংকল্প যতই সুন্দর ও মঙ্গলজনক হবে ততই মানুষের মন-মানসিকতা অতি উন্নত হবে। এরূপ শুদ্ধ সচেতন মানব মাত্রেই সুখে জীবন যাপন করেন এবং কল্যাণকর কার্যাদি সম্পাদনে অনুপ্রাণিত হন। এছাড়া জাগতিক সুখ-দুঃখ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মাৎসর্য, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, লোলুপতা প্রভৃতি মানূষকে পশুতে পরিণত করে। এ সকল অশুভ ও অকুশল চিন্তা পরিত্যাগ করে চিত্তে মৈত্রী, করুণা, পরোপকার, সৎচিন্তা ও সদভাবনায় নিজেকে জাগ্রত করার নামই সম্যক সংকল্প।[৫০]

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যদি একজন ছাত্র সর্বোচ্চ সাফল্য লাভের জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু সে যদি বিশ্বাস করে যে সে সাফল্য লাভে তাকে কোন অদৃশ্য শক্তিই সাহায্য করবে তার জন্য তার প্রচেষ্টা বা অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন নেই তাহলে সে সংকল্প সংকল্পই থেকে যাবে। সুতরাং প্রকৃত ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে না গেলে সংকল্প ব্যর্থতায় পর্যবর্সিত হতে বাধ্য। তাই অভিষ্ট লক্ষ্য যথার্থ দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। সম্যক সংকল্প তিন প্রকার যথা- নৈষ্কম্য সংকল্প, অব্যাপাদ সংকল্প ও অবিহিংসা সংকল্প।

নৈষ্কম্য সংকল্প[৫১]

পঞ্চকামগুণ রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ, কামতৃষ্ণা, ভোগলিপ্সা, পরিভোগের অভিপ্রায় বর্জন করে ঔদাসীন্যতা বা নৈষ্কম্য প্রাপ্তির দৃঢ় সংকল্পের নাম নৈষ্কম্য সংকল্প। একমাত্র এই স্তরের মানসিকতা

চিন্তাসন্ততিতে জাগ্রত করে রাখতে পারলে মানুষ ক্রমান্বয়ে অনাসক্তভাবে প্রণোদিত হয়ে মায়ামোহের বন্ধন ত্যাগে উদ্বুদ্ধ হয়।

অব্যাপাদ সংকল্প[৫২]

অব্যাপাদ অর্থ অপ্রেমেয় মৈত্রী চিত্ত উৎপাদন করা। অর্থাৎ সর্বতোভাবে অহিত বা অকুশল চিন্তা বর্জন করতঃ সর্বজীবের প্রতি মৈত্রীভাব জাগ্রত করাই হচ্ছে অব্যাপাদ সংকল্প। নিজের ও পরের হিত সুখ বিপন্ন করে বলেই ব্যাপাদ। বস্তুতঃ তা হিংসাভাবাপন্নতার প্রকাশ মাত্র। সাধক-সাধিকা মাত্রেই সমগ্র জীবজগতের অপরিসীম মৈত্রীভাব দ্বারা ব্যাপাদ বা হিংসা ভাবকে শান্ত করতঃ অব্যাপাদ সংকল্পে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

অবিহিংসা সংকল্প[৫৩]

সংস্কৃত "হিংসা" ধাতু নিষ্পন্ন হিংসা শব্দ হননেচ্ছা জ্ঞাপক। তা দ্বেষ চিত্ত সম্ভূত। বিহিংসার বিপরীতার্থবাচক অবিহিংসা বলতে আমরা সর্বপ্রকার দ্বেষচিত্ত সংযত করে জীব জগতের প্রতিচিত্তে অপ্রমেয় করুণাভাব উৎপাদন করাকেই অবিহিংসা সংকল্প বলা হয়। সুতরাং কায়মনোবাক্যে দ্বেষশূন্যচিত্তে করুণা প্রণোদিত পবিত্র ও কল্যাণমুখী সংকল্পই অবিহিংসা সংকল্প নামেও অভিহিত করা হয়। অশুভ ভাবনা বলে প্রথম ধ্যানে কামবিতর্কের, মৈত্রীভাবনা বলে তৃতীয়-চতুর্থ ধ্যানে ব্যাপাদ বিতর্কের ও করুণা ভাবনা বলে তৃতীয়-চতুর্থ ধ্যানে বিহিংসা বিতর্কের প্রভাব ক্ষীণ হয়। প্রত্যেক ধ্যানের পরিকর্মানুসারে ত্রিলক্ষণ সংমর্শন করে বিদর্শন জ্ঞান লাভ হয়। তখন বিদর্শন ভাবনার শক্তি প্রবল হয়।

সম্যক বাক্য

বাক্যে সংযমতাই হলো সম্যক বা সৎ বাক্যের অনুশীলন। মিথ্যা, কর্কশ ও বৃথা বাক্য পরিহার করা। অন্যের আচরণে যা প্রশংসাযোগ্য তা প্রশংসা করা। ভদ্র ও প্রীতিপূর্ণ আলোচনা করা এবং আলোচনা নির্দিষ্ট বিষয়ে সীমাবদ্ধ রাখা। কারো বিরুদ্ধাচরণ, কুৎসা রচনা ইত্যাদি বাক্য উচ্চরণ না করা। ধর্মপদে বলা হয়েছে, যে সকল বিজ্ঞজন সংযতকায়, সংযত বাক ও সংযত মনা তাঁরা সত্যি

Dhaka University Institutional Repository

সংযত।[৫৪] সম্যক বাক্যের প্রতিপক্ষ হচ্ছে বিরুদ্ধ বাক্য বা অলীক বাক্য। পালি সাহিত্য ধম্মপদে বলা হয়েছে, মা'বোচ ফরুসং কঞ্চি বুত্তা পটিবদেয়্যুতং, দুকখাহি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয়্যু তং। অর্থাৎ কাকেও কর্কশ বাক্য বলবে না, যাকে বলবে প্রত্যুত্তরে সেও কর্কশ বাক্য বলতে পারে। ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখদায়ক। দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকে ভোগ করতে হবে।[৫৫] বিরুদ্ধ বাক্য আবার চার প্রকার। যথা : মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, পরুষ বাক্য ও সম্প্রলাপ বাক্য।

মিথ্যা বাক্য[৫৬]

যে সকল ভাষা সত্য নয় তাই মুসাবাদা বা মিথ্যা কথা। অপরকে প্রবঞ্চিত করার উদ্দেশ্য প্রদুষ্ট মনে কায়-বাক্যের অপ প্রয়োগ করার নাম মিথ্যা। মানুষের লোভের কারণে এ মিথ্যা ভাষণের প্রবৃত্তি জন্মে। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত যাই বলুন না কেন পরস্পরের মধ্যে যে বিচ্ছিন্নভাব প্রকটরূপ নিয়েছে তার মূলে রয়েছে মিথ্যা প্রলোভন। মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের একটা সৎভাব তখনই গড়ে উঠে যখন উভয়ের মধ্যে মিথ্যার কোন লেশমাত্র না থাকে। তাই তথাগত বলেছেন, "মিথ্যা ভাষণ থেকে বিরত হও অর্থাৎ সভাস্থলে বিচারালয়ে, লোক সাক্ষাতে আত্মহেতু, পর হেতু, টাকা-পয়সাদি হেতু সজ্ঞানে জেনে শুনে কখনও মিথ্যা বলো না। সত্যবাদী, সত্য সম্বন্ধে স্থির প্রতিজ্ঞ ও বিশ্বাসী হও।"[৫৭] তথাগত বুদ্ধ একজন সত্যভাষীর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, যে মিথ্যাকে পরিহার করে সদা সত্য কথা বলে। যেখানেই সে থাকুক না কেন বা যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার নিজের সুবিধার জন্য বা অন্য কারও সুবিধার জন্য অথবা অন্য যেকোনো ধরনের সুবিধার জন্য জ্ঞাতসারে কখনও মিথ্যা বলে না। অপপ্রচার থেকে সে বিরত থাকবে। এখানে সে যা শুনবে অন্যত্র গিয়ে তা পুনরাবৃত্তি করে বিবাদ সৃষ্টি করে না এবং অন্যত্র শোনা কথা এখানে এসেও পুনরাবৃত্তি করে কলহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করে না। এভাবে সে বিভক্তদের একত্রিত করে এবং যারা একতাবদ্ধ তাদের উৎসাহিত করে। ঐক্যতাকে প্রফুল্ল করে। ঐক্যে সে আনন্দ পায় এবং ঐক্যের কথাই সে প্রচার করে। কাজেই প্রত্যেকটি মানুষের সত্যবাদী হওয়া আবশ্যক।

পিশুন বাক্য[৫৮]

পিশুন অর্থ কুৎসাকারী, নিষ্ঠুর বা বিদ্বেষমূলক। অর্থাৎ যে বাক্য ভাষণে শল-নোড়ায় পেষিত লংকার মত অপরের চিত্তকে ম্লান করে তাই পিশুন বাক্য। ইহা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে পরিবেশকে বিষাক্ত করে তোলে এবং নানা অনর্থের কারণ হয়। পিশুন বাক্যকে আবার লাগানো কথাও বলা হয়। যা দ্বারা তার কাছে নিজেকে প্রিয় করা ও অপরকে অপ্রিয় করার ভাব প্রবর্তন করা হয়।

পরুষ বাক্য[৫৯]

কুঠার তুল্য দ্বিধাকারী বা মর্মচ্ছেদী বাক্যকে বলা হয় পরুষ বাক্য। তা দ্বেষচিত্তজাত বিধায় নিজেকে ও অপরকে পরুষ বা কর্কশ বাক্য ব্যবহারে প্ররোচিত করে। কর্কশ ভাষা কেউ পছন্দ করে না এবং কর্কশভাষীকে সবাই এড়িয়ে চলতে চায়। যে এ শ্রেণির বাক্য দ্বারা পরকে আঘাত করে, সে তেমনি প্রত্যাঘাত লাভ করে এবং অকারণে শত্রুতা সৃষ্টি করে। তা শুনতে কর্কশ ও হৃদয় বিদারকও বটে ; তাই বুদ্ধ জনগনকে তা থেকে বিরত হয়ে কর্ণ সুখকর, নির্দোষ, প্রেমপদ, হৃদয়গ্রাহী, সদর্থপূর্ণ, বহুজনকান্ত বহুজনপ্রিয় বাক্য প্রয়োগ করতে অনুজ্ঞা করেছেন।

সম্প্রলাপ বাক্য[৬০]

সম্প্রলাপ বাক্য বলতে নিরর্থক আলাপ, অসার গল্প ইত্যাদি বুঝায়। তা মোহচিত্ত জাত। বাচালের অর্থহীন বাক্যালাপ ফেনপিণ্ডের মত অসার। বাচালতা সর্বদাই ঘৃণ্য। বুদ্ধ বলেছেন-শূন্যগর্ভ বাক্য, অসৎ প্রস্তাব, ঠাট্টা বা বিদ্রুপ বা সম্প্রলাপে বিরত হওয়া এবং কালবাদী, ভূতবাদী, ধর্মবাদী, বিনয়বাদী ও অর্থসংহিত, পরিমিত বাক্য প্রয়োগকারী হওয়া মানব মাত্রেই কর্তব্য। অসার কথা বলা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। সেরকম কথা বলা দরকার যা যথার্থ সময়োচিত এবং বাস্তবভিত্তিক, হিতকর, আইনশৃংখলা ও নিয়মানুবর্তিতা সম্মত, অমূল্য ধনের মতো মূল্যবান, যুক্তিসংগত, পরিমার্জিত ও অর্থবহ। সুতরাং সত্যানুসন্ধানী তথা মুক্তিকামী এবং সর্বজনহিকামী ব্যক্তিমাত্রই মিথ্যা, পিশুন, পরুষ ও সম্প্রলাপ পরিহার করে সর্বপ্রকার বাকদোষ-বিরহিত শুদ্ধ, সুন্দর মধুর ও অর্থপূর্ণ বাক্যালাপই করে থাকেন। যেমন বলা যায় মনোহর ভাষা মধুর মত মিষ্ট, সত্য কথা ফুলের

মত সুন্দর এবং মিথ্যা বা কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য আবর্জনার ন্যায় ক্ষতিকর। উপরোক্ত চর্তুবিধ বাক্য বিরতিই হলো লৌকিক সম্যক বাক্য।

সম্যক কর্ম

সৎ ও পবিত্রকর্ম সম্পাদন করাই হচ্ছে সম্যক কর্ম অর্থাৎ কর্ম সম্পাদন করলে মানুষের নৈতিক ও মানসিক অগ্রগতি বা আত্মিক উন্নয়নে সহায়তা করে। বৌদ্ধ পরিভাষায় শুভাশুভ বা কুশলাকুশল ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকেই কর্ম নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ চিত্ত ও চৈতসিকের কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অভিব্যক্তিই কর্ম। ভালমন্দ কাজের সংমিশ্রণেই মানুষ। মানুষ যে কাজ করে ঠিক সেরকম কাজের ফলভোগ করে। এটি মানুষের ব্যক্তি জীবনে যেমন সত্য, তেমনি সমষ্টিগত জীবনেও ঠিক তেমনই সত্য। প্রত্যেক মানুষকে সবসময় কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেকে তৈরি করে নিতে হয় এবং সে যেভাবে কাজ করে ঠিক তেমনই তার স্বভাব চরিত্র বা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয়। তাই সকল ক্ষেত্রে হিংসা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, অহমিকা ইত্যাদি পরিহার করা, বিশ্বের সকল মানুষ এবং সকল প্রাণীর প্রতি অপরিসীম করুণা, মৈত্রী ও প্রেম বিস্তার ও পিছিয়ে পড়া মানুষদের নানাভাবে সহায়তার জন্য নিঃস্বার্থভাবে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা ও নৈতিকতাপূর্ণ জীবন পরিচালনা, যেমন- হত্যা, চুরি, মিথ্যা কামাচার ব্যভিচার, নেশা দ্রবাদি পান ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীসহ সকলের সাথে সুসম্পর্ক বজায়, মাতা-পিতা ও স্ত্রী-পুত্রের সঠিক দায়িত্ব পালন ও সঠিক পরিচর্যা, দৈব-দুর্বিপাকে মানুষের পাশে দাঁড়ানো, কারো উন্নতিতে ঈর্ষাপরায়ণ না হয়ে আনন্দ বোধ করা, মানুষে মানুষে সম্প্রীতি, প্রেম, মমতা, সততা, সংযম, শ্রদ্ধাবোধ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি সম্যক কর্ম।[৬১] এই জগত অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখানে খুব কম লোকই সত্য দর্শনে সমর্থ। আর খুব কম লোকই জালমুক্ত পাখির ন্যায় স্বর্গারোহণে সমর্থ হয়।[৬২] তাই সত্য অবধারিত। বুদ্ধ সবসময় কর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বৌদ্ধ মতে কর্মই ধর্ম, কর্মই জীবন অর্থাৎ জীবন কর্মময়। কর্মফলেই জীবগণের জন্ম, কমই জীবগণের নিয়ন্তা। জীবন-মৃত্যু-সুখ-দুঃখ সবই কর্মাধীন এবং কর্মক্ষয়েই জীবের মুক্তি বা নির্বাণ। সাধারণত কর্ম দু' প্রকার। যথা- সুকর্ম ও দুষ্কর্ম। যে কর্ম সম্পাদন দ্বারা মনে সর্বদা প্রসন্নভাব, উদারতা এবং পবিত্রতা পরিপূর্ণ করে সে কর্মই সুকর্ম। তাতে

কোন অকল্যাণ আসতে পারে না, সুকর্মকে বলা হয় কায় সুচরিত। আর যে কর্ম সম্পাদন করলে মনে হিংসা-লোভের সঞ্চার হয়, বিদ্বেষ বহ্নি জ্বলে উঠে এবং মোহ ঘনায়িত হয় সে কর্মই দুষ্কর্ম। অর্থাৎ অসুন্দর ও অকল্যাণকর কর্মকে বলা হয় দুষ্কর্ম। কর্মের দ্বার তিনটি। যথা- কায়দ্বার, বাক্যদ্বার ও মনোদ্বার। এই তিনটি দ্বার দিয়ে জীব মাত্রই অহরহ কর্মে নিয়োজিত থাকে। তা থেকে এক মুহূর্তের জন্যও অবকাশ নেই। যেকোন কর্মে এই তিনটি দ্বারই এক সঙ্গে ব্যাপৃত থাকে। প্রাণীবধে বিরতি, অদত্তবস্তু গ্রহণে বিরতি, মিথ্যা কামাচারে বিরতি লোকীয় সম্যক কর্ম। কিন্তু আর্য চিত্তের, অনাস্রব চিত্তের, আর্যমার্গ ভাবনারত চিত্তের যে ত্রিবিধ কায় দুশ্চরিত্রে বিরতি, অরতি, বিমুখীভাব তাই লোকোত্তর সম্যক কর্ম।

সম্যক জীবিকা

সকল প্রকার অবৈধ, অন্যায়, অনিয়ম ও অসৎপথ পরিহার করে সৎ ও সুশৃঙ্খলভাবে জীবিকা নির্বাহ করাই হলো সম্যক জীবিকা। শীল বা সুন্দর চরিত্র সম্মত জীবিকা আহরণই সম্যক জীবিকা অর্থাৎ যে জীবিকার মধ্যে নিজের এবং অপরের কোন রকমের ক্ষতি এবং অশান্তির কারণ নেই তাকেই বলা হয় সম্যক জীবিকা। উল্লেখ্য যেসব ব্যবসা-বাণিজ্য নিজের জীবনকে কু-পথে নিয়ে যায় এবং পরিবার ও সমাজে সরাসরি অপরাধ, অস্থিরতা, অবক্ষয় ও অশান্তি ডেকে আনে সেসব বাণিজ্য না করা। জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে পাপ ও কলুষহীন হতে হবে। তাছাড়া কর্মবহুল জীবনে মানুষের পেশার অন্ত নেই। শুদ্ধ জীবনযাপন করতে হলে পেশা শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, শুধু অর্থাগমে কিংবা সম্মান লাভে পেশা শুদ্ধ হয় না। যে পেশায় অপরকে প্রবঞ্চনা করতে হয়, পীড়া দিতে হয়, অপরের প্রাণবধ করতে হয় সে পেশা শুদ্ধ হয় না। তাই তথাগত বুদ্ধ পাঁচ প্রকার[৬৩] অপরিশুদ্ধ বাণিজ্যকে নিষেধ করেছেন। যথা :

অস্ত্র বাণিজ্য : অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসার দ্বারা নিজেরও ক্ষতি হয় অপরেরও ক্ষতি হয় এমনকি এর দ্বারা একটা বহু মহামূল্যবান জীবনও নষ্ট হতে পারে।

প্রাণি বাণিজ্য : নিজের জীবনকে যেমন ভালোবাসো তেমনি অন্যের জীবনকেও ভালোবাসতে হবে। প্রত্যেকের কাছে জীবন অত্যন্ত মূল্যবান। আমি আমার প্রাণটাকে বা জীবনটাকে রক্ষা করতে চাই তেমনি সকলেই তো নিজের জীবনটাকে বাঁচাবার জন্য কামনা করে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

মাংস বাণিজ্য : মাংস ব্যবসা জীবনের পেশারূপে গ্রহণ করলে অবশ্যই প্রাণ সংহার করতে হয়। যেখানে আমার তোমার মধ্যে তফাৎ নেই সেখানে অন্য একটি অবোধ প্রাণির জীবন কী করে নষ্ট করতে পারি। প্রাণ রক্ষার চেয়ে প্রাণদাতার মূল্য অধিক। সুতরাং হত্যা করা সহজ, প্রাণ দান অসম্ভব।

নেশা বাণিজ্য : যা পান বা সেবন করলে স্বীয় সচেতন মন মানসিকতা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয় এমন জিনিস পান করা বিধেয় নয়। মানুষের তাই প্রয়োজন যেকোন ধরনের মাদক দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা যা তার মনকে কলুষিত করতে পারে এবং মোহাচ্ছন্ন বা লক্ষ্যভ্রষ্ট করতে পারে। নেশা দ্রব্য সেবন করলে যেকোন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

বিষ বাণিজ্য : অর্থ লাভের সুবিধার জন্য বিষ জাতীয় বস্তু বিক্রয় করা সমীচীন নয় যা ক্রেতারা খেয়ে নিজের মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করে দেয়, তা নিজের পক্ষেও ক্ষতিকর, অপরের পক্ষেও ক্ষতিকর। ক্ষতি হয় এমন জিনিস নিজে গ্রহণ এবং অন্যদেরকে গ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া মানবোচিত নয়।

তথাগত বুদ্ধ উপরোক্ত পাঁচ প্রকার নিষিদ্ধ বাণিজ্যের মহাকুফল দেখে সমগ্র জনগণকে তা বর্জন করে তা থেকে দূরে থাকার জন্য বলেছেন। সঙ্গে সঙ্গে জীবিকা অর্জনের উপায় হিসেবে তিনি বলেছেন- সুবিশুদ্ধ কায়, বাক্য ও মনে সৎ শিল্পকর্ম, কৃষিকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এবং চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করাই উত্তম জীবিকা। কিন্তু তিনি জীবিকা অর্জনের উপায়সমূহে সর্বজীবের প্রতি প্রেম, প্রীতি ও সদিচ্ছার কথা প্রকাশ করেছেন এবং এই মনোভাবের মাধ্যমে মানবগণ আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্ষেত্রে সুফল লাভ করে। সুতরাং নিষ্পাপ শুদ্ধ জীবন যাপন করাই সম্যক জীবিকা।

সম্যক ব্যায়াম

ব্যায়াম অর্থ শৌর্য-বীর্য, উদ্যম-পরাক্রম ইত্যাদি। মানব জীবনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে প্রবল প্রচেষ্টাই সম্যক ব্যায়াম। অর্থাৎ মনে দৃঢ়মূল কুচিন্তার বিনাশসাধন, নতুনভাবে মনে কুচিন্তার উৎপত্তি নিবারণ, মনে সৎচিন্তা আনয়ন এবং সৎচিন্তাকে মনে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টাকে সম্যক ব্যায়াম বলা হয়। তাই মনকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখার জন্য চেষ্টা ও অনুশীলনের প্রয়োজন। আর যে

Dhaka University Institutional Repository

সকল ধ্যানী, অধ্যবসায়ী, উদ্যোগী ও নিয়ত দৃঢ়পরাক্রমশীল, তাঁরা ক্রমে প্রশান্ত নির্বাণ লাভ করেন।[৬৪] সুতরাং লক্ষ্যস্থলে পৌঁছার জন্য যথার্থ সংকল্পকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে আন্তরিক, সৎ ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। বুদ্ধের ধর্মে আলস্যকে নিন্দা করা হয়েছে। উহাকে তৃষ্ণার একটি অন্যতম প্রধান উপাদান বলা হয়েছে। কারণ এটি দুঃখ ও ভোগান্তি আনয়ণ করে। বরং মানুষের সকল প্রকার উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রার জন্য উদ্যম, নিরবচ্ছিন্ন কর্মচাঞ্চল্য ও অধ্যবসায়কে উর্ধ্বে স্থান দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধ বলেছেন, যে অলস ও হীনবীর্য হয়ে শতবর্ষ জীবন ধারণ করে, তার চেয়ে দৃঢ় ও আরব্ধবীর্যবানের একদিনের জীবন ধারণও শ্রেয়।[৬৫] বুদ্ধ নিজেই প্রতিদিন দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতেন দুঃখী অসহায়দের নানাভাবে সাহায্য করতেন এবং তাদের জীবন আরো কিভাবে শান্তিময় ও মঙ্গলময় হতে পারে তার জন্য তাঁর ধর্মের ব্যাখ্যা করতেন। আর মনকে শুদ্ধ ও পবিত্র রাখার জন্য সব সময় অন্যায় কর্ম হতে বিরত থাকার ও কুশল কর্ম সম্পাদন করার জন্য বারবার চেষ্টা করতে হবে। মুক্তিকামীকে সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, কারণ নৈতিক জীবনে বেশ উন্নত ব্যক্তিরও পতনের আশংকা থাকে। অতএব মুক্তির পথে সম্যক প্রচেষ্টা নিতান্তই প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় সংযম, কু-চিন্তা পরিহার করে সু-চিন্তার উৎপাদন, উৎপন্ন সৎ-চিন্তার স্থিতি ও বৃদ্ধির প্রচেষ্টা। উত্তরোত্তর উন্নতি সাধনের জন্য উদ্যমের প্রয়োজন। সাধককে শত বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করতে হবে। বুদ্ধ বলেছেন, বীর্য বা উদ্যম দ্বারা সাধন করা যায় না এমন কোন কাজ নেই। দৈহিক, মানসিক সকল প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা, উচ্চতর সৎকর্মের মননশীলতা, চিত্তশুদ্ধির প্রবল অধ্যবসায়ই হচ্ছে সম্যক ব্যায়াম বা সৎ উদ্যম। আলস্যপরায়ণ এ লক্ষ্যে উপনীত হতে পারে না। বোধিদ্রুম মূলে বোধিসত্ত্বের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাই লক্ষ্য উপনতি হওয়ার উপায় ছিল। এ অধ্যবসায়ের গুণেই নিজের প্রচেষ্টা বা উদ্যমের ক্ষেত্রে বীর্যকে আরো গতিশীল করতে হয়। বীর্য হচ্ছে মানুষের জন্য স্তম্ভ সদৃশ।[৬৬] চার প্রকারে দৃঢ় পরাক্রম সহকারে সম্যক ব্যায়াম বা উদ্যম প্রচেষ্টা করা যায়। যথাঃ ১. উৎপন্ন পাপ বিনাশের জন্য উদ্যম বা প্রচেষ্টা ২.অনুৎপন্ন পাপ উৎপন্ন না করার প্রচেষ্টা ৩. অনুৎপন্ন পূণ্য উৎপন্ন করার প্রচেষ্টা ৪. উৎপন্ন পূণ্য রক্ষা ও বৃদ্ধির চেষ্টা।

সম্যক স্মৃতি

পালি ‘সতি’ শব্দের বাংলা স্মৃতি। স্মৃতি শব্দের অর্থ স্মরণ, প্রশান্তি, আত্মচেতন অবস্থা, একাগ্রচিত্ততা, ধারণা শক্তি ও মনোযোগিতা ইত্যাদি।[৬৭] কোন কার্য বিহিত হয়েছে এবং কোন কার্য নিষিদ্ধ হয়েছে যথাযথভাবে স্মরণে রাখাই স্মৃতি। স্মৃতি দ্বারা কুশল কর্মসমূহ স্মরণ করা হয়। অকুশল বিষয় মনে জাগ্রত হওয়া সম্যক স্মৃতি নয়। তাকে বলা হয় অকুশল চিত্তোৎপত্তি। স্মৃতি বলতে নির্মল নিষ্পাপ বিষয় স্মরণ। সৎকর্ম অপরিত্যাগই ইহার প্রধান লক্ষণ। সদা সতর্কভাব ইহার প্রধান কৃত্য। সর্ববিধ কুশল কর্মে স্মৃতির প্রাধান্য বিদ্যমান। স্মৃতিহীন মানুষ কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় বিভ্রান্ত। ভগবান বুদ্ধ স্মৃতিকে “সর্বার্থসাধক” বলে অভিহিত করেছেন।[৬৮] সুতরাং স্মৃতি বলতে বোঝায় কুশল কর্মসমূহ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করা। আর এটির অপর নাম হলো ‘অপ্রমাদ’। চঞ্চল চিত্তকে স্মৃতির দ্বারা সুন্দরভাবে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য, চিত্তকে রক্ষা করার ব্রত ব্যতীত অন্যান্য বহু ব্রত সম্পাদনে কোন লাভ নেই। ব্যাধি পীড়িত ব্যক্তি যেমন কোন কার্যের যোগ্য নয়, তেমনি স্মৃতি সম্প্রজ্ঞান রহিত চিত্ত কোন প্রকার কাজের যোগ্য হতে পারে না। ছিদ্রযুক্ত কলসীর মধ্যে যেমন জল থাকে না তেমনি স্মৃতি সম্প্রজ্ঞানহীন চিত্তের মধ্যে শ্রুতচিন্তা, শ্রদ্ধাশীল ও ভাবনাময় প্রজ্ঞা অবস্থান করে না। সুতরাং চিত্তরূপ প্রমত্ত হস্তীধর্মচিন্তারূপ স্তম্ভে যেন সর্বদা আবদ্ধ থাকে, তা হতে যেন মুক্ত না হয়, তারপ্রতি সর্বপ্রথম দৃষ্টি রাখতে হবে। আর অভিষ্ট লক্ষ্যস্থলে পৌছার জন্য সঠিক ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার সাথে যথার্থ মনোযোগিতা না থাকলে তা যেকোন সময় লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। সম্যক স্মৃতি চার প্রকার : কায়ানুদর্শন, বেদনানুদর্শন, চিত্তানুদর্শন ও ধর্মানুদর্শন। স্মরণ ও উপগ্রহণ হচ্ছে স্মৃতির লক্ষণ।[৬৯] সাধক বা সঠিক ব্যক্তি যখন স্মৃতি করেন তখনই স্মরণ হয়। রাজার ভাণ্ডাগারিক সন্ধ্যায় ও সকালে তার রাজভাণ্ডারে কত ঐশ্বর্য, ধনদৌলত আছে স্মরণ করিয়ে দেয়। তদ্রূপ স্মৃতি সাধককেও স্মরণ করিয়ে দেয়। উপগ্রহণ হচ্ছে উৎপদ্যমান স্মৃতি হিতাহিত ধর্মসমূহের প্রতি অন্বেষণ। এ সকল ধর্ম হিতকর না অহিতকর। উপগ্রহণ[৭০] এ অর্থে উপকারক। সেনাধ্যক্ষ রাজার হিতাহিত বিষয়গুলো জানেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাধ্যক্ষ রাজাকে সতর্ক করে দেন। উপগ্রহণ স্মৃতির ক্ষেত্রে তদ্রূপ। রাজা মিলিন্দের প্রশ্নোত্তরে ভিক্ষু নাগসেন বলেছিলেন-সপ্তদশ প্রকারের স্মৃতির উদয় হইতে পারে। যথা-অভিজ্ঞ, কত্রিম উপায়, স্থূল

ঘটনা, হিত বিজ্ঞান, অহিত বিজ্ঞান, সদৃশ, বিসদৃশ, কথাভিজ্ঞা, লক্ষণ, স্মরণ, মুদ্রা, গণনা, ধারণা, ভাবনা, গ্রন্থ, স্থাপন ও অনুভূতি।[৭১] সুতরাং স্মৃতি হলো সর্ব বিষয়কে জাগ্রত রাখা এবং কায় বেদনা, চিত্ত ও মানসিক ধর্মসমূহের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জাগ্রত বা সচেতন থাকা।

সম্যক সমাধি

সমাধি শব্দের অর্থ সমাহরণ, এককেন্দ্রে মিলন, মনের আত্মস্থির অবস্থা, মনের অভিনিবিষ্ট অবস্থা ও একাগ্রচিত্ত অবস্থা। ইন্দ্রিয়াদির নিরোধ দ্বারা কোনো এক বিষয়ে মনোনিবেশ করলে তাকে একাগ্রতা বলা হয়, একাগ্রতা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হলে তাকে ধারণা বলা হয়, ধারণা বদ্ধমূল হলে তাকে ধ্যান বলা হয় এবং ঐ ধ্যান বদ্ধমূল হলে তাকে বলা হয় সমাধি।[৭২] অভিধম্মপিটকে এইরূপ বর্ণনা আছে, যাহা চিত্তকে সম্যকরূপে স্থির রাখে, আরক্ষ্মনে সু-প্রতিষ্ঠিত রাখে, চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে না, বিচলিত করে না, চিত্তকে প্রশান্ত ও অনাসক্ত রাখে এবং সমাধি-ইন্দ্রিয় ও সমাধি বলকে ঋজুপথে রাখে, তাহার নাম সমাধি।[৭৩] চার সম্যক প্রধান (সংবর প্রধান, প্রহাণ প্রধান, ভাবনা প্রধান ও সংরক্ষণ প্রধান) সমাধির আবশ্যকীয় উপকরণ। এই সমুদয়ের অভ্যাস, অনুশীলন, পুনঃ পুনঃ সম্পাদনই সমাধি ভাবনা, একটি মাত্র বিষয়ে চিত্তের অটল অবস্থাই একাগ্রতা বা ধ্যান। বিতর্ক, বিচার, প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা ধ্যানাঙ্গ। পঞ্চনিবরণ নাশে পঞ্চ ধ্যানাঙ্গ পূর্ণ হয়। যেমন : বিতর্ক- জ্ঞান বিপ্রযুক্তরূপে অনুভব করেন, চিন্তাকরণ শান্তভাব ধারণ। উদ্ভাবন করণ এবং ন্যায়ত উচ্চাভিলাষী হওয়া বিতর্ক ধ্যান। বিচার- চিত্তের একাগ্র অবস্থার নাম বিচার ধ্যান। প্রীতি- চিত্ত অত্যন্ত প্রফুল্ল, সুস্থির ও শান্তিপূর্ণ থাকে তাকে প্রীতি বলে। সুখ- প্রিয় ও আরামদায়ক বস্তুর সংস্পর্শই সুখ। একাগ্রতা- সমাধি উৎপত্তির হেতু সমূহ উত্তমরূপে অবগত হয়ে নির্জন স্থানে প্রবেশ করে সমাধির নিমিত্ত যোগে নৈপূণ্য সহকারে চিত্তে শান্তি উৎপাদন করাই একাগ্রতা। বুদ্ধ বলেছেন-

‘যোগা বে জাযতি ভূরি অযোগা ভূরিসঙ্খযো
এতং দ্বেধাপথং ঞত্বা ভবায বিভবায চ,
অত্থত্তানং নিবেসেয্য যথা ভূরি পবড্ঢতি।[৭৪]

অর্থাৎ, ধ্যান থেকে জ্ঞান, ধ্যানে আনে মনের একাগ্রতা, আর বিষয়ের সম্যক বিশ্লেষণে মনে জ্ঞানের আলোকপাত হয়। ধ্যান সাধনার অনুশীলনের অভাবে চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে মানবের জ্ঞানার্জনের বা দুঃখ মুক্তির পথে বিঘ্ন ঘটায়। সেজন্য সাধককে এ দুই সম্যকভাবে জেনে বৃদ্ধির জন্য ধ্যান-সাধনায় নিমগ্ন হতে হবে। ধ্যান অনুশীলনকারীর জন্য দশটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ধ্যানে বসা উচিত। সে দশ বিষয় হলো[৭৫] নানামাত্রিক দায়িত্ব ও কামনা বিষয়ক। উৎস যেমন: ১. বাসস্থান বা বাড়ি-ঘরের কর্ম ও তত্ত্বাবধান, ২. জ্ঞাতিকুলের সাথে সংশ্লিষ্টতা, ৩. প্রাপ্তির প্রত্যাশা, ৪. জনাকীর্ণ স্থান, ৫. কর্ম-ব্যস্ততার উৎকণ্ঠা, ৬. দীর্ঘ পথযাত্রার উৎকণ্ঠা, ৭. স্বজনের প্রতি কর্তব্য (মাতা-পিতা ও গুরু প্রমুখের সেবা) ৮. ব্যাধি, ৯. অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যস্ততার উৎকণ্ঠা এবং ১০. ঋদ্ধি প্রদর্শনে কামনা বা অভিলাষ ইত্যাদি পরিত্যাজ্য।

সমাধি বা ধ্যান লাভের ক্ষেত্রে বুদ্ধ আট প্রকার[৭৬] ধর্মকে অন্তরায় বলেছেন। উৎস যথা : ১. লোভ ২. দ্বেষ ৩. আলস্য-উদ্ধত্য ৪. অনুশোচনা ৫. সন্দেহ ৬. মোহ ৭. প্রীতি ও ৮. সুখ।

কাম্য বস্তু পাওয়ার প্রবল বাসনাকে লোভ বা লালসা বলা হয়। মরীচিকা যেমন তৃষ্ণাকাতর মৃগকে প্রলুব্ধ করে অন্তহীন মরুপ্রান্তরে অশেষ দুঃখ ভোগায় তেমনি লোভ সুখের কুহকে জীবকে প্রলুব্ধ করে অকুল সংসার পাথারে অনন্ত যন্ত্রণা দেয়। লোভ মানুষকে সারাক্ষণ অন্যের জিনিসে নিজের মনকে মগ্ন রাখে।

দ্বেষ অর্থ হিংসা, পরশ্রীকাতরতা, বিরাগ বা বৈরিভাব।[৭৭] দ্বেষ মানুষের অন্তরে উৎপন্ন হলেই মুখের ভঙ্গিতে ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিকৃতিতে ফুটে উঠে। তা যেমন পরের ক্ষতি সাধন করে, তেমনি নিজের ক্ষতি সাধনেও তৎপর। বলা বাহুল্য বিদ্বেষপ্রসূত হানাহানিতে পৃথিবীর বুকে রক্তগঙ্গা বয়েছে, গ্রামনগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং মানুষের মধ্যে নৃশংস বর্বরতার নগ্নরূপ ফুঠেছে। এর ভয়াবহতা অবর্ণনীয়।

অহংকার, অনুতাপ, অনুশোচনা, ক্ষোভ এবং এদের থেকে সৃষ্ট উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগই উদ্ধত্য। চিত্তের অস্থিরতা সৃষ্টি এর লক্ষণ এবং অস্থিরতা সম্পাদন এর কৃত্য।

অনুশোচনা হলো অনুতাপ, শোক, বিলাপ, দুঃখ প্রকাশ।[৭৮] মানুষ তার কৃতকর্মের জন্য বা গত বিষয়ের জন্য যে দুঃখ প্রকাশ করে তাই অনুশোচনা।

সন্দেহ হলো সংশয়, ভয়, দ্বৈধজ্ঞান বা অনিশ্চয়তা।[৭৯]

অচৈতন্য, অবিদ্যা, প্রবঞ্চনা, আত্মাভিমান, মনঃপ্রাণের নিরানন্দতা। রাগ-দ্বেষ-মোহ এই তিনটি মৌলিক বা প্রধান চিত্তদোষের একটি হলো মোহ। এই তিনটি মৌলিক কারণে মানুষ যথার্থ সত্যকে আয়ত্ত করতে পারে না, এমন কি সত্য সন্ধানের পথেও প্রবেশ করতে পারে না। মোহ হলো সর্বপাপের মূল কারণ।[৮০]

প্রীতি অর্থ উল্লাস, প্রসন্নতা, আহলাদ, মানসিক সুগভীর অনুভূতি, অতিরিক্ত আস্বাদন, আনন্দের আবেগ।[৮১] সূর্যকিরণ যেমন কুসুমকোরককে বিকশিত করে, তেমনি প্রীতিচৈতসিক চিত্তকে প্রফুল্লভাবে প্রসারিত করে। অর্থকথায় প্রীতির বর্ণনা প্রসঙ্গে পঞ্চবিধ প্রীতির উল্লেখ আছে, যথা- ক্ষুদ্রিকা, ক্ষণিকা, অবক্রান্তিকা, উদবেলা ও স্ফুরণা। রোমাঞ্চকর পুলককে বলা হয় ক্ষুদ্রিকা। বিদ্যুতের মত ক্ষণে ক্ষণে যে পুলকের সঞ্চার হয় তা ক্ষণিকা প্রীতি। সমুদ্রতটে তরঙ্গোচ্ছ্বাসের মত হৃদয়ে যে প্রীতির আবেগোচ্ছ্বাস হয় তাকে বলা হয় অবক্রান্তিকা। প্রীতির প্লাবনে হৃদয় যখন উদবেলিত উচ্ছলিত হয়, তখন সে প্রীতি উদবেলা নামে অভিহিত হয়। সর্বাঙ্গে যে পুলকের শিহরণ জাগে তা স্ফুরণা প্রীতি নামে উক্ত। প্রীতি উৎপন্ন চিত্ত অত্যন্ত প্রফুল্ল ও সুস্থির হয়। চিত্ত শান্তিপূর্ণ থাকে। ধ্যানীর প্রীতিভাব হলো এটির লক্ষণ। প্রফুল্লতা এটির রস, চিত্ত বিক্ষেপ নিবারণ এটির প্রত্যুস্থান, চিত্ত-লঘুতা এটির পদস্থান।[৮২]

সুখ অর্থ আনন্দ, হর্ষ, কুশল, প্রীতি, সাফল্য ও দুঃখাদি হতে মুক্তি। সুখ বলতে বোঝায় আনন্দদায়ক সংস্পর্শজনিত অভিজ্ঞতার স্বভাব বা প্রকৃতি-সম্বন্ধীয়। প্রিয় ও আরাম-দায়ক বস্তুর সংস্পর্শই সুখ। ধর্মপদ অটঠকথায় সুখ তিন প্রকার। যথাঃ প্রশংসাজনিত সুখ, ঐশ্বর্য সুখ ও স্বর্গ সুখ।[৮৩]

মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সবই মন থেকে উৎপন্ন হয়। মনই সব কিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করে। রাগ, দ্বেষ, মোহ, ক্রোধ, আসক্তি, মায়া, তৃষ্ণা, আকাঙ্খা ইত্যাদি মনকে সর্বদা বিচলিত, অস্থির, অশান্ত ও চঞ্চল করে তোলে। আর এই অস্থির, অশান্ত ও চঞ্চল মনে কোন কাজই সুসম্পন্ন হতে পারে না। কোন প্রকারের শুভ কাজই করা যায় না। মনকে পরিশুদ্ধ, নির্মল ও প্রশান্ত করার মাধ্যমে একজন মানুষ সব কিছুকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারেন ভূল, ভ্রান্তি ও জীবনের

Dhaka University Institutional Repository

যথার্থতা নির্ণয় করতে পারেন এবং চিন্তা ও চেতনাকে উত্তরোত্তর আরো উচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পারেন। তখন মনের সকল অজ্ঞতা, অন্ধকার ও কলুষতা ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে মন এমন স্তরে পৌছে যায় যেখানে রয়েছে এক অনির্বচনীয়, অপরিমেয় ও অনাবিল আনন্দ, সুখ আর প্রশান্তি।

মানুষের সকল সাফল্য, অগ্রযাত্রা ও প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছে এ সকল পথ। আর এই অষ্টপথ একজন সাধককে তার শীল-সমাধি-প্রজ্ঞার সর্বোচ্চ চূড়ায় নিয়ে যেতে পারে। চতুরার্য সত্য ও আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে প্রখ্যাত বৃটিশ দার্শনিক ও পালি সাহিত্যের গবেষক T. W. Rhys Davids এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, 'Buddhist or non-Buddhist, I have examined every one of the great religious systems of the world and in none of them have I found anything to surpass, in beauty and comprehensiveness, the Noble Eight-fold Path and the Four Noble Truths of the Buddha. I am content to shape my life according to that path.'[৮৪] আমি বিশ্বের বৌদ্ধ ও অবৌদ্ধ সব বড় বড় ধর্মীয় বিধি-বিধান সমূহ পরীক্ষা করে দেখেছি। সৌন্দর্য ও ধীশক্তির ব্যাপকতার নিরিখে বুদ্ধের আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও চতুরার্য সত্যকে অতিক্রম করার মত কোন কিছু অন্য কোন খানে আমি খুজেঁ পাইনি। ঐ মার্গানুসারে আমার জীবন গঠন করে আমি পরিতৃপ্ত।[৮৫]

একজন একনিষ্ঠ নির্বাণকামীর জন্য সম্যক দৃষ্টি হচ্ছে তাঁর আলোকবর্তিকা, সম্যক সংকল্প- তাঁর পথপ্রদর্শক, সম্যক বাক্য-তাঁর পথমধ্যস্থিত প্রতিষ্ঠানক্ষেত্র, সম্যক কর্ম-তাঁর বিমল আনন্দ, সম্যক জীবিকা-তাঁর অবলম্বন, সম্যক ব্যায়াম-তাঁর পদক্ষেপ, সম্যক স্মৃতি-তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস এবং সম্যক সমাধি-তাঁর শান্তির আবহ।[৮৬]

পালি সাহিত্যের বিন্যাসশৈলীর পর্যালোচনায় শীল

পালি সাহিত্য তথা ত্রিপিটকের সূত্রপিটকের অন্তর্গত দীর্ঘ নিকায় তিন ভাগে বিভক্ত। এ তিন ভাগের এক ভাগের নাম হলো শীলখন্ধ (সীলক্খন্ধ)। এখানে শীল বা নৈতিক গুরুত্ব বিষয়ক

Dhaka University Institutional Repository

তেরটি সূত্র রয়েছে। জীবন-জীবিকার আবশ্যক বহু বিষয় এতে সংযুক্ত হয়েছে। এগুলোর করণীয়-অকরণীয় সম্পর্কে এখানে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[৮৭]

মজ্‌ঝিম নিকায়ের প্রথম খণ্ড (মূল পঞ্ঞাশ খণ্ড) ৫০ টি সুত্র রয়েছে। এখানে বর্গ রয়েছে পাঁচটি। প্রতিটি বর্গে ১০ টি করে সূত্র রয়েছে। বর্গ পাঁচটির মধ্যে পঞ্চম বর্গের নাম হলো ক্ষুদ্র যমক বর্গ। এ বর্গের অন্যতম একটি সূত্র কোসাম্বী সূত্র। এ সূত্রে ছয়টি সাধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেইগুলোর মধ্যে একটি বিষয় হলো শীলাচারী হয়ে সতীর্থদের মধ্যে বিরাজ করার কথা বলা হয়েছে। এ নিকায়ের তৃতীয় খণ্ডে (সেল পঞ্ঞাশ খণ্ড) ৫২ টি সূত্র রয়েছে। এগুলো পাঁচটি বর্গে বিভক্ত। বর্গ হলো : দেহ বর্গ, অনুপদবর্গ, শূন্যতাবর্গ, বিভঙ্গ বর্গ, যড়ায়তনবর্গ। এই সূত্রগুলোতে বর্গের নামানুসারে কোন একটি বিশেষ বিষয়কে প্রকাশ বা ব্যাখ্যা করা হলেও প্রত্যেক সূত্রে প্রকারান্তরে–শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, বিমুক্তি ও নির্বাণ ইত্যাদির মূল্যবোধ সম্পর্কে যথাযথ আলোচনা হয়েছে।

সংযুক্ত নিকায়ের পাঁচ খণ্ডের সর্বশেষ খণ্ডের নাম হলো মহাবর্গ। এতে বারটি অধ্যায় আছে। অধ্যায় গুলোতে বহুবিধ বিবরণ ও বিষয় আলোচিত হয়েছে। কিন্তু প্রত্যেকটির মূল আবেদনগুলো হলো সর্বদুঃখের অবসান ঘটিয়ে পরম শান্তি নির্বাণ লাভের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। তাই জীবনকে স্বচ্ছ-সুন্দর ও নির্দোষ আচরণে নিয়ন্ত্রিত রাখা চাই। এই আদর্শ প্রত্যয়ে মানুষকে উজ্জীবিত করাই এই নিকায়ের মূল বক্তব্য।

খুদ্দক নিকায়ের সর্বশেষ গ্রন্থ হলো চরিয়াপিটক। এতে অনেক কাহিনির কিছু কিছু অংশ 'জাতকের সাথে সামজঞ্জস্য বিধান করে। কিন্তু সামঞ্জস্য বিধান করলেও জাতক ও চরিয়াপিটকে কাহিনি উপস্থাপনের প্রেক্ষাপট বা প্রসঙ্গ অবশ্যই ভিন্ন। উভয়ক্ষেত্রেই অবশ্য সততা, শীল সাধনা, তথা শ্রোতার কল্যাণার্থে এই কাহিনি উপস্থাপন করা হয়েছে।

বিনয় মানে নীতি, নিয়ম, শৃঙ্খলা। বৌদ্ধ সাহিত্যে এ বিষয়টিকে সহজভাবে বলা হয় শীল। প্রকৃতিরও নিজেস্ব নিয়ন্ত্রণ নীতি আছে। জগতের সব কিছুই নিয়ন্ত্রণাধীন। অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে কোনো কিছুই টিকে থাকতে পারে না। গ্রহ, তারা, ঋতুচক্র নিয়মে আবর্তিত হয়। বিশ্ব জগতের অনন্ত সৌন্দর্য, আকাশের সূর্যরশ্মি, রঙধনুর বর্ণের সমারোহ, এমনকি অঙ্কুরিত

Dhaka University Institutional Repository

তৃণখণ্ড পর্যন্ত একটি কার্যকারণ নিয়মে আবদ্ধ। নিয়ম বর্হিভূত কোন কিছুর বৃদ্ধি ও বিনাশ কিংবা স্থায়িত্ব আশা করা যায় না। কারণ প্রত্যেকটি বিষয়ই কার্য-কারণ-শৃঙ্খলের রীতিতে আবদ্ধ। মানুষের কল্যাণে এই নিয়ম-নীতির উপযোগিতা অত্যধিক। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এ সত্য আমরা হাটে-মাঠে-ঘাটে ও ঘরের মর্মে উপলব্ধি করি। অসংযমতা, অনৈতিকতা, অমিতব্যয়িতা, আলস্যপরায়ণতা, প্রমত্ততা প্রভৃতি সমস্ত প্রকার নীতি বিরুদ্ধ আচরণ সকল উন্নতির পরিপন্থী। অন্যদিকে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সংযম, ধীরতা, আত্মত্যাগ, চরিত্রবল, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা, নিয়মানুবর্তিতা, উদ্যম-উৎসাহ ইত্যাদি হলো উন্নতির সহায়ক শক্তি।

মহামানব বুদ্ধ তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা হতে এই চরম সত্যকে প্রকৃষ্টভাবে উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের মাঝে প্রথমেই শীল পালনের কথা বলেছেন। সম্বোধি লাভোত্তরকালে তিনি সর্বপ্রথম দেশনা করেন পঞ্চবর্গীয় সাধকের কাছে। যাঁরা পরে বুদ্ধের কাছে দীক্ষিত হন এবং উপসম্পদা লাভ করেন। তাঁরা পঞ্চবর্গীয় বুদ্ধশিষ্য নামে খ্যাতি অর্জন করেন।

বুদ্ধের প্রথম দেশনায় তিনি 'চার আর্য সত্য' বর্ণনা করেন।[৮৮] যেখানে জগৎ দুঃখময় এই পরম সত্যটি সহজে উপলব্ধ হয়। বস্তুত এটি হলো শীল দেশনার প্রেক্ষাপট। তারপর তিনি দুঃখমুক্তির উপায় দেশনা করলেন, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। আটটি বিশুদ্ধ পালনীয় নীতি।[৮৯] যে নীতি পারলৌকিক শান্তির অভিপ্সা পূরণের জন্য নয়, ইহজগতের বাস্তবতায় একটি নির্ঝঞ্ঝাটি, নিরূপদ্রব, সুস্থ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন। পরবর্তীতে বুদ্ধ এই বাস্তবভিত্তিক নীতিমালাকে অধিক স্বচ্ছ ও সর্বজনের সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে বাস্তবসম্মত ধারায় একটি সুপরিসর বিধিমালার প্রবর্তন করলেন যা বুদ্ধশিষ্য ভিক্ষু-শ্রমণদের অবশ্য পালনীয়।

বিনয় পিটকের সুত্তবিভঙ্গের পারাজিকা ও পাচিত্তিয়ার সমন্বয়ে হয়েছে পাতিমোক্খ। এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুনীদের জন্য নির্ধারিত শীল সম্পর্কে আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অভিধর্ম পিটকের পুগ্গল পঞ্ঞত্তি গ্রন্থে ব্যক্তির চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায় যে, পুরো ত্রিপিটকের বিভিন্ন জায়গায় শীল সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শীলের বৈশিষ্ট্য

সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতে হলে শীলের মাহাত্ম অপরিহার্য। শীলই মানুষকে সৎপথে পরিচালিত করে। শীল মানব জীবনের প্রথম ধাপ। শীলকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হলেও এর বৈশিষ্ট্য সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। আর শীলের বিশেষত্ব হলো সংকল্প বা অনুশীলন।[৯০] ভিক্ষুদের জীবনপ্রণালীর জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি ধ্যান সাধনার প্রথম সোপান শীল। নিম্নে শীলের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। যথা :

মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন ও সার্থকতা সম্পাদন করতে হলে নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলা রক্ষা করে চলতে হয়। শীল কায়, বাক্য এবং মনোময় কর্মের মাধ্যমে প্রতিপালন করা হয়। ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবনকে এই কর্মপ্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শীল বহু প্রকার হলেও শৃঙ্খলার বৈশিষ্ট্য এবং অনুশীলন (শীলন) সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে বিদ্যমান থাকে। শীল পালনে চিত্তের চঞ্চলতা তিরোহিত হয়। চরিত্রে সংযমতা বর্ধিত হয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীভূত হয়।

মানব জীবনে চিত্তের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের ভিত্তি হলো শীল। উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছাড়া জীবনে কিছু অর্জিত হয় না। উৎসাহের কারণেই কর্ম শক্তি সৃষ্টি হয়। তাই নিজেকে হীন দুর্বল ভেবে হতাশ হওয়া উচিত নয়। যে ব্যক্তি বাক্যে ও চিত্তে সংযত থাকবে। শরীরের দ্বারা কোন প্রকার অপবিত্র কর্ম করবে না। এই ত্রিবিধ কর্ম পথকে বিশুদ্ধ রাখবে এবং ঋষিগণ নির্দেশিত মার্গে বিচরণ করবে।[৯১]

চেতনা হলো কোনো বিষয়ে যা চিন্তা করা যায়। চেতনাই লোভ, দ্বেষ ও মোহের বশীভূত হয়ে কর্মে পরিণত হয়। চেতনায় শীল বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হলেও এর বৈশিষ্ট্য কিন্তু সর্বত্র বিরাজমান। যেমন বলা যেতে পারে, নীল, হলুদ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি আকার এবং বর্ণরূপে বহু প্রকার হলেও একটি বৈশিষ্ট্য তাতে বিদ্যমান অর্থাৎ পরিদৃশ্যমানতা সর্বদা বর্তমান।

শীল সম্পন্ন ব্যক্তি নিজের দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। পাশাপাশি অন্যের প্রতি নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়। সমাজ জীবনে এ শিক্ষা ব্যক্তিকে দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং অধিকার সচেতন একজন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

একজন শীল সম্পন্ন ব্যক্তি সকলের মধ্যে কাঙ্খিত ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে। শীলবান ব্যক্তি নিঃস্বার্থভাবে সকলের সাথে মিলেমিশে অবস্থান করে থাকে। তাদের লক্ষ্যগত ঐক্য, অবস্থানগত নৈকট্য এবং মানসিক দৃঢ়তার ঐক্য গড়ে তোলে এবং মানুষে মানুষে ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় তা কার্যকর ভূমিকা রাখে।

শীল মানুষকে উৎকৃষ্ট গুণাবলি ও কর্মশক্তি দান করেছে। উন্নত মেধা, নীতিবোধ, চিন্তা ও সৃজনশীলতাসহ অসংখ্য ভালো ভালো গুণ মানুষকে মর্যাদাবান করে তুলেছে। শীলের আসল লক্ষ্য হলো নীতি ও কর্মের মিলন ঘটিয়ে জীবনের প্রতিষ্ঠা ও জীবনের গভীরতম সত্যের উপলব্ধি। কর্মশক্তির প্রভাবেই মানুষ ক্রমে ক্রমে উন্নতির শিখরে আরোহণ করে প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। আর প্রকৃষ্ট জ্ঞানই চরম মুক্তি।

দার্শনিক তাৎপর্যতায় শীল

কায়, বাক্যে ও মনের রুক্ষতা ও কর্কশতা নিবারণ, উচ্ছৃঙ্খলতার অপসারণ, বধ-বন্ধন-প্রহার, আটক, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার, মিথ্যাকথন, পিশুন বাক্য (গর্ব), সম্প্রলাপ, পরুষবাক্য (কর্কশ), নেশাদ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি থেকে বিরতিই শীলের কার্য।[৯২] উল্লেখ্য, প্রত্যেক শীলে পালি শব্দ বেরমণী অর্থাৎ বিরতির প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে বিরতি-বিরত হওয়া নিষেধার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। শীল হচ্ছে সুকর্ষিত উর্বর ভূমি, সকল গুণের আধার। সুশীল সমাজের মেরুদণ্ড বিশেষ, কারণ এতে প্রাণির প্রাণবায়ু নিঃসরণ ও কায়-বাক্য-মন এ ত্রিদ্বারে উৎপন্ন অসৎকর্মের চিত্তানল নেই। শীল হচ্ছে সমাধি ও প্রজ্ঞার জননী যার অন্তরে দুঃখ বেদনা নেই। শীল আনন্দদায়ক কুঞ্জবন-হৃদয়ের পরিচ্ছন্ন উচ্ছাস। শীল বাহ্যিক কোন বস্তুবিশেষ নয়। এটা চিত্তেরই বিরতি নামক চৈতসিক পর্যায়ভূক্ত। ভালো-মন্দ যা কিছু কাজ সম্পাদিত হোক না কেন, চৈতসিকের ওপর নির্ভরশীল। শরীরের পেশাসমূহের অনুশীলন যেমন দেহ বলিষ্ঠ ও কর্মক্ষম হয়, অনুশীলিত বিরতিও শান্তি সম্পন্ন হয়ে মানুষকে শীলবান করে তোলে। শীল শান্তির গুণাবহ বলে একে আদিকল্যাণ বলা হয়। শীল ত্রিবিদ্যারই উপনিশ্রয়।[৯৩] কারণ, শীল দুঃশীলতার অপচয় সাধন করে। শীল দ্বারা কাম-সুখানুযোগ ও কৃচ্ছতা–এ অন্তদ্বয়ের প্রথম অন্ত বর্জন করা যায় এবং দুঃশীলতার অপচয় সাধিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামীও অনাগামী–এ তিন স্তরের পথনির্দেশকে সমুজ্বল করে। আবার এ শীলই মানুষের অন্তরের অভিধ্যা (লোলুপতা), ব্যাপদ (কুপ্রবৃত্তি) ও মিথ্যাদৃষ্টি ধবংসের উপনিশ্রয় সমুৎপন্ন করে। কারণ চিত্তের অবিদ্যাভাব থেকেই 'বিরতি' উৎপন্ন হয়। শীলবিশুদ্ধির স্তর থাকলেও যে কোনো সময় বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই শমথ ধ্যানের মাধ্যমে রূপারূপ অষ্ট সমাপত্তি ভঙ্গ হয়। শমথ ধ্যানের বিদর্শন ভাবান্তর অনুস্মৃতির দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধ আনায়ন করতে হলে শীলবিশুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন।

শীলহীনতা ও শীলের লঙ্ঘন

বায়ু না থাকলে যেমন মানুষের জীবন থাকে না। সেইরূপ শীল বা চরিত্র না থাকলে মনুষ্যত্ব থাকে না। শীলহীন ব্যক্তি সকলের ঘৃণার পাত্র। মানব সমাজে তার স্থান নেই। শীলহীন ব্যক্তি মাঝি বিহীন নৌকার ন্যায়, জীবনে তারা প্রতিনিয়ত হরেক রকম বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়। প্রবাদে আছে :

When money is lost nothing is lost, when health is lost something is lost but when character is lost all is lost.

টাকা বাড়ি হারালে কিছুই হারায় না, স্বাস্থ্য হারালে কিছু হারায়, কিন্তু চরিত্র হারালে সব কিছুই হারাতে হয়। শীলহীন ব্যক্তির বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-সম্পদ যতই থাকুক না কেন এসবের কোন মূল্য নেই। মানুষ তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে না। তারা শুধু মানুষের অভিশাপ ও অপবাদের পাত্র হয়ে থাকে। সাপের মাথায় মণি থাকলেও সবাই যেমন সাপকে ভয় পায়, তেমনি গুণী শীলহীন ব্যক্তিকে সকলেই এড়িয়ে চলে। তার দ্বারা সমাজ, দেশ বা জাতি কেউ উপকৃত হয় না। সকলেই তাকে ঘৃণা করে। গুণী শীলহীন ব্যক্তির কাছ থেকে বিদ্যা লাভের প্রত্যাশা থেকে জীবননাশ তথা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা বেশি। সে বিদ্বান হলেও সর্বত্র পরিত্যাজ্য। ধর্মপদে বলা হয়েছে :

যো চ বস্‌সতং জীবে দুস্‌সীলো অসমাহিতো,

একাহং জীবিতং সেয্যো সীলবন্তস্‌স ঝায়িনো।[৯৪]

অর্থাৎ, যে দুশ্চরিত্র ও অসমাহিত চিত্ত হয়ে শতবর্ষ জীবন ধারণ করে, তার চেয়ে সচ্চরিত্র এবং সাধনচিত্ত ব্যক্তির একদিনের জীবন ধারণও শ্রেয়। বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্র ধর্মপদে নিম্নরূপ আরো উল্লেখ আছে :

দিসো দিসং যং তং কযিরা বেরী বা পন বেরিনং ,

মিচ্ছাপণিহিতং চিত্তং পাপিযো নং ততো করে।[৯৫]

অর্থাৎ, বৈরী বৈরীর বা শত্রু শত্রুর যে অনিষ্ট সাধন করে, বিপথে পরিচারিত চিত্ত তার চেয়েও অধিক অনিষ্টকারী হয়।

পালি সাহিত্যে 'পারাজিকা'[৯৬] যিনি পারাজিকাগ্রস্থ হবেন তিনি সংঘের সদস্য হিসেবে অবস্থান করতে পারবেন না। আপত্তি সমূহের মধ্যে পারাজিকাই সবচেয়ে গুরুতর। ভঙ্গ করলে সেখানে সরাসরি শাস্তির বিধান রয়েছে কিন্তু শীল লঙ্ঘন করলে সরাসরি শাস্তির বিধান নেই। তবুও কতগুলো অনর্থ ঘটে থাকে। মহাপরিনিব্বান সুত্তং এ উল্লেখ আছে পঞ্চশীল লঙ্ঘনকারী দুঃশীল ব্যক্তির পাঁচটি[৯৭] অনর্থ ঘটে থাকে। যেমন :

১. ইহলোকে যে দুঃশীল ব্যক্তি পঞ্চশীল ভঙ্গ করে তার মহাভোগ সম্পত্তি থাকলেও প্রমাদ বশতঃ তা বিনষ্ট হয়ে যায়। (ব্যবসা-বাণিজ্যে এমনকি কৃষি কর্মেও উন্নতি করতে পারে না, মূলধন পর্যন্ত নষ্ট হয়ে যায়। প্রব্রজিত দুঃশীল শীলভঙ্গকারী হলেও সে শীল ধন, বুদ্ধবচন, ধ্যান এবং সপ্ত আর্য ধন হতে বিচ্যুত হয়।)
২. দুঃশীল শীলভঙ্গকারীর পাপকীর্তি, অযশঃঅকীর্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।
৩. দুঃশীল শীলবিপন্ন ব্যক্তি ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই চার প্রকারের যে কোন সভায় যাক না কেন উদ্বিগ্ন চিত্ত ও অপ্রতিভভাবে (সভয়ে সংকোচে) গিয়ে থাকে।
৪. দুঃশীল শীলবিপন্ন ব্যক্তি মৃত্যুকালে মুর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়ে অজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করে।
৫. দুঃশীল শীলবিপন্ন ব্যক্তি দেহ ত্যাগ করে মৃত্যুর পর অপায় দুর্গতি অধঃপাত নিরয় প্রাপ্ত হয়।

উপরিউক্ত এই পাঁচটি কারণে দুঃশীল শীলভঙ্গকারীর অনর্থ বা আদীনব ঘটে।

বুদ্ধ আনন্দকে বলেছেন : কায়িক, বাচনিক ও মানসিক অন্যায় কার্য সম্পাদন করতে নাই। অন্যায় কর্ম সম্পাদনের দ্বারা প্রত্যাশিত যেসকল অন্তরায় ঘটে। যথা :

১. অন্যায়কারী নিজেকে নিজে তিরস্কার করে।
২. জ্ঞানীগণ তার নিন্দা করে।
৩. তার কুখ্যাতি সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে।
৪. অজ্ঞানে সে মৃত্যু বরণ করে।
৫. মৃত্যুর পর সে অপায়ে, দূর্গতিতে, বিনিপাতে নরকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে।[৯৮]

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, পবিত্র ত্রিপিটক ও পালি সাহিত্যে বিভিন্ন অংশে শীল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। শুধু যে পালি সাহিত্যে শীল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তা নয়। কারণ পালি সাহিত্য পরবর্তী অনেক রচনার মধ্যে শীলের আলোচনা মুখ্য হয়ে ফুটে উঠেছে। পবিত্র ত্রিপিটক ও পালি সাহিত্যে শীলের আলোচনা যেভাবেই হোক না কেন মূলত শীলের মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে নৈতিক জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করা এবং নির্বাণের পথে পরিচালিত করা। এছাড়া শীল আমাদের সমাজ, জাতীয়জীবন এবং আর্ন্তজাতিক জীবনকে প্রভাবিত করে প্রতিদিন নানাভাবে নানাকর্ম সম্পাদন করার ক্ষেত্রে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসকল দিক চিন্তা করে বলা যায় যে, শীলের পূর্বোক্ত গুরুত্ব রয়েছে বলেই শীল নিয়ে ভাবনার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা বহমান রয়েছে এবং সামাজিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবন বিনির্মাণে ভূমিকা পালন করছে তা সহজেই অনুমেয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. ড. নীরু বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে মানবাধিকার প্রসঙ্গ সমীক্ষা*, অপ্রকাশিত পিএইচ. ডি থিসিস (ঢাকা : ২০১৬, ঢা. বি.), অবতরনিকা, পৃ. ৬
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

৪. দিলীপ কুমার বড়ুয়া, *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : ২০১০, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৩০-১৩৯

৫. ড. নীরু বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে মানবাধিকার প্রসঙ্গ সমীক্ষা*, অপ্রকাশিত পিএইচি. ডি (ঢাকা : ২০১৬, ঢা. বি.), অবতরণিকা, পৃ. ৭

৬. প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু সম্পাদিত, *পারিবারিক সম্প্রীতি* (চট্টগ্রাম : ২০১০, বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার), পৃ. ১৯৯

৭. প্রাগুক্ত

৮. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, পালি-বাংলা অভিধান, ২য় খণ্ড (ঢাকা : ২০০৮, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ১৫৯৪

৯. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব* (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯০

১০.জিওন আবে, *সঙ্খেপখজোতনী : সীল-ধুতঙ্গ বিসুদ্ধিমগ্‌গ চুল্লটীকা* (পুণা : ১৯৮১), ভূমিকাংশ, পৃ. ২২

১১.মূল রচনা-অর্হৎ উপতিষ্য স্থবির, মহিম চন্দ্র বড়ুয়া অনূতি, *বিমুক্তি মার্গ*, প্রকাশক, প্রিয়ানন্দ মহাথের, নব-পণ্ডিত বিহার, কাতালগঞ্জ (চট্টগ্রাম : প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫৩২, বাংলা ১৩৯৫), পৃ. ১১

১২.ভদন্ত জিনবংশ মহাস্থবির, সদ্ধর্ম্ম-রত্ন-চৈত্য (তাইওয়ান : ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৭৭

১৩.Alan Spooner, *Oxford Dictionary Of Synonyms & Antonyms* (Oxford University Press : 1999), p. 58, 112, 262

১৪.প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, *ভিক্‌খু পাতিমোক্‌খং* (কলিকাতা : ১৯৮৭), পৃ. ৩৯

১৫.জ্যোতিপাল স্থবির অনূদিত, *আচার্য্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার* (ঢাকা : ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি), পৃ. ২৫।

১৬.মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সম্পাদিত, *সহজ বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৩৭৯

Dhaka University Institutional Repository

১৭.Mrs. Rhys Davids, *Buddhism : A study of Buddhist Norm*, Williams & Norgate (1st Published, London : 1912, Reprient, New Delhi, 2000, Published By J. Jetly), p.107

১৮. Davids, Rhys and Stede, W. ed. : *Pali-English Dictionary* (1st Published, London : 1921-1925, Pali Text Society), 1st edition, Delhi 1993, Motilal Banarsidass Publishers Private Limited, p. 788

১৯.Trasnlated By various Oriental Scholars and edited By F. Max Mullar, *The Sacred Book of the East* (Delhi : 1989, Oxford University Press)

২০. Nyanatiloka, *The Buddha's path to Deliverence* (Colombo : 1959, Buddhist Publication Society, Second Editon), p. 61

২১.Dipak Kumar Barua, (*An*) *Analytical Study of the Four Nikayas* (Calcutta : 1971, Rabindra Bharati University), p. 127

২২. *Oxford English dictionary*, United Kingdom (Oxford University Press : 1884), p.992

২৩. বিশ্বনাগরিক অধ্যাপক ড. ধর্মকীর্তি ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্ন সম্ভার* (চট্টগ্রাম : ২০০৩,প্রকাশক, লায়ন রূপম কিশোর বড়ুয়া), পৃ. ৮৭-৮৮

২৪. শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্তনিপাত* (বান্দরবন : ২০০৭, করুণাপুর বন বিহার), পৃ. ১৪৩

২৫. জ্যোতিপাল স্থবির অনূদিত, *আচার্য্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার* (ঢাকা : ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি), ৩/১১

২৬. মূল রচনা-অর্হৎ উপতিষ্য স্থবির, মহিম চন্দ্র বড়ুয়া অনূতি, *বিমুক্তি মার্গ*, প্রকাশক, প্রিয়ানন্দ মহাথের, নব-পণ্ডিত বিহার, কাতালগঞ্জ (চট্টগ্রাম : প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫৩২, বাংলা ১৩৯৫), পৃ. ১২-১৩

Dhaka University Institutional Repository

২৭. সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর-নিকায়*, চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম, অষ্টম, নবম নিপাত, (রাঙ্গামাটি : ২০০৫), পৃ. ৫৯

২৮. সাধনকমল চৌধুরী, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলকাতা : ২০০১, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ৩০-৩১

২৯. পাতিমোক্‌খ ধম্ম।

৩০. পচ্চয ধম্ম।

৩১.ইন্দ্রিয় ধম্ম।

৩২. অহিরি।

৩৩. অনোতপ্প।

৩৪. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৫, করুণা প্রকাশনী), জাতক নং ৩৬২

৩৫. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৫, করুণা প্রকাশনী), শঙ্খপাল নাগরাজ জাতক, জাতক নং ৫২৪

৩৬. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৫, করুণা প্রকাশনী), মাতৃ পোষক জাতক

৩৭. প্রাগুক্ত, চাম্পেয় জাতক

৩৮. প্রাগুক্ত, বোধিকুমার জাতক, পৃ. ২৯-৩২

৩৯. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৫, করুণা প্রকাশনী), মহিষ জাতক, পৃ. ২৪০-২৪১

৪০. প্রাগুক্ত, *জাতক* চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৫, করুণা প্রকাশনী), রুরুমৃগ জাতক

৪১.প্রাগুক্ত, মাতঙ্গ জাতক

৪২. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৫, করুণা প্রকাশনী), জয়দ্দিস জাতাক

৪৩. প্রাগুক্ত, শঙ্খপাল জাতক

৪৪. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* ষষ্ঠ খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৫, করুণা প্রকাশনী), ভূরিদত্ত জাতক, জাতক নং ৫৪৩

৪৫. কবি জ্যোতিঃপাল স্থবির সম্পাদিত, *বুদ্ধবংস*, (রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস : ১৯৩৪), পৃ. ২০৪

৪৬. শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : ১৩৮৫, করুণা প্রকাশনী), মহাকপি জাতক, জাতক নং ৪০৭

৪৭. ধর্মাধার মহাস্থবির, *শাসনবংশ* (কলিকাতা : ১৯৬২), পৃ. ২৯

৪৮. গোপলাদাস চৌধুরী এবং শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ১

৪৯. ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *কথায় ধর্মপদ* (অভয়তিষ্য প্রকাশনী : ১৯৬৮, প্রথম সংস্করণ), পৃ. ১০৮

৫০. ড. সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, ২য় সংস্করণ (কলিকাতা, ২০০৮), পৃ. ৫৫

৫১.ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), গাথা ২৩৪, পৃ. ৮৫

৫২. ড. *জিনবোধি ভিক্ষু, তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি (বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ : ২০০৩), পৃ. ৬৪*

৫৩. প্রাগুক্ত

৫৪. প্রাগুক্ত

৫৫. প্রাগুক্ত

৫৬. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), গাথা, ১৩৩, পৃ. ৫৬

৫৭. ড. জিনবোধি ভিক্ষু, *তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি* (বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার-বাংলাদেশ : ২০০৩), পৃ. ৬৬-৬৭

Dhaka University Institutional Repository

৫৮. ড. জিনবোধি ভিক্ষু, *তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি* (চট্টগ্রাম : ২০০৩, বুডিস্ট রির্সাচ এন্ড পাবলিকেশন), পৃ. ৬৬

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৬০. প্রাগুক্ত

৬১. সৌগত পত্রিকা, ১৯তম বর্ষ, মে ২০১৬, পৃ. ১৯

৬২. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), লোকবর্গ, গাথা : ১৭৪

৬৩. শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চাক্‌মা প্রনীত, ত্রিরত্ন মঞ্জুরী (চট্টগ্রাম : ১৯৭৫), পৃ. ২৬৬

৬৪. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), গাথা ২৩, পৃ. ২৫

৬৫. প্রাগুক্ত, সহস্র বর্গ, গাথা ১১২, পৃ.৪৯

৬৬. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলিকাতা : ১৯৭৭), পৃ. ৩৭

৬৭. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : ২০০৮, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ১৫৯৪

৬৮. ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : ১৯৮০, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৪৫

৬৯. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির অনূদিত, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলিকাতা : ১৯৭৭), পৃ. ৩৮

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ.৩৯

৭১.সাধনকমল চৌধুরী অনুদিত, *মিলিন্দপঞ্হ* (কলকাতা : ২০০১, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ৮৪

৭২. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : ২০০৮, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ১৬৩০

৭৩. শ্রীমতি রিস্‌ ডেভিডস্‌ অনূদিত, *বিভঙ্গ* (লন্ডন : ১৯০৪), পৃ. ২১৭

৭৪. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), মগ্‌গবগ্‌গো, গাথা, ২৮২

Dhaka University Institutional Repository

৭৫. শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদ্বীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত ও সাধক প্রভাত চন্দ্র কর্তৃক অনূদিত, বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধসাধনা (তাইওয়ান : দি করপর্য্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ১০৫

৭৬. ড. জিনবোধি ভিক্ষু, তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি (চট্টগ্রাম : ১৯৯৪), পৃ. ৭৩

৭৭. জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : ২০১৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৬৩২

৭৮. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : ২০০১, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ১২৫

৭৯. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : ২০০৮, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ১৬০৯

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮৫

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১০০

৮২. বিমুক্তিমার্গ, পৃ. ১২০

৮৩. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট (ঢাকা : ২০০৮), পৃ. ১৭০৭

৮৪. Mrs. Rhys Davids, *Buddism* : *A study of Buddist Norm*, Williams & Norgate (London : 1912, Reprient, New Delhi, 2000, Published By J. Jetly), p.144

৮৫. K. Shri Dhammananda, *Buddhism in the eyes of Intellectuals* by, The Corporate Body of Buddha Educational Foundation (Taiwan : 2006), p.21

৮৬. জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া, *গৌতম বুদ্ধ* (ঢাকা : ২০১৬, অ্যার্ডন পাবলিকেশন), পৃ. ১১২-১১৩

৮৭. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি,), পৃ, ২৭

Dhaka University Institutional Repository

৮৮. ধম্মচক্ক পবত্তন সুত্ত, সুত্তপিটক।

৮৯. সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যখ বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক চেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। প্রাগুক্ত সুত্ত।

৯০. গোপেন্দ্র কুমার চৌধুরী অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ* (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ.

৯১.শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা প্রনীত, ত্রিরত্ন মঞ্জুরী (চট্টগ্রাম : ১৯৭৫), পৃ. ২০৪

৯২. আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্যদর্শন*, (কলিকাতঃ ১৯৫৩), পৃ. ১২৫

৯৩. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : ২০০৮, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ১৫০৩

৯৪. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), সহস্র বর্গ, গাথা নং ১১০, পৃ. ৪৯

৯৫. প্রাগুক্ত, চিত্ত বর্গ, গাথা নং ৪২, পৃ. ৩০

৯৬. ‘পরাজয়’ (পারা+জি=পরাজিত) শব্দ হতে পারাজিকা শব্দের উদ্ভব। নীতির কাছে পরাজয়, আপন সংযম ও ধীরতার কাছে পরাজয়, বিবেকের কাছে পরাজয়, সর্বোপরি নিত্য প্রতিপাল্য বিনয় বিধানের কাছে পরাজয়, অন্যভাবে বলা যায়–নিয়ম চ্যুত, নীতি বহির্ভূত, নীতি পালনে অপারগ, অযোগ্য ইত্যাদি। পরাজিকা আপত্তিগ্রস্ত বা পারাজিকা দোষগ্রস্থ ভিক্ষু কোনোভাবেই বিনয় সংবাস করার যোগ্য নয়। পারাজিকা ভিক্ষু জীবনের কঠিন অপরাধ। সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : ২০০০, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৫০

৯৭. রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, সংকলিত ও অনুদিত, *মহাপরিনিব্বান সুত্তং* (চট্রগ্রাম : ১৯৪১), পৃ. ২৮-২৯

৯৮. সূত্রপিটকে *অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড* (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইট), পৃ. ১২৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

শীলের শ্রেণিবিন্যাসের তত্ত্বালোচনা

ভূমিকা

শীলের ধারণা, পরিধি ও পরিসর বলতে গেলে ব্যাপক ও বিস্তৃত। পালি সাহিত্যের নানা অংশ জুড়ে রয়েছে শীলের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যা প্রথম অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে। পূর্বোক্ত আলোচনার মাধ্যমে শীলের স্বরূপ স্পষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সেই প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনাপূর্বক দ্বিতীয় অধ্যায়ে শীলের শ্রেণিবিন্যাসের তত্ত্বালোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। কেননা শীল সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করা যায় তা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কিত আলোচনার মধ্য দিয়ে। এ উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে শীলের শ্রেণিবিন্যাস সম্পর্কে পর্যালোচনা করে শীল সম্পর্কিত জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করা হবে।

শীলের শ্রেণিবিন্যাস

আচার্য বুদ্ধঘোষ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকার শীল শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

১. সকল শীল মূলত এক প্রকার। যেহেতু এগুলো আত্মসংগঠনে মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পাদন করে। এইজন্য শীলসমূহ প্রথমত এক প্রকার এবং এক শ্রেণিভুক্ত।

২. দ্বিতীয় প্রকার শীল এর শ্রেণিবিন্যাসে প্রত্যেকটিকে দুইটি করে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা :

চারিত্র ও বারিত্র শীল

যে সকল শিক্ষাপদ প্রতিপালন করণীয় বা কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে তাকে বলা হয় চারিত্র শীল। চারিত্র শীল শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রচেষ্টার দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই শীল বুদ্ধ কায় ও বাক্য দ্বারা আচরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আবার যে সকল শিক্ষাপদ অকরণীয় বা নিষেধাজ্ঞার অর্ন্তভুক্ত তাকে বলা হয়

বারিত্র শীল।[১] বারিত্র শীল শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মৃতির দ্বারা সম্পাদিত হয়। এই শীল বুদ্ধ কায় ও বাক্যকে বিরত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।[২] চারিত্র শীল ব্যতিরেখে বারিত্র শীল পূর্ণতা সাধন হয় না।

অভিসমাচারিক ও আদি ব্রহ্মচারিয়ক শীল

যে সকল শিক্ষাপদ ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্রক বলে কথিত, সেগুলো সদাচারজনিত শীল বা অভিসমাচারিক শীল।[৩] যেহেতু বুদ্ধ অভিসমাচারিক শীলের উপদেশ প্রদান করেন নাই তাই এটি সম্বোধি লাভের অন্তরায়। অপরটি হলো মার্গ ব্রহ্মচর্যের আদি শীল। এটি লোকুত্তর মার্গ, ফলচিত্ত সম্প্রযুক্ত শীল। মার্গ ব্রহ্মচর্যের পূর্বাহ্নে এই শীল প্রতিপালন করতে হয় যা উচ্চতর মার্গে উপনীত করে দেয়। আদি ব্রহ্মচারিয়ক শীল অনুশীলনে শ্রাবক কঠোর ও মহৎ শীল পরিপূর্ণ করেন।

বিরতি ও অবিরতি শীল

পানাতি পাতং পহায় পানাতি পাতা পটিবিরতো সমন গোতম নিহিতং দণ্ড নিহিত সন্তো লজ্জি, দয়াপন্নো সব্বপানভূত হিতানুকম্পি বিহরতি।[৪] বিরতি হলো ক্ষান্তি, নিবৃত্তি, নিরস্ত হওয়া।[৫] আর অবিরতি হলো বিরামের অভাব, অবিশ্রান্ত।[৬] তন্মধ্যে একটি হলো হত্যাদি হতে বিরতি শীল এবং অপরটি হলো চেতনাদি অবিরতি শীল। ব্রহ্মজাল সুত্তে উল্লেখিত সমস্ত চুল্ল শীল বা ক্ষুদ্র শীল বিরতি শীলের অন্তর্গত।

নিশ্রিত ও অনিশ্রিত শীল

তৃষ্ণা বা মিথ্যাদৃষ্টিতে প্রলুব্ধ হয়ে আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে যে শীল প্রতিপালিত হয় তা নিশ্রিত বা নির্ভর শীল। মৃত্যুর পর স্বর্গে উৎপন্ন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে শীল প্রতিপালিত হয় তা নিশ্রিত শীল।[৭] পুণ্য লাভের জন্য নির্দিষ্ট ধর্মকর্ম ও পূজাদি সংযুক্ত শীল দৃষ্টি নিশ্রয়ে উৎপন্ন হয়। নিশ্রিত শীল পণ্ডিত লোকের জন্য নয়। যে শীল লোকীয় এবং লোকোত্তর তা অনিশ্রিত শীল বলে কথিত। বিমুক্তির নিমিত্তে শীল অনিশ্রিত শীল। ইহা পণ্ডিত লোকের জন্য প্রযোজ্য।[৮]

ক্ষণিক ও আজীবন শীল

সীমিত শমথ ধ্যানের জন্য প্রতিপালিত শীল কালপরিয়ন্ত বা ক্ষণিক শীল এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতিপালিত শীল আপান কোটিক বা আজীবন শীল। আরও সহজভাবে বলা যায় যে, যে শীল অল্প সময়ের জন্য আচরিত হয় ও জীবনের সাথে সম্পর্ক বিহীন, এ শীল 'সীমিত সময়ের জন্য আচরিত শীল' বলা হয়। সাধকের আচার্য্যের উপদেশ শ্রবণ ও শীল গ্রহণের সময় হতে জীবন অবসান পর্যন্ত সময়ে আচরিত শীল 'আমরণ আচরিত শীল' বলা হয়। সীমিত সময়ে আচরিত শীলের ফল প্রদানের নির্দিষ্ট সময় আছে। আমরণ আচরিত শীলের ফল প্রদানের কোনো নির্দিষ্ট সময় নাই।

সীমিত ও অসীম শীল

অত্থি সীলং লাভ পরিযন্তং...যস...ঞাতি...অঙ্গ...জীবিত পরিযন্তং।[৯] প্রথমটি হলো সীমিত সময়ের জন্য প্রতিপালিত শীল যা লাভের প্রত্যাশায়, যশের প্রত্যাশায়, স্বজনের স্বার্থে, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং জীবনের তাগিদে ভঙ্গ করা হয়। কিন্তু উক্ত সমস্ত কিছুর বিনিময়ে যে শীল লঙ্ঘন না করে প্রতিপালিত হয় তা অপরিয়ন্ত বা অসীম শীল।[১০] আরও সহজ করে বলা যায় যে, যদি সাধক যে কোনো শীল পালন করতে সংকল্প করেন কিন্তু ঐহিক সুখের জন্য, যশের জন্য বন্ধু বা জ্ঞাতির কারণে, দৈহিক কারণে এবং জীবনের নিমিত্তে তিনি শীল লঙ্ঘন করেন; তাহলে তাঁর শীল ঐহিক সুখে সপরিয়ন্ত বা সীমিত হয়। অপরদিকে ভিক্ষু যথার্থতঃ শীল পালন করতে সংকল্প করেন এবং ঐহিক সুখের জন্য, যশের জন্য, দৈহিক কারণে ও জীবনের নিমিত্তে শীল লঙ্ঘন করার এমন কি তিনি চিন্তাও পোষন করেন না। অতঃপর তিনি কি প্রকারে শীল ভঙ্গ করবেন? তা অপরিয়ন্ত বা অসীম শীল।

লোকীয় ও লোকোত্তর শীল

লোকীয় হলো পার্থিব, জাগতিক, লৌকিক।[১১] লোকোত্তর হলো ঊর্ধ্বতম লোক-সম্বন্ধীয়, লোকশ্রেষ্ঠ, ঊর্ধ্বতম অবস্থার বা স্তরের, শ্রদ্ধা বা সম্ভ্রম উৎপাদক।[১২] সব্বংপি সাসবসীলং লোকীয়ং অনাসবং লোকুত্তরং।[১৩] অর্থাৎ আশ্রব সম্পৃক্ত শীল হচ্ছে লোকীয় এবং অনাশ্রব শীল লোকোত্তর।

Dhaka University Institutional Repository

লোকীয় শীল ভবের কারণ হয়ে থাকে এবং লোকোত্তর শীল ভবমুক্তির উপাদানস্বরূপ। এটি অর্হত্ত্ব ফল লাভকেই বুঝায়।

৩. তৃতীয় প্রকার শীলের শ্রেণিবিন্যাসে প্রত্যেক ভাগকে তিনটি করে পাঁচ ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা :

হীন, মজ্‌ঝিম এবং পণীত শীল

ছন্দ, চিত্ত, বীর্য ও বীমাংসার বশবর্তী হয়ে যে শীল পালিত হয় তা হীনশীল। হীনশীল লোক অধিক কামনাবাসনায়, অতিরিক্ত কামনাবাসনায়, প্রবল কামনাবাসনায়প্রপীড়িত এবং অন্যুন আশায় ভরপুর থাকেন। এই শীল অনুশীলনে সাধক মনুষ্যলোকে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। পুণ্যাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে প্রতিপালিত শীল মধ্যম (মজ্‌ঝিম)। মধ্যম শীল অনুশীলনে সাধক দেবলোকে উৎপন্ন হন। এবং আর্যভাবাপন্ন হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষায় প্রতিপালিত শীল হলো পণীত বা উচ্চতর শীল। উত্তম শীল অনুশীলনে সাধক বিমুক্তি লাভ করেন।[১৪]

আত্তাধিপত্তেয়্য, লোকাধিপত্তেয়্য এবং ধম্মাধিপত্তেয়্য শীল

নিজের প্রতি গৌরববোধ করে (আত্তাধিপত্তেয়্য), জনসাধারণের প্রতি গৌরববোধ করে (লোকাধিপত্তেয়্য) এবং ধর্মের প্রতি গৌরববোধ করে (ধম্মাধিপত্তেয়্য) প্রতিপালিত শীলের অর্ন্তগত। নিজের আত্মমর্যাদা এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠা অক্ষুন্ন রাখার জন্য প্রতিপালিত শীল আত্তাধিপত্তেয়্য শীল। দ্বিতীয়টি জনমতের বিপুল সমাবেশ উৎপাদনের নিমিত্ত যে শীল প্রতিপালিত হয় তা হলো লোকাধিপত্তেয়্য এবং সর্বশেষ তৃতীয়টি ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাবশত প্রতিপালিত হয়।[১৫]

পরামট্‌ঠ, অপরামট্‌ঠ এবং পটিপস্‌সদ্ধি শীল

পরামট্‌ঠ বা আক্রান্ত শীল তৃষ্ণা এবং মিথ্যাদৃষ্টি দ্বারা আক্রান্ত শীল। দ্বিতীয়টি দ্বারা গভীরভাবে আক্রান্ত নয় এবং তৃতীয়টি পটিপস্‌সদ্ধি শীল অর্হৎগণের শীল। অর্হৎগণের কর্মপ্রবণতার নিঃশেষ বলেই শীল পরিপূর্ণ করে থাকেন।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

বিসুদ্ধ, অবিসুদ্ধ এবং বেমতিক শীল

বিসুদ্ধ বা বিশুদ্ধ শীল আপত্তি বা দোষ সম্পূর্ণরূপে বিবর্জিত হয়ে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। দুইটি কারণে বিশুদ্ধ শীল পরিপূর্ণ হয়। প্রথমত - শীল ভঙ্গ না করা; দ্বিতীয়ত - শীল ভঙ্গ হলে পাপ স্বীকার করা। এটি বিশুদ্ধ শীল নামে অবিহিত হয়। দ্বিতীয় অবিসুদ্ধ শীল হলো আপত্তি বা দোষসম্পৃক্ত এবং যা সংশোধন করা হয়নি। সহজভাবে বলা যায় যে, দুইটি কারণে অবিশুদ্ধ শীল পরিপূর্ণ হয়। প্রথমত - ইচ্ছাকৃত শীল ভঙ্গ করা; দ্বিতীয়ত - শীল ভঙ্গ হলে পাপ স্বীকার করা। তাই এটি অবিসুদ্ধ শীল নামে অভিহিত। তৃতীয় প্রকার শীলে আপত্তিপ্রাপ্ত হয়েছে কিনা তাতে সন্দেহান্বিত। যে ক্ষেত্রে আপত্তি সংঘটিত হয়েছে তাতে নিজের প্রকৃতি বা স্বভাব সম্বন্ধেও সন্দেহ থেকে যায়।[১৭]

সেখ, অসেখ এবং নেবসেখ নাসেখ শীল

ইধ একচ্চো লাভহেতু লাভপচ্চয়া লাভ কারণা যথাসমাদিন্নং সিক্খাপদং বিতিক্খমায় চিত্তং পি ন উপ্পাদেতি বিংসো বিতিক্কমিস্সতি; ইদং তং সীলং ন লাভ পরিয়ন্তং।[১৮] সেখ বা শৈক্ষ্যগণের শীল, অসেখ বা অশৈক্ষ্যগণের শীল এবং নেবসেখনাসেখ বা নৈবশৈক্ষ্য নাশৈক্ষ্যগণের শীল। চারি আর্যমার্গ ও তিনটি শ্রামণ্যফলযুক্ত এই সাত প্রকার লোকোত্তর শীল সেখ শীল নামে অভিহিত। দ্বিতীয় প্রকার অসেখ শীল হলো অর্হৎগণের শীল। এবং অবশিষ্ট শীল হচ্ছে সংসারাসক্তগণের জন্য নেবসেখ নাসেখ বা নৈবশৈক্ষ্য নাশৈক্ষ্য শীল।[১৯]

৪. শীলের চতুর্থ প্রকার শ্রেণিবিন্যাসে চারটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে চারটি করে শীল উপস্থাপিত করা হয়েছে। যথা :

হানভাগীয়, ঠিতিভাগীয়, বিসেসভাগীয় এবং নিব্বেদভাগীয় শীল

এ শীল সম্পর্কে বিসুদ্ধিমগ্‌গ গ্রন্থে উক্ত হয়েছে,

যো'ধ সেবতি দুস্‌সীলে সীলবন্তে ন সেবতি,
বত্থুবিতিকম্মে দোসং ন পস্‌সতি অবিদ্দুসু,

মিচ্ছাসঙ্কল্প বহুলো ইন্দ্রিয়ানি ন রক্খতি,

এব রূপস্স বেসালং জায়তে হানভাগীয়ং।

যো পন অত্তমনো হোতি সীল সম্পত্তিয়া ইধ,

কম্মট্ঠানানু যোগম্হি ন উপ্পাদেহি মানসং,

ফুট্ঠস্স সীলমত্তেন অঘটনস্স উত্তরিং,

তস্স তং ঠিতিভাগীয়ং সীল ভবন্তি ভিক্খুনো।

সম্পন্নো সীলঘটতি সমাধখায় যোপন,

বিসেস ভাগীয়ং সীলং হোতি এতস্স লক্খণো।

অতুট্ঠো সীরমত্তেন নিব্বিধং যো নুয়ূঞ্জতি,

হোতি নিব্বেধভাগিয়ং সীলং এতস্স ভিক্খুনো'তি।[২০]

অতএব উক্ত শীল হলো :

ক্ষতিকর শীল হলো হানভাগীয়, জড়ত্ব শীল হলো ঠিতিভাগীয়, বিভেদ শীল হলো বিসেসভাগীয় এবং নির্বেধ শীল হলো নিব্বেদভাগীয়। প্রথমটি হলো যে ব্যক্তি অসাবধানতাবশত শীলভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। তার সেই শীলই হানভাগীয় শীল বা ক্ষতিশীল। দ্বিতীয় প্রকার শীল হলো শীলবান ব্যক্তি যেখানে শীলসম্পদ নিয়ে স্থিত ছিলেন সেখানে সে অবস্থায় স্থিত থাকেন। তৃতীয় প্রকার শীল তথা বিসেসভাগীয় শীলকে ভিত্তি করে শীলবান শীলসম্পদের সাহায্যে ধর্মীয় জীবনে অধিকতর উন্নতি বিধান করেন। চতুর্থ প্রকার শীল হলো শীলসম্পন্ন ব্যক্তি বস্তুর যথাস্বভাব হৃদয়ঙ্গম করে বিপস্সন বা বিদর্শন জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে থাকেন।[২১]

ভিক্খু, ভিক্খুণী, অনুপসম্পন্ন এবং গহট্ঠশীল

ভিক্ষুগণের জন্য প্রজ্ঞাপ্ত ভিক্ষু শীল, ভিক্ষুণীদের জন্য প্রজ্ঞাপ্ত ভিক্ষুণী শীল, শ্রামণ-শ্রামণীদের জন্য প্রজ্ঞাপ্ত অনুপসম্পন্ন শীল এবং উপাসক-উপাসিকাদের নিত্য প্রতিপাল্য পঞ্চশীল গহট্ঠ বা গৃহীশীল নামে অভিহিত।[২২]

Dhaka University Institutional Repository

পকতি, আচার, ধম্মতা এবং পূব্বহেতুক শীল

কোন নির্দিষ্ট ভূমির প্রাণিদের মধ্যে সচরাচর প্রচলিত ধারা বা গতি অনুসারে শীল প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এটি পকতিসীল বা প্রকৃতিশীল। কোন নির্দিষ্ট সমাজে প্রচলিত আচার-অনুষ্ঠান শীলরূপে প্রতিপালিত হয়ে থাকে। এটিকে স্বভাবশীল বা আচারশীল বলে। তৃতীয় প্রকার শীল হলো অসাধারণ প্রকৃতির শীল, যা স্বাভাবিক অবস্থায় অত্যন্ত বিরল। যেমন বোধিসত্ত্বের মায়ের শীল।[২৩] চতুর্থ প্রকার শীল হলো মহাসত্ত্ব ও বোধিসত্ত্বের পূর্বপূর্ব জন্মের অভিজ্ঞতাপ্রসূত আর্যশীল।

আচার, সমুৎপন্ন, নিরোধ ও নিরোধের উপায় শীল

কুশল শীল ও অকুশল শীল এই দুইটি আচার শীল নামে অবিহিত। বিশুদ্ধ চিত্তে কুশল শীল উৎপন্ন হয়; কলুষিত চিত্তে অকুশল শীল উৎপন্ন হয়। এই দুটি সমুৎপন্ন শীল। সাধক কুশল শীল সম্পাদনে অকুশল শীল পরিহার করেন; সাধক পবিত্রতা সম্পাদনে কুশল শীল পরিহার করেন। এটিই নিরোধ শীল। চার প্রকার সম্যক ব্যায়াম এটি নিরোধের উপায় শীল নামে অভিহিত। চতুর্বিধ কর্ম প্রচেষ্টাকে এইরূপে হৃদয়ঙ্গম করা হয়। এটাকে বীর্য বলা হয় এবং এটি প্রকৃত শীল নয়, এটির নাম সম্যক ব্যায়াম।[২৪]

চার প্রকার পরিশুদ্ধি শীল হলো : পাতিমোক্খ সংবর, ইন্দ্রিয় সংবর, আজীব পারিসুদ্ধি এবং পচ্চয় সন্নিস্সিত শীল ।

পাতিমোক্খ সংবর শীল

পাতিমোক্খ সংবর শীল হলো প্রাতিমোক্ষ (পাতিমোক্খ)-এর অর্ন্তগত শীল। এই শীল প্রতিপালনে চার অপায় প্রভৃতি অধোগতি থেকে রক্ষিত হয়ে মোক্ষলাভ করে এই অর্থে পাতিমোক্খ। বাংলায় এটিকে ‘প্রাতিমোক্ষ’ বলা হয়। এখানে ‘পাতি’ ও ‘মোক্খ’ শব্দের সমন্বয়ে পাতিমোক্খ শব্দের উদ্ভব যার অর্থ হল অপায় বা ভয় হতে মুক্তি বা মুক্তির উপায়। এবং সংবর মানে সংযম।[২৫] সংযম হলো নিয়ন্ত্রণ, নিবারণ, সব কাজে নিয়ম মেনে চলা।[২৬] ‘প্রাতিমোক্ষ সংবর শীল’ অর্থ সদাচার, বিকাশ, মূল, দক্ষতা, আশ্রয়, সংযম, নির্মলতা ও মুক্তি।[২৭] অতএব, বিনয় পিটকের অর্ন্তগত

প্রাতিমোক্ষ এর ২২৭ শীলে সংযমতাই পাতিমোক্খ সংবর শীল।[২৮] ২২৭টি শীল বা বিধি এখানে উল্লেখ করা হলো। যেমন : পারাজিকা -৪, সংঘাদিসেস -১৩, নিস্সগ্গিয়া-৩০, পটিদেসনিয়া ধম্মো-৪, অনিযত-২, পাচিত্তিয়া-৯২, সেখিযা-৭৫ ও অধিকরণ সমথ-৭ ইত্যাদি।[২৯] বিনয়পিটকে বর্ণিত নীতি-শৃঙ্খলায় স্বীয় জীবন পরিচালিত হলে এই শীল প্রতিপালিত হয়। যোগী পাতিমোক্খ সংবরে সংযত হয়ে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় আচার সম্পন্ন হয়ে অবস্থান করেন।[৩০] এইরূপ ব্যক্তি এমন সব লোকের সঙ্গলাভ করেন এবং এমনসব স্থান পুনঃপুনঃ দর্শন করেন, যা তাঁর জীবনযাত্রায় সহায়ক হয়ে উপস্থিত হয়। তার বিপরীত স্বভাবের সঙ্গলাভ এবং স্থানে গমন পরিহার করে থাকেন। অধিকন্তু বিনয়ের ক্ষুদ্রাণুক্ষুদ্র নীতি ভঙ্গেও ভয়দর্শী হন। যেমন ঐগুলো শিষ্টাচারের সাথে সম্বন্ধযুক্ত।

প্রাণিহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ এবং মাদকদ্রব্য সেবন এই পাঁচ প্রকার অসদাচরণ থেকে বিরত হয়ে সদ্ভাবে জীবন যাপন হলো পঞ্চশীল, যাকে বলা হয় গৃহীশীল। উত্তরোত্তর চারিত্রিক উৎকর্ষতার জন্য ব্রহ্মচর্য অবলম্বনে গৃহীর অষ্টশীল ও দশশীল পালনের বিধান আছে। ভিক্খু ও ভিক্খুণীরূপে দীক্ষা গ্রহণের জন্য পুরুষ ও নারী যখন গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তখন তাদের বলা হয় অনুপসম্পন্ন এবং তাদের দশ শীলকে বলা হয় অনুপসম্পন্ন শীল। যথা- প্রাণিহত্যা, চুরি, অব্রহ্মচর্য, অসত্য ভাষণ, মাদকদ্রব্য সেবন, বিকাল ভোজন, নৃত্য-গীত-বাদ্য-কৌতুক দর্শন, বিলাসোপকরন ব্যবহার, উচ্চ ও মহাশয্যায় শয়ন এবং স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ থেকে বিরত হওয়া। এছাড়া ভিক্ষুদের জন্য বিধিবদ্ধ নিয়ম, ভিক্ষুণীদের জন্য প্রবর্তিত নিয়মগুলি ভিক্ষুশীল ও ভিক্ষুণীশীল। এইভাবে পাতিমোক্খ গ্রন্থে সংগৃহীত শীল সমূহকে বলা হয় পাতিমোক্খ সংবর শীল।[৩১] এই পাতিমোক্খ সংবর শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত ভিক্ষু আচার-গোচর সম্পন্ন হয়ে থাকেন, তিনি অনাচার পরিত্যাগ করেন এবং অনুকূল পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখেন।

ইন্দ্রিয় সংবর

সাধক রূপ দর্শনে, শব্দ শ্রবণে, গন্ধ আঘ্রাণে, রস আস্বাদনে বা স্প্রষ্টব্যে চিত্তে কলুষিতকারী কাজে নির্লিপ্ত থাকতে সংকল্প করেন এবং শীল ভঙ্গ করেন না। এটাই ইন্দ্রিয় সংবর শীল।[৩২] ইন্দ্রিয়

সংবর শীল এর পূর্বশর্ত হলো মনোসংযম। প্রতিমোক্ষ সংবর শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেই মনোসংযম হওয়া যায়। আর তখনই ইন্দ্রিয় সংযমের পথ সুগম হয়। ইন্দ্রিয়সমূহের বিপদ গমনে বাধা প্রদান করে সংযমের মাধ্যমে সৎপথে পরিচালনাই ইন্দ্রিয় সংবর শীল।[৩৩] ইন্দ্রিয়সমূহের মাধ্যমে জগৎ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়া যায়। ইন্দ্রিয় সংবর বলতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুও উপলব্ধি নয় বরং বস্তু সম্বন্ধে আবছা ধারণা না নিয়ে বস্তুর যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা। স্মৃতি সাধনার উন্নতি বিধানের শুরুতেই এই কাজ সম্পাদন করা যায়। "যদিও চক্ষু ইন্দ্রিয়ে সংবর বা অসংবর নাই, চক্ষু প্রসাদকে আশ্রয় করিয়া স্মৃতি বা বিস্মৃতি উৎপন্ন হয়, তথাপি যদা রূপালম্বন চক্ষুর পথে আসে, তদা দুইবার ভবাঙ্গ উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হলে ক্রিয়া মনোধাতু আবর্জ্জনকৃত্য সাধয়মান উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয় ; তারপর চক্ষু বিজ্ঞান দর্শন কৃত্য, তারপর বিপাক মনোধাতু সম্প্রতীচ্ছন কৃত্য (গ্রহণকৃত্য) তারপর বিপাক হেতুক মনোবিজ্ঞান ধাতু সন্তীরণ কৃত্য তৎপরে ক্রিয়াহেতু মনোবিজ্ঞান ধাতু ব্যবস্থাপন কৃত্য সাধয়মান উৎপন্ন হয়ে নিরুদ্ধ হয়, তদনন্তর জবন (চিত্ত) জন্মগ্রহণ করে। তথাপি ভবাঙ্গ সময়ে বা আবর্জ্জনাদির অন্যতর সময়ে সংবর বা অসংবর নেই। জবনক্ষনে যদি দুঃশীল্য বা স্মৃতিবিভ্রম বা অজ্ঞান বা অক্ষান্তি বা কৌসিদ্য উৎপন্ন হয়, তবে অসংবর হয়ে থাকে। যাহার এইরূপ হয় সে চক্ষু ইন্দ্রিয়ে অসংযত বলে কথিত হয়।"[৩৪] সুতরাং জবন অবস্থায় চিত্তের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য। মূলত এটিই সংবর দ্বার। যখন এটিকে সংযম করা হয় তখন ইন্দ্রিয়সমূহ সুরক্ষিত ও সুসংযত বলা যায়। এটি একটি সুরক্ষিত ও প্রহরারত নগরের সাথে তুলনীয়। এই কারণেই চক্ষুসংবরের উপমার সাহায্য বলা হয়েছে, যখন যোগী দর্শনীয় বস্তু অবলোকন করেন তখন তিনি ভাসা ভাসা বা আবছাভাবে দর্শন করেন না অথবা এটির বিভিন্ন অংশকে পৃথক পৃথক করে আবছাভাবে দেখেন না। কারণ তাতে লোভ, দ্বেষ প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। অপর ইন্দ্রিয়সমুহের ক্ষেত্রেও তা অনুরূপভাবে প্রযোজ্য।[৩৫]

আজীব পারিসুদ্ধি শীল

শুদ্ধ জীবিকাকে অক্ষুন্ন রাখার জন্য এ শীল প্রয়োজন। জীবিকার অপর নাম আজীব। পরিশুদ্ধ জীবিকা দ্বারা জীবন যাপন করাই আজীব পারিশুদ্ধি শীল। ইন্দ্রিয় সংবর শীলের মতো আজীব

পারিশুদ্ধি শীলও উদ্যম এবং বীর্যবান হয়ে পরিপূরণ করতে হয়। স্মৃতি সাধনায় তথা আধ্যাত্মিক জীবনের উন্নতি বিধানের পক্ষে সুবিশুদ্ধ জীবিকা অবশ্যই প্রয়োজন। লোভ এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জীবিকা জীবনকে কলুষিত ও পঙ্কিল করে দেয়।[৩৬] জীবন ধারণের জন্য খাদ্য এবং অন্যান্য বস্তু একান্ত অপরিহার্য। সাধকদের মধ্যে যাঁদের লক্ষ্য নির্বাণ, তাঁদেরকে জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম মৌলিক চাহিদার উপর নির্ভর করতে হয়। এই মৌলিক চাহিদার প্রয়োজনীয় বস্তু তাঁকে সদুপায়ের মাধ্যমে লাভ করতে হয়। এই মর্মে 'বিসুদ্ধিমগ্গো' গ্রন্থে বিনয় পিটকের ছয়টি শিক্ষাপদ বিষয়বস্তুরূপে উপস্থাপন করা হয়েছে।[৩৭] যোগী তার মৌলিক চাহিদা চতুর্প্রত্যয় লাভের জন্য নিম্নোক্ত আপত্তিজনক অবস্থা অবলম্বন করেন না : ভণ্ডামি (কপটতা বা কুহনা), প্রত্যক্ষ উক্তি (লপনা), ইঙ্গিত করা (নৈমিত্তিকতা), অন্যের শীলকে তুচ্ছ করে নিজের শীলকে অতিরঞ্জিত করে দেখানো (নিপ্পেসিকতা) এবং প্রভূত দান পাওয়ার প্রত্যাশায় সামান্য কিছু অন্যকে দান করা অথবা প্রতিদানে কিছু বেশি প্রত্যাশা[৩৮] যোগীকে আরো নির্দেশ করা হয়েছে যে, জীবিকা হিসেবে তিনি যেন জ্যোতিষ শাস্ত্র চর্চা, স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা ইত্যাদি[৩৯] বর্জন করেন।

পচ্চয় সন্নিস্সিত শীল

এ শীল হলো ভিক্ষুর জীবনধারণের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য বস্তুসামগ্রী সম্পর্কিত শীল। এটাই পচ্চয় বা প্রত্যয়। চীবর, পিণ্ডপাত বা গ্রাসাচ্ছাদন, শয়নাসন এবং ঔষধ পথ্যাদি চার প্রকার প্রত্যয়ই ভিক্ষুর জীবন ধারণের অপরিহার্য সামগ্রী বা চতুর্প্রত্যয়। বিনয়সম্মত উপায়ে উক্ত চতুর্প্রত্যয় তথা নূন্যতম মৌলিক চাহিদা লাভ এবং পরিভোগ করলে প্রত্যয় সংনিশ্রিত শীল সুষ্ঠু ও নিশ্ছিদ্রভাবে প্রতিপালিত হয়। উক্ত চার প্রত্যয় মাত্র পরিভোগের লক্ষ্যে মনকে সতত নিবিষ্ট রাখতে হয়। প্রথম প্রত্যয় চীবর বা পরিধেয় বস্ত্র - লজ্জা নিবারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া শীতোষ্ণতা নিবারণ, ডাঁশ, মশা, সরীসৃপ প্রভৃতির দংশন হতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে চীবর ব্যবহার। এতে সাধক অসাচ্ছদ্য এবং বিপত্তিমুক্ত হয়ে ব্রহ্মচর্য জীবনের চরম লক্ষ্যে উপনীত হন। স্মরণীয় যে, চীবর পরিধানের উদ্দেশ্য দেহের সৌন্দর্য বৃদ্ধি কিংবা বিভূষণের জন্য নয়।[৪০] দ্বিতীয় প্রত্যয় ভিক্ষান্ন গ্রহণ করার সময় ভাবতে হয় জীবন ধারণের জন্য এবং ব্রহ্মচর্যের পূর্ণতার জন্য

আহার প্রতিসেবিত হচ্ছে। শরীরকে শক্তিশালী করা কিংবা লাবণ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়। তৃতীয় প্রত্যয় শয়নাসন ব্যবহার করার সময় যোগীকে প্রত্যবেক্ষণ করতে হয় - নিদারুণ ঝড়-বৃষ্টি, শীত-উষ্ণতা এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি ব্যবহার করেছেন। চতুর্থ প্রত্যয় ঔষধ পথ্যাদি ভৈষজ্য গ্রহণ করার সময়ও সাধক সপ্রজ্ঞচিত্তে প্রত্যবেক্ষণ করেন যে, রোগ নিবারণের জন্য এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। দৈহিক মণ্ডণ, বিভূষণ কিংবা মর্দনের জন্য নয়।[৪১] উপরন্তু এই চার প্রত্যয় এর উদ্দেশ্য হলো নির্বাণে উপনীত হওয়ার মহালক্ষ্যে এবং পবিত্র ও অনবদ্য জীবন যাপনের প্রয়োজনে। এইভাবে পচ্চয় সন্নিস্সিত সীল - এর বিশুদ্ধিতা রক্ষিত হয়।

মূলত শ্রদ্ধা দ্বারা প্রতিমোক্ষ সংবর শীল (পাতিমোক্খ সংবর সীল) এবং স্মৃতির মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সংবর শীল সুরক্ষা হয়। অনুরূপভাবে বীর্যে আজীব পারিশুদ্ধি শীল এবং প্রজ্ঞায় প্রদীপ্ত হয়ে (পচ্চয় সন্নিস্সিত সীল) প্রত্যয় সংনিশ্রিত শীল প্রতিপালিত হলে শীল সুরক্ষিত হয়।[৪২] প্রজ্ঞাবানের চতুর্প্রত্যয় স্বভাবত নির্মল ও পরিশুদ্ধভাবে গৃহীত বলে সুফল প্রদায়িনী হয়। এটি প্রজ্ঞা দ্বারা প্রতিপালন সহজসাধ্য। ফলে কায়-বাক্য ও মনোদ্বারে সংযমতা রক্ষিত হয় এবং সংযমতার লক্ষ্যেই চার প্রত্যয় সতত প্রত্যবেক্ষণ করা কর্তব্য। ভগবান এরূপ উপদেশ দিয়েছেন : ‘ভিক্ষু স্থূল আহার ও পঞ্চ-স্কন্ধের কামগুন হৃদয়ঙ্গম করেন’। ‘প্রাতিমোক্ষ-সংবর’ ও ‘আজীব-পরিশুদ্ধি’ ‘শীল-স্কন্ধের’ অর্ন্তগত ; ‘ইন্দ্রিয়-সংবর শীল’ ‘সমাধি স্কন্ধের’ অর্ন্তগত এবং ‘প্রত্যয়-সন্নিশ্রিত শীল’ ‘প্রজ্ঞা স্কন্ধের’ অর্ন্তগত।[৩৪]

৬. শীলের পঞ্চম শ্রেণিবিন্যাসে প্রত্যেকটি অংশে পাঁচটি করে দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা :

পরিয়ন্ত পারিসুদ্ধি, অপরিয়ন্ত পারিসুদ্ধি, পরিপূণ্ন পারিসুদ্ধি, অপরামট্‌ঠ পারিসুদ্ধি এবং পটিপস্‌সদ্ধি পারিসুদ্ধি শীল

অনুপসম্পন্ন শীল হলো সসীম বা পর্যন্ত পরিশুদ্ধ শীল। পঞ্চশীল, অষ্টশীল এবং দশশীল হলো পরিয়ন্ত পরিশুদ্ধ শীলের অর্ন্তগত। দ্বিতীয় প্রকার শীল হলো উপসম্পন্ন (অপরিয়ন্ত) শীল বা ব্রহ্মচর্য শীল।[৪৪] তৃতীয় প্রকার (পরিপূণ্ন পারিসুদ্ধি) শীল কল্যাণ পৃথকজনের আচরণীয় শীল। কল্যাণ

পৃথকজনের শীল উপসম্পন্ন শীলের চেয়ে সুবিশুদ্ধ। এইরূপ শীলে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি অর্হত্ত্বের নিকটবর্তী বলে কথিত আছে। এটিই পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ শীল। চতুর্থ প্রকার শীল হলো প্রথম সাতটি লোকুত্তরমার্গ অধিগমকারী আর্যগণের প্রতিপাল্য শীল। সেখ বা শৈক্ষ্যগণের শীলই অপরামৃষ্ট শীল (অপরামট্‌ঠ)। এই শীল অর্হৎগণের প্রতিপাল্য। পঞ্চম প্রকার শীল সকল বেদনার উপশম করে, শান্তি প্রদান করে এবং অত্যন্ত পরিশুদ্ধ বলে পটিপস্‌সদ্ধি বা প্রতিপ্রশ্রদ্ধি পরিশুদ্ধ শীল নামে অভিহিত।

পহান, বেরমণী, চেতনা, সংবর এবং অবিতক্কম শীল

পটিসম্ভিদামগ্‌গো-এ আলোচিত সকল শীল বিসুদ্ধিমগ্‌গো গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।[৪৫] দশ অকুশল কর্মপথ এর ধারা সম্পর্কে এগুলো আলোচিত হয়েছে। অকুশল কর্মপথ অতিক্রম করে আঠার প্রকার বিদর্শন প্রবৃদ্ধি দ্বারা মিচ্ছা বা মিথ্যা মতবাদ দূর করা হয় এবং লোকোত্তরমার্গ দ্বারা বন্ধন ছিন্ন করা যায়। উক্ত পাঁচ প্রকার শীলের প্রত্যেকটি স্ব স্ব অবস্থায় পরিপূরণের জন্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে ; যেমন−১. প্রাণিহত্যায়− ক) প্রহাণ, খ) বিরতি, গ) চেতনা, ঘ) সংবর এবং ঙ) অবিতক্কম সীল। ২. অদত্ত গ্রহণে, ৩. কামসমূহে মিথ্যাচারে, ৪. মিথ্যা কথনে, ৫. পিশুণ বাক্যে, ৬. পৌরুষ বাক্যে, ৭. সম্প্রলাপে, ৮. অভিধ্যায়, ৯. ব্যাপাদে, ১০. মিথ্যাদৃষ্টিতে, ১১. নৈষ্ক্রম্যের মাধ্যমে কামচ্ছন্দের, ১২. অব্যাপাদের মাধ্যমে ব্যাপাদের, ১৩. আলোক সংজ্ঞার মাধ্যমে স্ত্যানমিদ্ধের, ১৪. অবিক্ষেপের মাধ্যমে ঔদ্ধত্যে, ১৫. ধম্ম ব্যবস্থানের মাধ্যমে বিচিকিৎসায়, ১৬. জ্ঞানের মাধ্যমে অবিদ্যায়, ১৭. প্রমোদ্যের মাধ্যমে অবতিতে, ১৮. প্রথম ধ্যানের মাধ্যমে নিবারণ সমূহে, ১৯. দ্বিতীয় ধ্যানের মাধ্যমে বির্তক বিচারে, ২০. তৃতীয় ধ্যানের মাধ্যমে প্রীতিতে, ২১. চতুর্থ ধ্যানের মাধ্যমে সুখ-দুঃখে, ২২. আকাশানন্তায়তন সমাপত্তির মাধ্যমে রূপ সংজ্ঞায়, ২৩. প্রতিঘ সংজ্ঞার মাধ্যমে সুখ-দুঃখে, ২৪. বিজ্ঞানন্তায়তন সমাপত্তির মাধ্যমে আকাশানন্তায়তন সংজ্ঞায়, ২৫. আকিঞ্চনন্তায়তন সমাপত্তির মাধ্যমে বিজ্ঞানন্তায়তন সংজ্ঞায়, ২৬. নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তির মাধ্যমে আকিঞ্চনন্তায়তন সংজ্ঞায়, ২৭. অনিত্যানুদর্শনের মাধ্যমে নিত্যসংজ্ঞায়, ২৮. দুঃখানুদর্শনের মাধ্যমে সুখ সংজ্ঞায়, ২৯. আনাত্মনুদর্শনের মাধ্যমে আত্ম সংজ্ঞায়, ৩০. নির্বাণানু দর্শনের মাধ্যমে নন্দীর, ৩১. বিরাগানুদর্শনের মাধ্যমে রাগের, ৩২. নিরোধানুদর্শনের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

সমুদয়ে, ৩৩. প্রতিনিসর্গানুদর্শনের মাধ্যমে রাগের, ৩৪. ক্ষায়ানু-দর্শনের মাধ্যমে ঘন সংজ্ঞায়, ৩৫. ব্যয়ানুদর্শনের মাধ্যমে আয়ুহনে (বৃদ্ধির), .৩৬. বিপরিণামানুদর্শনের মাধ্যমে ধ্রুব সংজ্ঞায়, ৩৭. অনিমিত্তানুদর্শনের মাধ্যমে নিমিত্তে, ৩৮. অপ্রণিহিতানুদর্শনের মাধ্যমে প্রণিধিতে, ৩৯. শূন্যতানুদর্শনের মাধ্যমে অভিনিশে, ৪০. অধিপ্রজ্ঞা ধম্ম বিদর্শনের মাধ্যমে সারাদানাভিনিবেশে, ৪১. যথাভূত জ্ঞান দর্শনের মাধ্যমে সম্মোহাভিনিবেশে, ৪২. আদিনবানুদর্শনের মাধ্যমে আলয়াভিনিবেশে, ৪৩. প্রতিসংখ্যানুদর্শনের মাধ্যমে অপ্রতিসংখ্যায়, ৪৪. বিবর্তানুদর্শনের মাধ্যমে সংযোগাভিনিবেশে, ৪৫. স্রোতাপত্তি মার্গের মাধ্যমে দৃষ্টি একস্থ ক্লেশসমূহে, ৪৬. সকৃদাগামী মার্গের মাধ্যমে স্থূলক্লেশসমূহে, ৪৭. অনাগামী মার্গের মাধ্যমে অনুসহগত ক্লেশসমূহে, ৪৮. অর্হত্ব মার্গের মাধ্যমে সর্বক্লেশসমূহে প্রহান শীল। এইভাবেই বিরতিশীল, চেতনা শীল, সংবর শীল ও অবিতক্কম শীল এর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৪৬]

পঞ্চশীল, উপোসথ বা অষ্টশীল, দশশীল, পটিজাগর উপোসথশীল, পটিহারিয় উপোসথ শীল ও ধুতাঙ্গ শীল।

পঞ্চশীল

পঞ্চশীল হচ্ছে বৌদ্ধশাস্ত্রের পঞ্চ নৈতিক বিধান। নৈতিক চরিত্র গঠনের উদ্দেশ্যে সাধারণ গৃহস্থ বা উপাসক-উপাসিকাদের নিত্য প্রতিপাল্য পাঁচটি শীল বা শিষ্টাচারের বিধানই পঞ্চশীল নামে অভিহিত। পঞ্চশীল প্রার্থনা পালি ভাষায় করতে হয়। যথা :

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, অদত্তবস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩. কামেসু মিচ্ছচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, ব্যভিচার হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, মিথ্যাবাক্য বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫. সুরামেরেয় মজ্জপমদট্ঠনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, সুরা-মদ-জাতীয় দ্রব্য সেবন ও প্রমাদ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

উপোসথ বা অষ্টশীল পালন করা

'উপোসথ' বা 'উপসথ'। 'উপসথ' শব্দ সম্ভবত 'উপবাস' শব্দ হতে গৃহীত।[৪৭] শাক্যমুনি বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচারের প্রারম্ভে এই উপসথের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কথিত আছে, মগধরাজ বিম্বিসারের[৪৮] অনুরোধেই ভগবান বুদ্ধ উপোসথের প্রবর্তন করেন। পরবর্তীকালে এই উৎসব কেবল দায়ক-দায়িকাদের একত্র সন্নিবিষ্ট হয়ে তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় আলোচনার সুযোগ প্রদান করে তা নহে, এটি দেশের চিরচরিত প্রথা। দৈনন্দিন দুইবেলা আহার মান মাত্রেরই নিত্য নৈমত্তিক ব্যাপার। সাময়িক উপবাসের দ্বারা শরীরে খাদ্যদ্রব্যের উপযোগিতা কত তা অধিকভাবে উপলব্দ হয়। তাই অনেকের নিকট উপবাসই উপোসথের প্রধান অঙ্গ বলে পরিগণিত হয়।

উৎকৃষ্ট জীবন গঠনের জন্য উপোসথের প্রবর্তন বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস উল্লেকযোগ্য ঘটনা। কথিত আছে, পূর্ববর্তী সম্যক বুদ্ধগণও উপোসথ ব্রতের প্রবর্তন করেছিলেন। বুদ্ধশুন্য কল্পেও এক প্রকারের উপোসথ 'সোমরস উৎসব' এর দিনে পালন করা হত। 'উপোসথ' শব্দটি মূলত 'উপবাস' হতে গৃহীত হলেও বৌদ্ধ সাহিত্যে এর অর্থ গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। অষ্টমী, অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাকে উপোসথ দিবস বলে। ঐদিন উপাসক উপাসিকারা মন্দির ও বিহারে যেয়ে ত্রিশরণের শরণাপন্ন হয়ে পঞ্চশীল ও অষ্টশীল পালন করে থাকেন। শ্রদ্ধাবান উপাসক ও শ্রদ্ধাবর্তী উপাসিকারা সকল সময় পঞ্চশীল পালন করলেও ঐ দিবসগুলিতে অষ্টশীল অথবা দশশীল[৪৯] পালন করতেন।

উপোসথীকগণ উপোসথ গ্রহণ করে জাগতিক ভোগসুখের কথা ত্যাগ করে চলেন। তাঁরা বুদ্ধানুস্মৃতি, ধর্মানুস্মৃতি, সংঘানুস্মৃতি চতুর অপ্রমেয় ভাবনায় রত হয়ে সময় ক্ষেপণ করেন। তাঁরা সমস্ত প্রাণীর প্রতি দয়াশীল ও হিতাকাঙ্খী হন। তাঁরা কদাচিৎ মিথ্যা ভাষণ করেন না। তাঁরা সর্বদা সত্য ভাষণ করেন। নৃত্যগীত, বাদ্য, মালা, সুগন্ধি দ্রব্য, বিলোপন, ধারণ ও মণ্ডন হতেও বিরত

হন। তাঁরা বিকাল ভোজন পরিত্যাগ করেন। তাঁরা উচ্চ শয়নাসন ও বহুমূল্য আসবার-পত্রের ব্যবহার ত্যাগ করে তৃণশয্যায় শয়ন করেন। এইরূপ আর্যোপসথ পালনের নিম্নরূপ ফল বর্ণনা করা হয়েছে। চন্দ্রের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতি অথবা সূর্যের সমুজ্জ্বল কিরণ, কোনটাই শীলগুণের সাথে তুলনীয় নয়। সসাগরা ধরণীর মণি-মানিক্যাদিসহ ধনরত্ন, এমনকি, স্বর্গেও দিব্য ঐশ্বর্য ও অষ্টাঙ্গ উপোসথের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। উপোসথ শীলে অনাবিল দীপ্তি, চন্দ্র-সূর্যের কিরণ, মণি-মাণিক্যের উজ্জ্বল প্রভা, দেবতার দিব্য জ্যোতি সব কিছুকে শীলগুণে পরাস্ত করে। স্বর্গীয় আনন্দ উৎকৃষ্টতর হলেও ক্ষণস্থায়ী, সেটা হতে পতনের ভয় বর্তমান, কিন্তু শীল সৌরভ অবিনশ্বর চির শান্তিদায়ক।

উপোসথ হলো ধর্মানুষ্ঠানের বিশ্রাম, বৌদ্ধভিক্ষুদের পাক্ষিক (প্রতি উপোসথ দিবসে অথবা প্রতি ১৫ দিন অন্তর) বিনয় আবৃত্তি বা আলোচনা, ধর্মপালনের নিমিত্ত ‘বিকাল ভোজনাদি’ না করে উপবাসে উপবাসব্রত পালন অথবা ধর্মপালনের জন্য বৈকালিক অনশনব্রত।[৫০] পূর্ণিমা, অষ্টমী তিথি, অমাবস্যায় বিহারে গিয়ে উপোসথ শীল গ্রহণ ও পালন করা। অপরকে সেখানে আনতে চেষ্টা করা। দিনে কম পক্ষে দুবার সকাল সন্ধ্যা ত্রিরত্ন বন্দনা করতে হবে। কোনো বিষয়ে সংশয় হলে ভিক্ষুর নিকট থেকে জেনে নেয়া। কাউকে ঠকাবে না। যা রোজগার করবে তাতে সন্তুষ্ট থাকবে। প্রাণী, বিষ, নেশা, অস্ত্র ও মাংস বাণিজ্য না করা। পূর্ণিমা, অষ্টমী প্রভৃতি তিথিতে যথাসাধ্য অন্নদান করা। অবসর সময়ে কিছুসময় ভাবনার অভ্যাস করা, এতে পরকালের মঙ্গল সাধন হবে। সবসময় ত্রিরত্নের স্মরণ নেবে। মিথ্যা ধর্মে মন দেবে না। যথাসাধ্য ঔষধ দান করবে।[৫১] পঞ্চশীলসহ এই ১২টি গৃহী-বিনয় আদেশ করেছেন। এই নীতিগুলো ভগবান বুদ্ধের মুখনিঃসৃত। এসব নিয়ম ও নীতি মানলে শান্তিময় জীবনযাপন এবং উন্নত জীবন লাভ সহজ হবে। নির্বাণ পথে অগ্রসর হতে পারবে। চারি মহারাজ সূত্রে উল্লেখ আছে, “মনুষ্যদের মধ্যে বহুসংখ্যক লোক মাতাপিতা, শ্রমণ-ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, উপোসথ পালন, জাগ্রত হয়ে বিহার করে ও পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে” তাতে তাবতিংস দেবগণ আনন্দিত হন এবং বলেন তাদের দিব্য কায়া পরিপূর্ণ হবে এবং অসুরকায়া ক্ষীণ হবে।[৫২]

প্রাণিহত্যা করবে না, অদত্ত বস্তু গ্রহণ করবে না,

Dhaka University Institutional Repository

মিথ্যা ভাষণ করবে না, মদ্যপান করবে না।

অব্রহ্মচর্য হইতে বিরত হইবে।

রাত্রিতে ভোজন করবে না, অসময়ে খাদ্য গ্রহণ করবে না,

মালা পরিবে না, সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না,

মাটির উপর বিস্তৃত মাদুরে শয্যা গ্রহণ করিবে।

ইহাই অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল। বুদ্ধকর্তৃক দুঃখের অন্তসাধনের

উপায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

চন্দ্র ও সূর্য যাহা দেখিতে মধুর সেইগুলি এইদিক

সেইদিক ঘুরাফেরা করে, সেইখানে ঘুরে তথায় আলো দেয়,

আকাশপথে ঘুরিতে অন্ধকার দূর করে,

মেঘমালা দীপ্তিমান সর্বত্র আলোকিত করে।

এই ভুমণ্ডলে সর্ববিধ ধন পাওয়া যায়-

মুক্তা, স্ফটিক, পান্না, ভাগ্য প্রস্তর, স্বর্ণ থালা ;

দীপ্তিমান স্বর্ণ এবং যাহা হাটক নামে অভিহিত।

তথাপি এইসব অষ্টাঙ্গ উপোসথের ষোলাংশের

একাংশ যোগ্য নহে।

তারাগণ পরিবৃত চন্দ্রও না।

সুতরাং নর বা নারী যাহারা অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল রক্ষা করে,

পুণ্য অর্জন করে তাহারা অনিন্দিত স্বর্গে জন্ম লাভ করে।”[৫৩]

সাধারণতঃ মাসে চারটি করে উপোসথ হয়ে থাকে। ১. কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, ২. অমাবস্যা, ৩. শুক্লপক্ষের অষ্টমী, ও ৪. পূর্ণিমা। এই চারটি উপোসথ দিবসে উপাসক ও উপাসিকাগণ অষ্টশীল পালন করবে।[৫৪] লঙ্কা, শ্যাম, শান, বার্মা, আকিয়াব প্রভৃতি স্থানে এই সকল দিনে বহুলোক বিহারাদিতে সমবেত হয়ে থাকে এবং সাধ্যানুসারে নানা প্রকার দ্রব্য দ্বারা বুদ্ধপূজা করে এবং

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষুগণকে নানা উপাদেয় খাদ্য ভোজ্য ও ভিক্ষুগণের ব্যবহারোপযোগী নানা প্রকার দ্রব্য দান করে অষ্টশীল গ্রহণ ও প্রতিপালন করে থাকে।

অর্থকথা সমূহে মাসে আটটি উপোসথ দিবসের উল্লেখও দেখতে পাওয়া যায়। যথা ঃ– ১. কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী, ২. কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী, ৩. কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, ৪. অমাবস্যা, ৫. শুক্লপক্ষের পঞ্চমী, ৬. শুক্লপক্ষের অষ্টমী, ৭. শুক্লপক্ষের চতুর্দশী ও ৮. পূর্ণিমা।[৫৫] এই সকল দিবসেও উপোসথ পালন করে পুণ্যসঞ্চয় করা যায়। কুশল কর্ম যত বেশি করা যায় ততই মঙ্গল।

যারা গৃহী বা সংসারী কেউ কেউ অমাবস্যা, অষ্টমী, পূর্ণিমা কিংবা তিনমাস বর্ষাবাসের সময় অষ্টশীল পালন করে থাকেন। তখন তারা পঞ্চশীলের পরিবর্তে অষ্টশীল পালন করে থাকেন এবং শীল পরিশুদ্ধির জন্য শুধু ঐ দিন স্বামী-স্ত্রী সহবাস, বিকাল ভোজন (বেলা ১২ টার পর) আরামদায়ক মূল্যবান উচ্চশয্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকেন।

দিবস হিসেবে ভিক্ষুদের উপোসথ তিনটি। চাতুর্দশীক, পঞ্চদশীক ও সামগ্রী উপোসথ। তন্মধ্যে হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা তৃতীয় ও সপ্তম পক্ষের দুই দুই করে মোট ছয় উপোসথ চাতুর্দশীক। অবশিষ্ট প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম পক্ষের তিন তিন করে ১৮টি উপোসথ পঞ্চদশীক। একবৎসরে মোট ২৪টি উপোসথ।[৫৬]

অষ্টশীল

ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা এবং অষ্টমী তিথিতে শ্রদ্ধার সঙ্গে আটটি নিয়ম বা নীতি পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ আটটি নিয়ম বা নীতিকে ‘অষ্টশীল’ বল হয়। সাধারণত ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন যাপনের জন্যই অষ্টশীল পালন করা হয়। গৃহী বৌদ্ধরা সচরাচর পঞ্চশীল পালনে সচেষ্ট থাকেন। কিন্তু এ তিথি বা দিন সমূহে তাঁরা আরো তিনটি শীল বেশি পালন করেন। অর্থাৎ, মোট আটটি শীল পালন করেন। এ সব তিথি ছাড়াও অষ্টশীল পালন করা যায়। পঞ্চশীল পালনকারীদের সাংসারিক যাবতীয় কাজ কর্ম করতে বাধা নেই। কিন্তু অষ্টশীল পালনকারীরা তা করতে পারেন না। অষ্টশীল পালনের মাধ্যমে ব্রহ্মচর্য পালন, বিকাল ভোজন হতে বিরত, নৃত্য গীতবাদ্য, উৎসবাদি দর্শন, মাল্যধারণ সুগন্ধি দ্রব্য লেপন, মণ্ডিত ও বিভূষিত হওয়া থেকে তাঁদের

Dhaka University Institutional Repository

সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হয়। সাংসারিক চিন্তাভাবনা ত্যাগ করে সর্বদা ধর্মচিন্তা সহকারে শীল পালন করতে হয়। এ কারণে পঞ্চশীলকে গৃহীশীল, আর অষ্টশীলকে উপোসথ শীল বলে। বৌদ্ধ বিহারে কিংবা ঘরে ভিক্ষুর সামনে সুন্দরভাবে উপবেশন করে দু'হাত জোড় করে পবিত্র মনে সংক্ষেপে ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষুর বন্দনা করার পর তিনবার অষ্টশীল প্রার্থনা করতে হয়। অষ্টশীল প্রার্থনাও পালি ভাষায় করতে হয়। অষ্টশীল হলো :

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, অদত্তবস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩. কামেসু মিচ্ছচারা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, ব্যভিচার হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, মিথ্যাবাক্য বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫. সুরামেরেয় মজ্জপমদট্‌ঠনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, সুরা-মদ-জাতীয় দ্রব্য সেবন ও প্রমাদ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, বিকাল ভোজন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৭. নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্‌সন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন-বিভুসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রমত্তচিত্তে দর্শন, মালা-গন্ধ বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন বিভূষণ কারন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৮. উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, উচ্চাসন-মহাসনে শয়ন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

Dhaka University Institutional Repository

নিজে নিজে অষ্টশীল গ্রহণের বিধান

"শীল প্রদান করার কোনো উপযুক্ত ভিক্ষু পাওয়া না গেলে নিজের পছন্দ মত কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে বুদ্ধের ধাতু, প্রতিমাদি বন্দনা করে অথবা যে দিকে চৈত্যাদি আছে সেদিকে পঞ্চাঙ্গ প্রণিপাত দ্বারা বন্দনা করে প্রথমে নমস্কার পাঠ তারপর ত্রিশরণসহ অষ্টশীল গ্রহণ করবে। যার অষ্টশীলের পালিবাক্য মুখস্থ নাই তিনি 'আমি অদ্য সর্বজ্ঞ বুদ্ধ কর্তৃক প্রবর্তিত অষ্টাঙ্গশীল প্রতিপালন করব।' এইরূপ বলে সংকল্প করে শীল গ্রহণের কাজ সম্পাদিত হয়।"[৫৭]

অষ্টশীলধারী ব্যক্তির কর্তব্য

"অষ্টশীলধারী ব্যক্তিগণ কারো প্রতি হিংসা কিংবা বিদ্বেষ মনে স্থান দিবে না ; কাউকে পীড়া দিবে না বা পীড়া দেওয়াবে না ; কারো প্রতি অত্যাচার করবে না বা অত্যাচার করাবে না, পরের ধনে লোভ করবে না, অন্যের লাভ সৎকার বা প্রশংসাদি ঈর্ষা প্রকাশ করবে না, সর্বজ্ঞ বুদ্ধ উপাসক ও ভিক্ষুগণকে যে ৩২ প্রকারের 'তিরচ্ছান কথা' বলতে নিষেধ করেছেন তা বলবে না। মিথ্যা কোনো প্রকার কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিবে না, মৈথুন চেতনা অর্থাৎ স্ত্রী সহবাসাদি বিষয়ক কোন চিন্তা মনে স্থান দিবেনা ; ঊর্ষা, ক্রোধ. প্রবঞ্চনা, শঠতা, অহংকার, কামচিন্তাদি পাপ চিন্তা চিত্তকে মলিন করে, এই সকল মনে স্থান দিবে না। নিজের ব্যবসা বাণিজ্যিাদির কোনো কথা লম্বা হিসাব পত্রাদি বা গৃহস্থালীর কোনো হিসাব পত্রাদি করতে রত হবে না ; নিজের গৃহে অথবা অন্য কোনো নির্জন স্থানে গিয়ে ভাবনা করে দিন কাটাবে। সুবিধা হলে যার ইন্দ্রিয়াদি সংযত ও যিনি শীলসম্পন্ন এমন কোনো ভিক্ষুর নিকট গিয়ে ধর্মশ্রবণ করে দিন কাটাবে।"[৫৮]

অষ্টশীল প্রবারণা বা ত্যাগের নিয়ম

"আট প্রহর বা ১০ দণ্ড বা ১ দিবস বা ২৪ ঘন্টা অষ্টশীল প্রতিপালন করে প্রবারণা করতে হয়। প্রবারণা করতে ইচ্ছুক হলে ভিক্ষুর নিকট গিয়ে যথানিয়মে বসে 'অহং ভন্তে অট্ঠঙ্গ সীলং (অট্ঠসীলং, উপোসথ সীলং) নিক্খিপ্পামি, পঞ্চসীলং (পঞ্চাঙ্গ সীলং) সমাদিযামি' তিন বার বলে যথানিয়মে পঞ্চশীল গ্রহণ করলে প্রবারণা সমাধা হয়। দিবসের মধ্যে কেউ প্রবারণা করতে ইচ্ছুক হলে এই নিয়মে পঞ্চশীল গ্রহণ করলে অষ্টশীল পরিত্যাগ করা হয়।"[৫৯]

Dhaka University Institutional Repository

দশশীল

দশ প্রকার শিক্ষা পদ বা দশশীল শ্রামণদের অবশ্যই প্রতিপাল্য। শ্রামণদের শিক্ষা করা কর্তব্য বলে এগুলোকে দশ প্রকার শিক্ষা পদ বলে। এটি শ্রাবক, মহাশ্রাবক বা অন্য কারও প্রচারিত নই। বুদ্ধ রাহুল কুমারকে প্রব্রজ্যা প্রদান উদ্দেশ্যে এগুলো প্রজ্ঞাপ্ত করেছেন। তখন হতে এই শিক্ষা পদগুলো ভিক্ষু শ্রামণদের অবশ্য প্রতি পালনীয় শীলরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। দশশীলের অপর নাম প্রব্রজ্যা শীল। শ্রামণদের নিত্য পালনীয় শীলই দশশীল। ভিক্ষুর শিক্ষার্থী বলে শ্রামণ। এদের শীলকে অনুপসম্পন্ন শীল বলা হয়। শ্রামণ অর্থ শিক্ষার্থী। তাঁরা এখনও উপসম্পন্ন হয়নি। দশশীল প্রার্থনা পালি ভাষায় করতে হয়। নিম্নে দশশীল তুলে ধরা হলো :

১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

২. অদিন্নাদানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, অদত্তবস্তু (চৌর্যবৃত্তিমূলক) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৩. অব্রহ্মচরিয়া বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিয়ামি।

অর্থাৎ, অব্রহ্মচর্য হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, মিথ্যাবাক্য বলা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৫. সুরামেরেয় মজ্জপমদট্‌ঠনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, সুরা-মদ-জাতীয় দ্রব্য সেবন ও প্রমাদ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৬. বিকালভোজনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, বিকাল ভোজন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৭. নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্‌সনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, নৃত্য-গীত-বাদ্য প্রমত্তচিত্তে দর্শন, মালা-গন্ধ বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন বিভূষণ কারন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৮. মালা-গন্ধ বিলেপনা ধারণ-মণ্ডন বিভুসনট্‌ঠানা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, মালাধারণ ও সুগন্ধি বিলেপন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

৯. উচ্চাসযন-মহাসযনা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, উচ্চাসন-মহাসনে শয়ন হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

১০.জাতরূপ-রজত-পটিগ্‌গহণা বেরমণী সিক্‌খাপদং সমাদিযামি।

অর্থাৎ, সোনা-রূপা ও অর্থ গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করছি।

দশশীল হচ্ছে শ্রামণদের নিত্য পালনীয় শিক্ষাপদ। শ্রমণ যদি উক্ত শিক্ষা পদ নিজের জীবনের মধ্যে আচরণ বা প্রতিফলন ঘটাতে পারে তাহলে ধীরে ধীরে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের পথে পরিচালিত করে জীবনের মুক্তির পথ নির্বাণ লাভ করতে সক্ষম হয়। "দশশীল ভিক্ষুগণের ২২৭ শীলের অন্তর্গত, শ্রামণগণের নিত্য প্রতিপাল্য। উৎসাহ ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন গৃহস্থগণও এই দশশীল পালন করতে পারেন। অষ্টশীল প্রতিপালনে যে ফল লাভ হয় দশশীল প্রতিপালনে তা অপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয় তাতে কোনো সন্দেহ নাই।"[৬০]

পটিজাগর উপোসথ শীল

প্রতিপদ হতে পূর্ণিমা বা অমাবশ্যা পর্যন্ত পনের দিনের মধ্যে চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, নবমী, ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও প্রতিপদ পর্যন্ত মোট দশটি উপোসথ এবং মাসে বিশটি উপোসথ পালন করাকে পটিজাগর উপোসথ শীল।[৬১]

পটিহারিয় উপোসথশীল

পালি 'পটি' শব্দের অর্থ হলো প্রতি এবং 'হারিয়' শব্দের অর্থ হলো সহজে বহনীয়, সুবহ, বাহিত হবার যোগ্য।[৬২] সঠিক সময়ে পালন করতে না পারলে পরবর্তীতে নির্দিষ্ট বা নির্ধারিত সময়ে প্রতিপালন করাকে বোঝায়। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হতে আশ্বিনী পূর্ণিমা পর্যন্ত তিন মাস নিত্য উপোসথ পালন করা। তিন মাস না পারলে আশ্বিনী পূর্ণিমা হতে কার্তিক পূর্ণিমা পর্যন্ত একমাস নিত্য উপোসথ পালন করা। তাও যদি সম্ভব না হয়, আশ্বিনী পূর্ণিমা হতে কার্তিকী চর্তুদ্দশী পর্যন্ত এক পক্ষকাল নিত্য উপোসথ পালন করা। এই ত্রিবিধ উপোসথকে পটিহারিয় উপোসথশীল বলে।

Dhaka University Institutional Repository

ধুতাঙ্গ শীল

সীল বিসুদ্ধি অর্থাৎ শীল বিশুদ্ধির কর্মানুশীলন হলো ধুতঙ্গ বা দুতাঙ্গ। ধুতঙ্গসমূহ প্রতিপালিত হলেই জীবনের প্রকৃত বিশুদ্ধিতা বা পবিত্রতা আসে, বিশুদ্ধিতাই পূর্ণতা লাভ হয়। এতদ্সত্ত্বেও ধুতঙ্গ শীল নয়। এটি শীলবানের ব্রত বা প্রাত্যহিক জীবনের করণীয় কর্মপদ্ধতি মাত্র। ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক জীবনে এটি প্রত্যহ সম্পাদন করতে হয়। ধুতাঙ্গ শীল না হলেও শীলের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। ধুতাঙ্গের আলোচনার মধ্যে দিয়ে শীল বিশুদ্ধিতার বিষয়ে পরিস্কার ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে। একারণে শীলের শ্রেণিভেদের পর ধুতাঙ্গ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যা আলোচনায় না নিয়ে আসলে শীলের প্রকারভেদের আলোচনার মধ্যে অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। একারণে এ আলোচনা সংযুক্ত করা হয়েছে।

‘ধুতঙ্গ’ একটি যৌগিক শব্দ। ‘ধুত’ এবং ‘অঙ্গ’ এই দুইট শব্দের সন্ধিতে ‘ধুতঙ্গ’ শব্দের উৎপত্তি। √ধূ ধাতু থেকে ‘ধুত’ শব্দের উৎপত্তি।[৬৩] √ধূ ধাতুর অর্থ হলো ধৌত করা, বিদূরিত করা অথবা যে ধৌত করে। বুদ্ধঘোষ এর মতে, “যে ব্যক্তি পাপ ময়লাকে বিধৌত করেন অথবা কলুষ-ময়লা পরিষ্কারের জন্য ধম্ম” এবং ‘অঙ্গ’ শব্দের অর্থ হলো অংশ, দেহের অঙ্গবিশেষ, যার আভিধানিক সংজ্ঞা হলো কারণ, হেতু ইত্যাদি। তেন সমাদানেন ধুতকিলেসত্তা ধুতস্স ভিক্খুস্স অঙ্গানি অর্থাৎ ধুত ভিক্ষুর কারণই ধুতাঙ্গ।[৬৪] ঞান ধুতাঙ্গ-এর কারণ[৬৫] ধুতাঙ্গ প্রতিপত্তির কারণ। যা দ্বারা সমস্ত নীবরণ, সকল কলুষ অপসারণ করা যায়, বিমোচন করা যায় এবং যার পদ্ধতি অনুসরণে সমস্ত পাপ ময়লা হতে মুক্ত হওয়া যায় তাকে ধুতাঙ্গ বলা হয়।[৬৬] অল্পেচ্ছা, অল্পে তুষ্টি, সংশয়-মুক্তি, তৃষ্ণার বিনাশ, বীর্য বর্দ্ধন, পরিমিত ভোগ, অন্যকে প্রদত্ত বস্তুর অপরিগ্রহণ, নির্জন বাস, তীব্র আসক্তি পরিহার এবং কুশল শীল সংরক্ষণ। এই ধুতাঙ্গ ব্রতের গুণ সমূহ সমাধির উপকরণ। এই প্রকারই প্রাচীন আর্যকুলের সাধন পদ্ধতি।[৬৭]

সুতবাং বলা যায় যে, অল্প ইচ্ছা ও যথালাভে পরিতৃপ্তি গুণযুক্ত শীলই ধুতাঙ্গশীল। এই শীল অল্পেচ্ছা, পরিতৃপ্তি ও তৃষ্ণাদির লঘুতা নির্বাহক। ইহা দুঃশীল মল বিধৌত করে সুপরিশুদ্ধ শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করায়।

Dhaka University Institutional Repository

ধুতাঙ্গ শীলের গ্রহণীয় বিধান

"ধুতাঙ্গ শীল যথাযোগ্য অনুসারে প্রত্যেকে রক্ষা করে পাপমল বিধৌত করা একান্তই প্রয়োজন। এই ধুতাঙ্গ শীল ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে গ্রহণ করতে হয়। বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর মহাশ্রাবকগণের মধ্যে যে কারো নিকট উপস্থিত হয়ে গ্রহণ করতে হয়। মহাশ্রাবকের অবর্তমানে অরহৎ অথবা যে কোন অনাগামী, সকৃদাগামী, স্রোতাপন্ন, ত্রিপিটকধারী, দ্বিপিটকধারী, সঙ্গীতিকারক, ধর্মধারী বা কোনো একজন অট্ঠ কথাচার্য্যের নিকট গ্রহণ করতে হয়। অথবা এটিরও অভাব হলে চৈত্য বা বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে উৎকুটিক আসনে উপবেশন করে বুদ্ধের নিকট বলার ন্যায় ধুতাঙ্গ শীল গ্রহণ করতে হয়।"[৬৮]

ত্রয়োদশ ধুতাঙ্গ শীল

তের প্রকার ধুতাঙ্গ শীল হলো আচার শিক্ষা।[৬৯] তারমধ্যে দুই প্রকার শিক্ষা লাভ করা যায় 'চীবর' বিষয়ক ধুতাঙ্গ থেকে। এর মধ্যে রয়েছে পাংশুকুলিক চীবর এবং ত্রিচীবর।[৭০] পিণ্ডপাতিকাঙ্গ - এ পাঁচ প্রকার শিক্ষা লাভ করা যায় - পিণ্ডপাতিক, সপদান, একাসনিক, পত্তপিণ্ডিক এবং খলুপচ্ছাভত্ত।[৭১] আবাস বা বাসস্থানের সাথে পাঁচ প্রকার শিক্ষা লাভ করা যায় - অরঞ্ঞিক, রুক্খমুলিকাঙ্গ, অব্ভোকাসিকাঙ্গ, সোসানিকাঙ্গ এবং যথাসন্থতিক। উপবেশনে এক প্রকার বীর্য সম্পর্কিত শিক্ষা লাভ হয় - নেসজ্জিক ধুতঙ্গ।[৭২]

পাংশুকুলিক ধুতাঙ্গ

'পাংশু' শব্দের অর্থ কুৎসিত, বিরূপতা বুঝায়। 'পাংশুকূল' অর্থে যে স্থানে কুৎসিত, অপ্রয়োজনীয়, পরিত্যাজ্য দ্রব্যসামগ্রী ফেলে দেয়া হয় সে স্থানই পাংশুকূল। সেই পরিত্যক্ত আবর্জনাস্তূপ হতে সংগৃহীত বস্ত্রখণ্ড দ্বারা অল্পেচ্ছুতাদি শীলপ্রতিপদা পরিপূরণ ইচ্ছায় চীবর তৈরী করে ব্যবহারকারী ভিক্ষুকে বলা হয় পাংশুকূলিক।[৭৩] প্রতিপালন অর্থ গৃহী প্রদত্ত দান গ্রহণে বিরতি। সকল বস্ত্র সাধারণত শ্মাশানে, আপন দ্বারে, পুণ্যার্থীগণ কর্তৃক উৎসর্গীত, আবর্জনাস্তূপে, গর্ভমল মুছে পরিত্যক্ত, স্নান পরিত্যক্ত, স্নানতীর্থে পরিত্যক্ত, শ্মাশান প্রত্যাগতে পরিত্যক্ত, অগ্নিদগ্ধে পরিত্যক্ত, গোখাদিত, উইয়ে খাওয়া, ইদুঁর খাওয়া, দুইমাথা ছেঁড়া, দশস্থানে ছেঁড়া, ধ্বজাংকিত, স্তূপ চীবর,

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষুর চীবর, অভিষেক, ঋদ্ধিময়, পতিত চীবর, বাত্যাহত, দেব প্রদত্ত এবং সমুদ্র-উপকূলে প্রচণ্ড হাওয়ায় উড়ে আসা প্রভৃতি বস্ত্র পাংশুকুলিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এইভাবে কুড়ায় পাওয়া বা সংগৃহীত ছিন্নবস্ত্র দিয়ে প্রস্তুতকৃত চীবর পাংশুকুলিক চীবর।[৭৪]

পাংশুকূলিক ধুতাঙ্গ-ব্রত পালনকারী ভিক্ষুকে গৃহীদের থেকে চীবর লাভের প্রত্যাশী হওয়ার এবং পাংশুকূল-বস্ত্র পরিধানে গুণ দর্শন করতে হবে। তিনি এভাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হবেন : 'আমি গৃহপতিদের দানীয় বস্ত্র ব্যবহার প্রত্যাখ্যান করলাম, পাংশুকূলিক ব্রত গ্রহণ করলাম'। যেহেতু এই পাংশুকূলিক চীবর গৃহী-প্রদত্ত চীবরতুল্য লজ্জা নিবারণে সমর্থ। শীত, উষ্ণ, ডংস, মশক, ধূলাবালি ইত্যাদির উপদ্রব নিবারণেও সমর্থ। এ চীবর ব্যবহারকারীকে দাতার দানের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় না। এটি চুরি যাওয়ার আশঙ্কাও নেই, হারানোর ভয়ও নেই। এ চীবরে ভিক্ষুর আসক্তিও থাকে না। ভিক্ষুর প্রয়োজনে পাংশুকূলিক বস্ত্র সৎপুরুষের আদর্শরূপ, সংশয়মুক্ত ও শীলসম্পন্ন ভিক্ষুর পক্ষে এ ব্রত পালন সমীচীন। তিনি ইহ জীবন সুখে অতিবাহিত করেন, সকলের প্রিয় হন। ইহ জীবন বুদ্ধপ্রশংসিত এবং স্বয়ং অর্হৎগণ কর্তৃক প্রতিপাল্য ব্রত। এভাবে পাংশুকূলিক ধূতাঙ্গ-ব্রতের গুণ ও মহনীয়তা দর্শন করতে হবে।[৭৫] পাংশুকূলিক হিসেবে এ বস্ত্র অনুৎকৃষ্ট চীবর। যা দাতা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত এবং অপর ভিক্ষু কর্তৃকও পাংশুকূলিক চীবর হিসেবে গণ্য। এভাবে ভেদ অবগত হয়েই পাংশুকূলিক চীবর পরিভোগ করা কর্তব্য। যিনি শ্মশান হতে সংগৃহীত বস্ত্র দ্বারা ত্রিচীবর প্রস্তুত করে ব্যবহার করেন তিনি উৎকৃষ্ট পাংশুকূলিক। 'কোনো পাংশুকূলিক ভিক্ষু এটি গ্রহণ করুন' এ চেতনায় নিক্ষিপ্ত বা আবর্জনাস্তূপাদি হতে সংগৃহীত বস্ত্রে ত্রিচীবর করে অথবা তৈরি চীবর সংগ্রহ করে ব্যবহারকারী মধ্যম পাংশুকূলিক। পদমূলে স্থাপন করে প্রদত্ত বস্ত্রে ত্রিচীবর প্রস্তুত করে বা তৈরি করা অনুরূপ প্রাপ্ত চীবর ব্যবহারকারী মৃদু পাংশুকূলিক বলে গন্য হন। 'পাংশুকূলিক চীবরই প্রব্রজ্যাজীবনের আশ্রয়' বুদ্ধের এই বাক্য পালনে নিশ্রয়ানুরূপ প্রতিপত্তি লাভ হয়। এই ব্রত দ্বারা অর্হতাদি আর্যবংশে স্থান লাভ হয়। প্রব্রজিতের উপযুক্ত পরিস্কারই ব্যবহার হয়। অল্পমূল্যে, সুলভ এবং অনবদ্য বলে বুদ্ধকর্তৃক প্রশংসিত, প্রত্যয়, চিত্তপ্রসাদ উৎপাদনকারী, সম্যক প্রতিপত্তি বর্ধনকারী এবং অনাগত প্রব্রজ্যার্থীদেরকে এ আদর্শ ব্রত পালনে প্রেরণাদাতা হিসেবে অনুগ্রহকারী হয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

মারসেন-বিঘাতায় পাংসুকূলধরো যতি,

সন্নদ্ধ-কবচো যুদ্ধে খত্তিযো বিয় সোভতি।[৭৬]

অর্থাৎ, মারের সেনা বিশিষ্ট করার জন্য পাংশুকূলধারী যতি যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক্ষত্রিয়ের মত শোভা পায়।

তস্মাহি অত্তনো ভিক্খু পটিঞ্ঞঞং সমনুস্সরং

যোগাচারকুলম্হি পংসুকূলে রতো সিয়াতি।[৭৭]

অর্থাৎ, সেই কারণে ভিক্ষু নিজের প্রতিজ্ঞা সমনুস্মরণ করিয়া যোগাচার কূলে পাংশুকুল রত থাকিবেন।

পহায কাসিকাদীনি বরবত্থানি ধারিতং,

যং লোক গরুনা কেন তং পংসুকূলং ন ধারযে ?[৭৮]

অর্থাৎ, কশিকাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্র ত্যাগ করে লোকগুরু বুদ্ধ যা ধারণ করেছেন, সে পাংশুকূল কে না ধারণ করেন ?

ত্রৈচীবরিক ধুতাঙ্গ

'ত্রিচীবরিক' বলতে সজ্ঘাটি বা দোপাট্টা চীবর, উত্তরাসঙ্গ বা গায়ে দেয়ার চীবর, অর্ন্তবাস বা ভিতরের পরিধেয় তিনটি বস্ত্রকে বোঝায়। ত্রিচীবরিক ধূতাঙ্গধারীরা তিনটি মাত্র চীবর এবং অনুমোদনযোগ্য একটি অংশবন্ধনী ব্যবহার করতে পারেন। তা ছাড়া অষ্ট পরিস্কারের অপরাপর দ্রব্যসামগ্রী। আসল কথা তিনটি মাত্র চীবর ব্যবহারে সংকল্পবদ্ধ ভিক্ষুকে ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গধারী বলা হয়। তাই তিনি চতুর্থ কোনো ব্যবহারক্ষণেই এ ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়।[৭৯] প্রতিপালন অর্থ অতিরিক্ত চীবর প্রত্যাখ্যান। অতিরিক্ত চীবর সঞ্চয় করা দোষ এবং ত্রিচীবর ধারণের সুফল প্রত্যক্ষ করে যোগী ত্রিচীবর (সংঘাটি, উত্তরাসঙ্গ ও অন্তর্বাস) অধিষ্ঠান করেন। ত্রিচীবর ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষু স্বভাবত মাত্রজ্ঞ, লোলুপতা ত্যাগী ও অল্পেচ্ছুক হয়ে থাকেন।[৮০]

অতিরেকবত্থতহ্নং পহায় সন্নিধি-বিবজ্জিতো ধীরো,

সন্তোস-সুখ-রসঞ্ঞঞূ তিচীবর-ধরো ভবতি যোগী।[৮১]

অর্থাৎ, বস্ত্র-সন্নিধি বিবর্জ্জিত ধীর ত্রিচীবরদারী যোগী অতিরিক্ত বস্ত্র-তৃষ্ঞা পরিত্যাগ করে সন্তোষ-সুখরসজ্ঞ হয়ে থাকেন।

তস্মা সপত্তচরণো পক্খীব সচীবরো ব যোগিবরো,

সুখং অনুবিচরিতুকামো চীবর-নিয়মে রুচি করিবেন।[৮২]

অর্থাৎ, তাই চরণ ও পাখার উপর নির্ভর করে বিচরণশীল পক্ষীর মত সচীবর যোগীবর সুখে অনুবিচরণ করতে ইচ্ছুক হলে চীবর-নিয়মে রুচি করবেন।[৮৩] ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গ-শীল অনুশীলনরত ভিক্ষু যদি চীবর তৈরির জন্যে বস্ত্র লাভ করেন, সে বস্ত্রে চীবর তৈরি করতে কোনো সাহায্যকারী বা আনুষাঙ্গিক উপকরণ না পাওয়া পর্যন্ত বস্ত্র হিসেবে রেখে দিতে পারেন। কিন্তু চীবর তৈরি করে রং করার পর তা আর সাথে রেখে দিলে ধুতাঙ্গ চোরে গণ্য হতে হয়। নতুন চীবর অধিষ্ঠানের আগেই পুরনো চীবর পরিত্যাগ করতে হয়। এটি পুণ্যবান ভিক্ষুর আচরণীয় ব্রত। এটি দ্বারা ভিক্ষু লজ্জা নিবারণ ও দেহ আচ্ছাদনার্থ মাত্রেই চীবর ব্যবহার সংজ্ঞায় নিয়ত প্রত্যবেক্ষণ-বিশুদ্ধিতা লাভ করেন। তিনি অনাবশ্যকীয় বস্তু সঞ্চয় পরিহার করে বস্তু সঞ্চয়ের উপদ্রব হ্রাস করেন।

পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ

প্রতিপালন অর্থ অন্যের নিমন্ত্রণ গ্রহণে বিরতি। পিণ্ডপাতিকাঙ্গ ব্রত গ্রহণ করে যোগী চৌদ্দ প্রকার পরিভোগ পরিত্যাগ করে থাকেন।[৮৪] এই ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষু ইচ্ছানুসারে যেকোন স্থানে গমন কিংবা অবস্থান করতে পারেন। তাঁর জন্য কাউকে পিণ্ড পাক করতে হয় না। এতে কোন অহংকার থাকে না। বিবিধ প্রকার ব্যঞ্জনের স্বাদ সম্বন্ধে কোন লোভ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না এবং তিনি স্বভাবত নিঃসন্দেহ হয়ে থাকেন।[৮৫]

পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষুকে নিম্নোক্ত ভোজনসমূহ বর্জন করতে হয়। যথা : সংঘের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন, নির্দিষ্ট ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন, পরলোকগত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন, সাংঘিক বিহারে শলাকার বা টিকেট লটারী যোগে বণ্টনকৃত ভোজন, পূর্ণিমা-আমাবস্যা-অষ্টমী এ সকল দিনে উপোসথ শীলদারীগণের আনীত ভোজন, প্রতিপদ তিথিকে শুভজ্ঞানে সেদিন প্রদত্ত ভোজন, নবাগত ভিক্ষু, দূর যাত্রায় গমনোদ্যত ভিক্ষু বা রুগ্ন ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে আনীত ভোজন,

রূগ্ন ভিক্ষুর সেবকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন, বিহারের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভোজন, গ্রামবাসী কর্তৃক পালাক্রমে নির্দিষ্ট প্রদত্ত ভোজন ইত্যাদি।[৮৬]

পিণ্ডিয়ালোপসন্তট্ঠো অপরায়ত্তজীবিকো,
পহীনাহারলোলুপ্পো হোতি চাতুদ্দিসো যতি।
বিনোদয়তি কোসজ্জং আজীবস্স বিসুজ্ঝতি,
তস্মা হি নাতিমঞ্ঞেয্য ভিক্খাচরিয়ং সুমেধসো।[৮৭]

অর্থাৎ, কৌসীদ্য বা অলস্য বিনষ্ট, অর্থাৎ আলস্য বিনষ্ট করে পিণ্ডপাত করতে হয় বলে আলস্যহীন হয়, আজীব বিশুদ্ধ হয় পিণ্ডপাত করে আহারে কোনরূপ দোষ নাই বলে বিশুদ্ধজীবিকা। এই কারণে সুমেধ ব্যক্তি ভিক্ষাচরণকে তুচ্ছ মনে করবেন না।

পিণ্ডপাতিকস্স ভিক্খুনো অন্তভরস্স অনহ্ঞপোসিনো
দেবা পিহযন্তি তাদিনো, নোচে লাভসিলোক-নিসৃসিতো।[৮৮]

অর্থাৎ, পিণ্ডপাতিক, আত্মভর, অনন্যপোষী ভিক্ষু যদি লাভ ও প্রশংসা বশীভূত না হন তবে দেবগণও তাদৃশ ভিক্ষুকে স্পৃহা করেন অর্থাৎ তাঁহার সঙ্গ ইচ্ছা করেন।

অনুশীলন প্রভেদে পিণ্ডপাতিক উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু হয়ে থাকে।

উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু ভিক্ষান্ন সংগ্রহের সময়ে সম্মুখ বা পশ্চাৎ হতে আনীত অন্ন-ব্যঞ্জন গ্রহণ করেন। দরজার বাইরে অথবা কোনো স্থানে সমবেত দাতাদের সামনে গিয়ে পাত্র হাতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারেন, অথবা দায়ক দ্বারা প্রার্থিত হয়ে দাতার হাতে পাত্র ত্যাগ করে এক স্থানে দাঁড়িয়েও থাকতে পারেন। পিণ্ডচারণ হতে প্রত্যাবর্তনকালে কেউ কিছু দিতে চাইলে তাও গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু কোথাও বসে থেকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে পারেন না উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাতিক কোনো গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে দাতা কর্তৃক আহুত হলে পাঁচ মিনিটের অধিক দাঁড়িয়ে থাকা অনুষ্ঠিত।[৮৯]

মধ্যম অনুশীলনকারী ভিক্ষান্ন সংগ্রহের সময়ে দায়কের ইচ্ছায় তাদের বাড়িতে দীর্ঘক্ষণ বসে থেকেও ভিক্ষান্ন পাত্রে নিতে পারেন। কিন্তু তৎপরবর্তী দিনের জন্যে অনুরূপ অনুরোধ রক্ষা করতে

পারেন না।[৯০] মৃদু অনুশীলনকারী প্রথম দিনসহ পরবর্তী দুদিনের জন্যে অনুরূপ অনুরোধ রক্ষা করতে পারেন। কিন্তু চতুর্থ দিনের জন্যে আর পারবেন না।[৯১]

সপদানচারিক ধুতাঙ্গ

স-অপদান। এখানে 'সব' অর্থে সহ বা সাথে। অপেত বা 'অপদান' অর্থে দূরত্ব বা ফাক না রাখা বুঝায়। অত্রএব 'সপদানচারিকং' অর্থে মাঝখানে এক গৃহ বাদ দিয়ে অপর গৃহে পিণ্ডচারণ না করে অনুক্রমে ধনী-দরিদ্র-নির্বিশেষে সকল গৃহ হতে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করা। এ কারণে সপদানচারিক ভিক্ষুকে অখন্ড ভিক্ষান্নজীবী বলা হয়।[৯২] সপদানচারী সাধক অনাসক্তি বশত সকল প্রাণীর প্রতি সৌম্যভাব পোষণ করেন বলে পরিভোগ স্পৃহা ধ্বংস হয়। নিমন্ত্রণ তাঁকে আল্হাদিত করেনা, গৃহীদের প্রশংসায় তুষ্ট করতে হয় না এবং গৃহীদের সঙ্গ কামনা করতে হয় না। হতচকিত কোথাও গমন করতে হয় না। সৎপুষের সংশ্রব হয় এবং সতত দোষমুক্ত থাকেন।[৯৩] সপদানচারিকের পিণ্ডচারণকালে হস্তি, অশ্ব, অন্যান্য পশু বা নরনারীকে কামসম্ভোগরত দেখে কোনো গৃহ বাদ দিতে হলে ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয় না। আচার্য, উপাধ্যায় বা অতিথি ভিক্ষুর পশ্চাদ্গমনের কারণে সপদানচারিক বিধি লঙ্ঘিত হলেও ব্রত ভঙ্গ হয় না।[৯৪]

চন্দুপমো নিচ্চনবো কুলেসু
অমচ্ছরী সব্বসমানুকম্পো
কুলুপকাদীনব-বিপ্পমুত্তো
হোতীধ ভিক্খু সপদানচারী।[৯৫]

অর্থাৎ, ইহ সংসারে সপদানচারী ভিক্ষু কুলসমূহে অনাসক্তি বশতঃ ও সৌম্যভাবে চন্দ্রের ন্যায়, কূলসমূহে নিত্য নতুন, মাৎসসর্য্যহীন, সকলকে সমান অনুকম্পকারী, কুলোপগ হওয়ার দোষ হতে বিপ্রমুক্ত হয়ে থাকেন।

লোলুপ্যচারঞ্চ পহায় তস্মা
ওক্খিত্তচক্খু যুগমত্তদস্সী
আকঙ্খমানো ভুবি সেরিচারং

Dhaka University Institutional Repository

চরেয়্য ধীরো সপদানচারন্তি।[৯৬]

অর্থাৎ, তাই লোলুপ্যাচার পরিত্যাগ করে, অবক্ষিপ্ত চক্ষু ও যুগমাত্রদর্শী হয়ে পৃথিবীতে ইচ্ছামত বিহার আকাঙ্খা করলে পণ্ডিত ব্যক্তির সপদানচার করা উচিৎ।

তিনি গৃহীকুলের শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, দাতা, অদাতা, ধনী, দরিদ্র, উত্তম, হীন এ সকল কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্তি-বিরক্তি বর্জিত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত চিত্তে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে সুখ উপভোগ করেন। সপদানচারিক গৃহকুলে নিত্য অপরিচিত অতিথি ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আবির্ভূত হন। তাঁর জীবন নিশ্চিতরূপে অল্পেচ্ছু ও অল্পে তুষ্টিতা মনোবৃত্তির উপর দৃঢ় ভিত লাভে সক্ষম হয়।[৯৭]

একাসনিক ধুতাঙ্গ

একাসনিক অর্থে একামাত্র আসনে উপবেশনকারী বুঝায়। কিন্তু এখানে ভোজনের উদ্দেশ্যে দিনে একবারমাত্র আসন গ্রহণকারী বুঝায়। যে ভিক্ষু সংকল্পবদ্ধ হন–‘আমি নানাসনে বার বার ভোজন গ্রহণ ত্যাগ করলাম এবং একাসনে ভোজন সমাপ্তি ব্রত গ্রহণ করলাম’ এই বাক্য পালনকারীকে একাসনিক ধুতাঙ্গধারী বলা হয়।

তিনি ভোজনশালায় বসার সময়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণের আসনে না বসে নিজের উপযুক্ত আসনে বিচারপূর্বক উপবেশন করবেন। ভোজন শুরু করার পর আচার্য বা উপাধ্যায় স্থানীয় ভিক্ষুর আগমন ঘটলে, আসন রক্ষা করে অবশিষ্ট ভোজন সমাপ্ত করবেন এমতাবস্থায় ত্রিপিটকে তুলাভয় স্থবিরের মতে, সেদিনের আহার বন্ধ রেখে হলেও গুরুসেবাই করতে হবে। কারণ আচার্য-উপাধ্যায় ব্রত বুদ্ধশাসনে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যাবিমুক্তি ব্যক্তিগত সম্পদ, বুদ্ধশাসন সমষ্টিগত সম্পদ।

বিমুক্তিমার্গ গ্রন্থমতে গুরুসেবা বা ঝড়-বৃষ্টির ন্যায় কোনো বিঘ্ন উপস্থিত হলে আসনচ্যুতিতে একাসনিক ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয় না। এটাই যুক্তিসিদ্ধতা।

এ ধুতাঙ্গ পালনকারী নিরোগী হন। তাঁর মানসিক দুঃখ ভার লাঘব হয়, শরীর হালকা ও স্বচ্ছন্দ গতিশীল হয়, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মানসিক প্রশান্তি বর্ধিত হয়। অপর্যাপ্ত আহারেও কোনো ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টি ভাব জাগে না। খাদ্যের রসাস্বাদন লোলুপতা ত্যাগ হয়। অল্পে

তুষ্টি ও অল্পেচ্ছুতা ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এভাবে বহু প্রকারে তিনি সুখী জীবনের অধিকারী হন। তাই উক্ত হয়েছে :

একাসন ভুঞ্জমান ন যতিং ভোজন পচ্চয়া রুজা
বিহসন্তি রসে আলোলুপ্পো পরিহাপেতি ন কম্মং অত্তনো।[৯৮]

অর্থাৎ, একাসনে ভোজনরত যোগীর ভোজনের কারণে কোনো রোগ হয় না। তিনি রসে লোলুপতা দমন করেন। ফলে তাঁর সমস্ত কার্য সুসিদ্ধ হয়।

ইতি ফাসুবিহার কারণে সুচিসল্লেখরতুপসেবিতে,
জনযেথ বিসুদ্ধমানসো রতিমেকাসন-ভোজনে, যতীতি।[৯৯]

অর্থাৎ, বিশুদ্ধচিত্ত যতি ফাসুবিহার কারণে শুচিসল্লেখরতোপসেবিত একাসনভোজনে রতি জন্মা হবে।

পাত্রপিণ্ডিক ধুতাঙ্গ

প্রতিপালন অর্থ লোভ পরিহার। একই পাত্রে সমস্ত খাদ্যভোজ্য পরিভোগ করার ব্রত গ্রহণ করাই পত্তপিণ্ডিকাঙ্গ[১০০] ধুতাঙ্গ। একপাত্র ভিন্ন অন্য কোনো থালা কিংবা বাটী পত্তপিণ্ডিক ধুতাঙ্গধারী সাধক ব্যবহার করতে পারেন না। কারণ তাতে ধুতাঙ্গ ব্রত ভেঙ্গে যায়। একপাত্র ব্যবহারিক যোগী একসাথে নানা স্বাদ উপলব্ধি করেন, যে কোন খাদ্য অত্যধিক ইচ্ছা পরিত্যক্ত হয়, ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হন ও অল্পেচ্ছুক হয়ে সন্তুষ্টিলাভ করে থাকেন।

'পাত্রপিণ্ডিক' শব্দটি পাত্র বা থালা এবং পিণ্ড বা ভাত – এ দুটির সাথে ভোজনকারীর সম্পর্ক বুঝায়। তাই সাধারণ অর্থে পাত্রে পিণ্ড ভোজনকারীকে পাত্রপিণ্ডিক বলা হয়। কিন্তু এখানে ভোজনকারী যখন একটি মাত্র নির্দিষ্ট পাত্র ব্যতিরেখে দ্বিতীয় কোনো পাত্র ভোজনকর্মে ব্যবহার না করার সংকল্প গ্রহণ করে শীলব্রত পালন করেন তখন তা হয়ে যায় পাত্রপিণ্ডিক ধুতাঙ্গ। এক কথায় ভোজনে ভিন্ন ভিন্ন পাত্র ব্যবহারে রসাস্বাদন লোলুপতাদি দোষ, একমাত্র পাত্র ব্যবহারে লঘুভার ও লোলুপতা দমনগুণাদি দমন এই ব্রত পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

নানা-ভাজন-বিক্‌খেপং হিত্বা ওক্‌খিত্ত-লোচনো,

খনন্তো বিয় মুলানি রসতহ্নায় সুব্বতো,

রূপং ুবয় সন্তুট্ঠিং, ধারায়ন্তো সুমানসো ;

পরিভুঞ্জেয়্য আহারং কো অঞ্ঞো পত্তপিণ্ডিকো ।[১০১]

অর্থাৎ, নানা ভোজন বিক্ষেপ পরিত্যাগ করে, রসতৃষ্ণার মূল খনন করার ন্যায়, স্বরূপের মত সন্তুষ্টি ধারণ করে অবিক্ষিপ্ত চক্ষু, সুব্রত সুমানস পাত্রপিণ্ডিক ব্যতীত অন্য কে আহার পরিভোগ করে!

খলুপচ্ছাভত্তিক ধুতাঙ্গ

ভোজন সমাপনান্তে পুণরায় খাদ্য গ্রহণ কিংবা ভোজন সমাপ্তি ঘোষণার পর খাদ্য ভোজন গ্রহণ না করার ব্রতানুষ্ঠান করার নামই খলুপচ্ছাভিত্তিক ধুতাঙ্গ। এই ধুতাঙ্গ অনুশীলনে অতিরিক্ত আহারজনিত আপত্তি বা দোষ হতে মুক্ত থাকা যায়। ঔদরিক রোগ থাকেনা এবং অল্পেচ্ছুতা বৃদ্ধি পায়।[১০২]

সিংহলী পুরাতন অট্ঠকথামতে ‘খলু’ হলো এক জাতীয় পাখির নাম। এ পাখি মুখ হতে যদি কোনো ফল পড়ে যায় সেদিন আর কোনো ফল সে ভক্ষণ করে না। এটাই পাখির স্বভাব। পাখির এ সংযম স্বভাব ধুতাঙ্গ অনুশীলনকারীর জীবনে প্রতিষ্ঠা প্রয়াসের কারণেই ধুতাঙ্গটির নামকরণ হয়েছে ‘খলুপশ্চাৎভত্তিক ধুতাঙ্গ’। কারণ এই ব্রতধারী যথারীতি আহার গ্রহণের পর পুনঃ আনীত খাদ্য নিষ্প্রয়োজন বলে যখন প্রত্যাখ্যান করেন সেই প্রবারিত অনুরোধবশে বা লোভবশে তখন আর গ্রহণ করেন না। ‘খলু’ এখানে ‘না’ বা নিষেধ অর্থে নিপাত পদরূপে খাদ্য প্রত্যাখ্যানের অর্থ প্রকাশ করছে। ‘ভত্তং’ অর্থ ভাত। ‘পচ্ছাভত্তং’ অর্থ পরবর্তী আহার। অর্থাৎ, যে আহার পরবর্তীকালে লাভ হয় তা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে বুঝানো হয় যে, তিনি পূর্বে যা গ্রহণ করেছেন তাতেই সন্তুষ্ট, পুনঃ গ্রহণের দরকার নেই। কিন্তু ‘পশ্চাৎভত্তিক’ অর্থে পরে ভোজনকারী বুঝায়। এখানে শব্দটির পূর্বে ‘খলু’ যুক্ত হয়ে পরের শব্দকে বিপরীতার্থক করা হয়েছে। অর্থাৎ না পশ্চাৎভত্তিক হয়ে গেছে। তাই এ ধুতাঙ্গ গ্রহণকালে বলতে হয় : ‘আমি অতিরিক্ত ভোজন ত্যাগ করছি, খলুপশ্চাৎভত্তিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করছি।[১০৩]

Dhaka University Institutional Repository

আরঞ্ঞিকাঙ্গ

গ্রামান্তরে শয়নাসন প্রত্যাখান করে অরণ্যে শয়নাসন গ্রহণ করার ব্রতাধিষ্ঠানই আরঞ্ঞিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ। তবে এইরূপ অরণ্যশয়নাসনগ্রাম হতে উপযুক্ত দূরত্ব বজায় থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন কারণে যদি গ্রামান্তর শয়ন করা হয় তবে অরুণোদয়ের পূর্বে অরণ্যে অধিষ্ঠিত শয়নাসনে গিয়ে পৌঁছাতে হবে। এই ব্যতিক্রম হলে ধুতাঙ্গ ভেঙ্গে যায়। আরঞ্ঞিক ধুতাঙ্গধারীর অরণ্যে বিহারের ফলে নতুন সমাধি লাভ হয় এবং লব্ধ সমাধি প্রবৃদ্ধি হয়। অবিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে সুখে অবস্থান করেন।[১০৪]
সুবিশুদ্ধ শীল প্রতিপদা পালনের উদ্দেশ্যে যিনি লোকালয় বর্জনপূর্বক চিত্তপ্রশান্তিকর নির্জন অরণ্যে বসবাস করেন তিনিই আরণ্যিক।[১০৫] অরণ্য - সংজ্ঞা নির্ধারণে বলা হয়েছে, প্রাচীরবিহীন গ্রামের শেষ প্রান্ত সীমায় অবস্থিত ঘরের দরজা হতে মাতৃজাতি জল নিয়ে ছুঁড়ে ফেললে যেখানে পতিত হয় তা গরোপচার বা গৃহসীমা। সেখান থেকে বলবান পুরুষের শক্তি প্রমাণে নিক্ষিপ্ত এক ঢিল পরিমাণ দূরত্ব গ্রামোপ্রচার বা গ্রামসীমা। গ্রামসীমার পরবর্তী সমস্তই অরণ্য হিসেবে গণ্য।
যদি আরণ্যিক ভিক্ষুর আচার্য-উপাধ্যায় অসুস্থ হন এবং অরণ্যে যদি ঔষধ-পথ্যাদি পাওয়ার অসুবিধা হয় তা হলে শয়নাসনে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা ও সেবা কর্তব্য। কিন্তু প্রাতে সূর্যোদয়ের আগে সেবাকারী ভিক্ষু অরণ্য-সংজ্ঞাভুক্ত স্থানে অরুণোদয় ঘটানো কর্তব্য। যদি এ সময়ে রোগীর রোগ বৃদ্ধির লক্ষণ প্রকাশ পায় তা হলে ধুতাঙ্গ ভঙ্গ করে হলেও রোগীর সেবা কর্তব্য। এটিই বুদ্ধের শাসনিক বিধান।[১০৬]

পংকূলঞ্ঞ এসো ব, কুবচং বিয় ধারযং,
অরঞ্ঞসঙ্গাম গতো অবসেসধুতা যধো।
সমত্থা ন বিস্সসেব জেতুং মারং সবাহনং,
তস্মা অরঞ্ঞাবাসম্হি রতিং করিযায পণ্ডিতো।[১০৭]

অর্থাৎ, এ ভিক্ষু পাংশুকূল চীবর কবচের মতো ধারণ করে অবশিষ্ট ধুতাঙ্গ - শীলরূপ আয়ুধে সজ্জিত হয়ে অরণ্য সংগ্রামে গিয়ে অচিরেই সসৈন্য মারকে জয় করতে সক্ষম হন। সে কারণে পণ্ডিত ব্যক্তিমাত্রেই অরণ্যবাসে ইচ্ছা উৎপন্ন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রুক্‌খমূলিকাঙ্গ

আচ্ছাদিত আবাস প্রত্যাখ্যান করে রুক্‌খমূলে বা বৃক্ষমূলে আবাস গ্রহণের জন্য হলো রুক্‌খমূলিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ। আবার যে কোনো বৃক্ষের মূলে আবাস গ্রহণ করা যায় না। যে বৃক্ষ সীমা সংরক্ষিত, চৈত্যবৃক্ষ, নির্যাস বৃক্ষ, ফলবৃক্ষ, বাদুরের বাসবৃক্ষ এবং বিহারস্থ বৃক্ষ ইত্যাদির মূলে বৃক্ষ মূলিক ধুতাঙ্গ হয় না। এক্ষেত্রে বিহার প্রত্যন্ত বৃক্ষই সমীচীন বৃক্ষ। উল্লেখ্য যে, উপোসথ কিংবা ঝড়বৃষ্টির সময় আচ্ছাদিত গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করলে সাধকের ধুতাঙ্গ ব্রত ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। বৃক্ষমূল ধুতাঙ্গ অনুশীলনে অনেক সুফল লাভ করা যায়। তরুলতা ও পর্ণ দর্শনে অনিত্য সংজ্ঞার উদয় হয়। আচ্ছাদিত আরামে শয়নাসন জনিত মাৎসর্য অপনোদন হয় এবং কর্ম প্রিয়তার মোহ থেকে অব্যাহতি লাভ করা যায়। দেব সংবাস হয়ে থাকে। সর্বোপরি অল্পেচ্ছু হয়ে যোগী থেকে অবস্থান করেন।[১০৮]

বিমুক্তি নির্বাণানুকূল শীরপ্রতিপদা সংবর্ধনার্থে ভিক্ষুজীবনের প্রধান আশ্রয় চতুষ্টয়ের অন্যতম 'বৃক্ষমূলে শয়নাসনে গ্রহন করবো, আচ্ছাদনযুক্ত শয়নাসন ত্যাগ করবো' এ সংকল্প অনুশীলনের নাম বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ।[১০৯] অঙ্গুত্তর-ভানক মতে আচ্ছাদিত স্থানে অরুণোদয়ক্ষণেই এ ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। কিন্তু বিমুক্তিমার্গ গ্রন্থে বলা হয়েছে, সাধক ভিক্ষু অসুস্থতা, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদির মতো অন্তরায় উপস্থিত হলে যদি বিহার বা অন্য কোনো আচ্ছাদনে সাময়িক আশ্রয় গ্রহণ করেন, অথবা সূর্যোদয় করেন তাতে বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয় না। অনিচ্ছাকৃত বা অনিবার্য কারণ ছাড়া করলেই দোষ। তাই বৃক্ষমূলিকে 'অরুণোদয়' বিষয়ে আরণ্যিকের সুবিধা ও অন্তরায়সমূহ গ্রহণযোগ্য এবং অব্ভোকাশিক ও আরণ্যিকের ঋতুভেদও অনুসরণীয়।

বৃক্ষমূলিক ধৃতাঙ্গে এ সকল গুণাবলি দর্শন করেই নিম্নের গাথাগুলো ভাষিত হয়েছে :

বন্নিতো বুদ্ধসেট্‌ঠেন নিস্‌সযোতি চ ভাসিতো,
নিবাসো পবিবিত্তস্‌স রুক্‌খমূল সমোকুতো?[১১০]

অর্থাৎ, বুদ্ধশ্রেষ্ঠ কর্তৃক বর্ণিত ও চার নিশ্রয়ের অন্যতম বলে কথিত এই বৃক্ষমূল ছাড়া নির্জনতা ও একক অবস্থান আকাঙ্খীর পক্ষে প্রিয় স্থান আর কোথায় আছে ?

তস্মাহি বুদ্ধ দাযজ্জং ভাবনাভিরতালয়ং,

Dhaka University Institutional Repository

বিবিত্তং নাতি মঞ্ঞেঞ্ঞয্য রুক্খমূলং বিচক্খনোতি।[১১১]

অর্থাৎ, সে কারণে বুদ্ধের উত্তরাধিকারী বিচক্ষণ ব্যক্তি ভাবনায় অভিরমিত হওয়ার স্থান বিবেক বৃক্ষমূলকে কখনো অবজ্ঞা করেন না।

অব্ভোকাসিকাঙ্গ

আচ্ছাদিত আবাস কিংবা বৃক্ষমূল আবাস পরিত্যাগ করে মুক্তাকাশের নিচে (অব্ভোকাস) আবাসস্থান গ্রহণের ব্রতাষ্ঠানই অব্ভোকাসিকাঙ্গ ধুতাঙ্গ। এই ধুতাঙ্গধারী যোগী উপোসথকালীন, ভোজনের সময়, ঝড়বৃষ্টির সময় কিংবা প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময় গৃহে আচ্ছন্ন গৃহে কিংবা ধর্মশালায় প্রবেশ করলে ধুতাঙ্গ ভেঙ্গে যায় না। উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসবাসকারী যোগী বনচর মৃগের মতো মুক্ত বিহারী, তিনি প্রশংসার দাবীদার, নিঃসঙ্গতা এবং অল্পেচ্ছুতার অধিকারী হয়ে সুখে অবস্থান করেন।[১১২]

অব্ভোকাশিক (অব্ভো + অবকাসিক) অর্থে খোলা আকাশের নিচে অবস্থানকারী বুঝায়। যিনি বৃক্ষমূল, গৃহ, আচ্ছাদনাদি পরিত্যাগ করে খোলা আকাশতলে শীলপ্রতিপদা পূরণার্থে অবস্থানের সংকল্প গ্রহণ করেন তিনি 'অব্ভোকাশিক ধুতাঙ্গধারী' নামে অভিহিত হন।

আবাসজনিত যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটাতে সক্ষম হন, তন্দ্রালস্য পরিবারে সক্ষম হন, মৃগের ন্যায় অসঙ্গচারী (একক বিহারী) ও আলয়হীন এই ভিক্ষু জীবন বুদ্ধের উক্ত প্রশংসাবাক্যের যথার্থতা উপলব্ধিতে সক্ষম হন, সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ততা-সুখ তাঁর অধিগত হয়, মুক্ত পাখির ন্যায় তিনি চতুর্দিকে অবাধ বিচরণশীল হতে পারেন এবং চিত্তে অল্পেচ্ছুতা ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

সোসানিকাঙ্গ

শ্মশানে রাত্রি যাপনের অধিষ্ঠান ব্রত সম্পাদনই সোসানিক বা শ্মশানিক ধুতাঙ্গ। এইরূপ ধুতাঙ্গধারী যোগী শ্মশান ব্যতীত অন্যত্র কোন আবাসে রাত যাপন করেন না। শ্মশান বলতে গ্রামবাসী যেস্থানে নির্বাচিত করে শ্মশানের জন্য সংরক্ষিত করে রেখেছে, তা নয়। তাই উক্তস্থানে সাধক শ্মশানিক ধুতাঙ্গ প্রতিপাদন করা উচিত নয়। মৃতদেহ পোড়ানোর সময় হতে ১২ বৎসর পর্যন্ত যদি ঐস্থান পতিত অবস্থায় পড়ে থাকে তাও শ্মশানরূপে গণ্য করা যায়। এছাড়া শবদেহ পোড়ানোর কাজে

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহৃত স্থানই শ্মশান বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়। শ্মশানিক ব্রতধারী শ্মশানে কোন আবাস, মঞ্চ, পানীয় জলের ব্যবস্থা, ধর্মাবৃত্তি প্রভৃতি থেকে বিরত থাকবেন। বিধান মতে সংঘথেরোকে জ্ঞাপন করে শ্মশানিকের শ্মশান গমন বিধেয়। শ্মশানিক ব্রতদারী সাধক প্রত্যহ শ্মশানে রাত্রি যাপন করবেন। রাতের শেষযামে শ্মশান থেকে বিহারে প্রত্যাবর্তন করা বিধেয়। অমনুষ্যগণের প্রিয়খাদ্য পোলাও, মাংসমিশ্রিত ভাত, মদ, মাংস, ক্ষীর, তেল, গুড় ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য শ্মশানিক ধুতাঙ্গধারী সাধক ভোজন করবেন না। এছাড়া গৃহস্থ গৃহে প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। শ্মশানিক ব্রতধারী সাধক শ্মশান বাসের ফলে মরণানুস্মৃতি লাভ করেন, অপ্রমত্ত বিহারী হন, অশুভ দর্শন করেন, কামরাগ মুক্ত হন এবং কায় স্বভাব অবলোকন করেন। অনিত্য সংবেগ উৎপত্তি হয় এবং অমনুষ্যগণের ভক্তিভাজন হয়ে থাকেন।[১১৩]

শ্মশানে শয়নাসনে গ্রহণকারীর নাম শ্মশানিক। যেখানে কমপক্ষে বারো বছর যাবৎ মৃতদেহ পোড়ানো বা ফেলে দেয়া হয় তা-ই শ্মশান নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য। কেবল গ্রামবাসী দ্বারা 'এটি শ্মশান' এমন বলা মাত্রেই শ্মশানিক ধুতাঙ্গধারী তথায় বাস করা অনুচিত।

এই ধুতাঙ্গ পালনকারীর নিকট মরণানুস্মৃতি সর্বদা জাগ্রত থাকে। সর্বত্র অপ্রমত্তভাব বজায় থাকে। দেহের অশুভ ভাব প্রকট হয়। কামরাগ অপনোদিত হয়। দেহের প্রকৃত স্বরূপ, স্বভাব অবলোকনের সুযোগ হয়। চিত্তে অনিত্যাদি সংবেগ প্রবল থাকে। দেহের পুষ্টতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, শক্তিমত্তো ইত্যাদি প্রমাদবহুলতার অবসান হয়। ভয়-ভীতি সংস্কার দূরীভূত হয়। তিনি অমনুষ্যদের প্রিয় হন এবং তাদের সম্মান-গৌরব লাভ করেন। শ্মশানিকের অল্পেচ্ছুতা এবং অল্পাকাঙ্ক্ষা ভাব বৃদ্ধি পায়। শ্মশানিক ধুতাঙ্গের এ সকল গুণাবলির কারণেই উক্ত হয়েছে :

সোসানিকং হি মরণানুস্‌সতিপ্পভবা,
নিদ্দগতম্পি ন ফুসন্তি প্রমাদ দোসা;
সম্পস্‌সতো চ কুণপানি বহুনি তস্‌স,
কামারাগ বসগতম্পি ন হোতি চিত্তং।
সমত্থা ন বিস্‌সসেব জেতুং মারং সবাহনং,
তস্মা অরঞ্‌ঞাবাসম্‌হি রতিং করিযায পণ্ডিতো।[১১৪]

অর্থাৎ, মরণানুস্মৃতির প্রভাবে নিদ্রাগত শ্মশানিককেও প্রমাদ-দোষসমূহ স্পর্শ করতে পারে না। বহু মৃত পঁচা শরীর দর্শন করায় তাঁর চিত্ত কামানুরাগের বশীভূত হয় না।

যথাসন্থিক ধুতাঙ্গ

প্রতিপালন অর্থ মনোরম স্থানে শয়নাসন গ্রহণের অনিহা। লোভ বশত শয়নাসন পরিবর্তনের ইচ্ছা বর্জন করে যথানির্ধারিত শয়নাসন ব্যবহারে সন্তুষ্ট থাকার ব্রতাধিষ্ঠানই এই দুতাঙ্গের লক্ষ্য। তাই এটি যথাসন্থতিকাঙ্গ বা যথানির্ধারিত আসন ব্যবহার ধুতাঙ্গ নামে অভিহিত। এই ধুতাঙ্গরীতি প্রতিপালনে সহগামী ব্রহ্মচারীদের প্রতি হিতৈষণার প্রকাশ পায়। শয়নাসন হীন কিংবা প্রণীত- এই বিবেচনা পরিত্যক্ত হয় ; তজ্জন্য অনুরোধ কিংবা বিরোধ অপসৃত হয়ে থাকা যায় ; অতিরিক্ত প্রত্যাশার অন্তসাধন হয় এবং সর্বোপুরি অল্পেচ্ছুতা বৃদ্ধি হয়ে সুখে অবস্থান করা যায়।[১১৫]

ন সো রজ্জতি সেট্‌ঠম্হি, হীনলদ্ধ ন কুপ্পতি,
সব্রহ্মচারী নবকে হিতেন অনুকম্পতি।
যং লদ্ধং তেন সন্তুট্‌ঠো, যথাসন্থতিকো যতি,
নিবিবকপ্পো সুখং সেতি, তিণ সন্তরকেসুপি।[১১৬]

অর্থাৎ, যথাসন্থতিক যা লাভ করেন তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হন। তৃণশয্যায়ও তাঁর নির্বিকার শয়নসুখ লাভ হয়।

যা বিস্তৃত (সংস্কৃত) তা যথাসংস্তৃত বা বিছানো। 'এটাই তোমার প্রাপ্য' এরূপ সন্তোষভাব প্রথম দর্শনে যে শয়নাসনের প্রতি জাগ্রত হয় সে ভিক্ষুকে যথাসংস্তৃত বা যথাসন্থতিক ধুতাঙ্গধারী বলা হয়।

এ কারণে যথাসন্থতিক ধুতাঙ্গধারীকে দায়ক প্রদত্ত যখন যেরূপ শয়নাসন লাভ হয় তখন তেমন শয়নাসনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। আপন অভিরুচি মতো দায়ককে কোনো কিছু তৈরি নির্দেশ বা পরামর্শ দিতে পারেন না। এ কারণে যথাসন্থতিক ধুতাঙ্গ-শীল গ্রহণকারীকে বলতে হয় : 'আমি আজ থেকে শয়নাসন লোলুপতা ত্যাগ করছি, যথাসন্থতিক ধুতাঙ্গ গ্রহণ করছি।'

Dhaka University Institutional Repository

নৈশয্যিক ধুতাঙ্গ

প্রতিপালন অর্থ শয়নাসন পরিবর্জন। চার প্রকার ইর্যাপথের মধ্যে শয়ন ইর্যাপথ পরিহার করে অন্য তিন প্রকার ইর্যাপথ অবলম্বনে রাত্রি যাপন করা উচিত। রাতের তিন যামের এক যাম চংক্রমণের অতিবাহিত করা কর্তব্য। কেবল শয়ন করা উচিত নয়। কারণ তাতে ব্রত ভঙ্গ হয়ে যায়। নেসজ্জিকাঙ্গ ধুতাঙ্গব্রত সম্পাদন করলে অলসতা থাকেনা, সকল কর্মস্থানে নিবিষ্ট থাকার শক্তি যোগায়, প্রসন্ন চিত্তে ইর্যাপথসমূহ অনুসৃত হয় ; বীর্য উৎপত্তির সহায়ক হয় এবং সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করে সুখবিহারী হয়ে থাকা যায়।[১১৭]

শয্যাগ্রহণ পরিহারপূর্বক দাঁড়ান, গমন ও উপবেশন এ তিন ইর্যাপথে (অবস্থান) দিবারাত্র অতিবাহিতকারীকে নৈশজ্জিক বলে। 'পৃষ্ঠ স্পর্শ করে শয়ন করবো না' এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে শীলপ্রতিপদা পূরণের ব্রতকে নৈশজ্জিক ধুতাঙ্গ বলে।

এ ধুতাঙ্গ অনুশীলনকারী শয্যাসুখ, স্পর্শসুখ (কোলবালিশ দ্বারা), মিদ্ধসুদ্ধ সুখ (তন্দ্রাচ্ছন্নতা দ্বারা), এ সকল ইন্দ্রিয় কলুষতা-সংযুক্ত ভোগাকাঙ্ক্ষার মূল উচ্ছেদ করেন, যোগীর সকল প্রকার কর্মস্থান ভাবনায় আনুকূল্যতা লাভ হয়, প্রতিটি ঈর্যাপথে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয় এবং চিত্ত অধিসমাধি লাভে উপযুক্ত হয়, উদ্যম-উৎসাহাদির শ্রীবৃদ্ধিতে বীর্যপরাক্রমতা লাভ হয়, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক প্রচেষ্টা (ব্যায়াম) এর উৎকর্ষতা সাধিত হয়। নৈশজ্জিক ধুতাঙ্গের এ সকল গুণাবলির জন্যেই উক্ত হয়েছে :

আভুজিত্বান পল্লঙ্কং পাণিধায উজুং তনুং,
নিসীদন্তো বিকম্পেতি, মারস্স হদয়ং যতি।[১১৮]

অর্থাৎ, শয্যাসুখ ও তন্দ্রাসুখ পরিত্যাগ করে আরদ্ধ বীর্য নৈশজ্জিক ভিক্ষু তপোবন শোভিত করে নিরামিষ প্রীতিসুখ লাভ করেন। তাই পণ্ডিত ব্যক্তি এই নৈশজ্জিক ব্রত পালন করবেন।

ধুতঙ্গ সম্পর্কিত পর্যালোচনা

ধুতাঙ্গকে আমরা শীল হিসেবে মূল্যায়ন না করলেও পূর্বোক্ত আলোচিত ধুতাঙ্গ প্রাচীন সাহিত্যে ও পালি সাহিত্যের বিভিন্নাংশে এর উপস্থিতি দেখতে পাই। এটি শীল বিশুদ্ধি সহায়ক বা উপায়

হিসেবে কাজ করে। সময়ের পরিক্রমায় যেভাবে ধুতাঙ্গের আলোচনা উঠে এসেছে তা নিম্নরূপে তুলে ধরে এ আলোচনাকে আরও বেশি সমৃদ্ধ ও জ্ঞাননির্ভর করা যায়। সুত্তপিটকান্তর্গত নিকায় গ্রন্থসমূহে ধুতাঙ্গের উল্লেখ রয়েছে।[১১৯] কতিপয় প্রচলিত রীতি ও ব্রত ধুতাঙ্গের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বিভিন্ন সুত্তন্তে ধুতাঙ্গের পৃথক পৃথক উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নিমোক্ত শব্দগুলো সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। যেমন : সপদানচারী, পিণ্ডপাতিক, পংসুকুলিক, অব্ভোকাসিক, অরঞ্ঞিঞক এবং পন্থসসানিক। বুদ্ধের অশীতি মহাশ্রাবকের মধ্যে মহাকাশ্যপ থেরো ধুতাঙ্গবাদীগণের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয় ছিলেন।[১২০] নিদ্দেস গ্রন্থে আট প্রকার ধুতাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়।[১২১] সর্বপ্রথম মিলিন্দপঞ্হো গ্রন্থেই তের প্রকার ধুতাঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে।[১২২] এছাড়া আচার্য বুদ্ধঘোষ বিরচিত বিসুদ্ধিমগ্গো গ্রন্থে এবং অর্হৎ উপতিস্স দ্বারা লিখিত বিমুত্তিমগ্গো গ্রন্থে ধুতাঙ্গ সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ও বিস্তৃত আলোচনা বিধৃত আছে।

শীল বিশুদ্ধি

কোনো 'ধ্যান-ধর্ম' গ্রহণ করেছেন ও সপ্তবিধ পাপে অপ্রমত্ত থাকেন, যদি তিনি অন্য ভিক্ষুকে পরাজিত অপরাধ[১২৩] শীলে অধিষ্ঠিত থাকেন। যদি তিনি পরিপূর্ণ শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তিনি অতি উত্তম শীল লাভ করেন। যদি তিনি পরিপূর্ণ শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তিনি অতি উত্তম 'সত্য' লাভ করেন। এটি প্রাচীনদের উপদেশ।

যদি কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে সংঘাদিসেস অপরাধে লিপ্ত দর্শন করেন, তিনি সম্পূর্ণরূপে দোষ স্বীকার করেন। যদি তিনি অন্য ভিক্ষুকে অন্য কোনো অপরাধ করতে দর্শন করেন, তখন তিনি কোনো একজন ভিক্ষু সমীপে সেই শীল ব্যতিক্রম অপরাধ স্বীকার করেন।

যদি কোনো ভিক্ষু অন্য ভিক্ষুকে মিথ্যা-জীবিকা আহরণ করতে দর্শন করেন, তিনি সেই শীল ব্যতিক্রমের উপযুক্ত স্বীকারোক্তি করেন। দোষ স্বীকার করার পর তিনি সঙ্কল্প করেন। আমি আবার এ কাজ করব না। এই প্রকারে দর্শন করে তিনি সঙ্কল্প করেন।

যখন ভিক্ষু 'ইন্দ্রিয়-সংবর-শীল' বা 'প্রত্যয়-সন্নিশ্রিত-শীল' লঙ্ঘন করেন, তিনি বলেন, আমি পুনঃ এটি করব না। যদি তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করেন, তিনি ভবিষ্যতে অতি উত্তম সংযম লাভ করেন।

যখন ভিক্ষু ‘শীল-বিশুদ্ধি’ অনুশীলন করেন, তিনি কায়িক ও বাচনিক করণীয় কর্ম সম্পাদন করেন। তিনি তাঁর কৃতকর্ম পর্যালোচনা করেন। তিনি পূর্ণ কর্ম সম্পাদন করেন ও পাপ কর্ম পরিহার করেন। এই প্রকারে ভাবনা করতে করতে তিনি অহোরাত্র শীল-বিশুদ্ধিতে অবস্থান করেন। এই প্রকার কর্মের দ্বারা তিনি শীল বিশুদ্ধি সম্পাদন করেন।[১২৪]

উপসংহার

উপরে বর্ণিত তথ্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পালি সাহিত্যে বিভিন্নাংশে যেভাবে শীলের প্রকারভেদের বর্ণনা উঠে এসেছে তা থেকে শীলের স্বরূপ খুব সহজে উন্মোচিত হয়েছে। শীল সম্পর্কিত ধারণা, শীল পালনকারী এবং শীল সম্পর্কে গবেষক ও পাঠক সকলেরই একটি স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করতে সহায়ক হবে এটাই স্বাভাবিক। “শীলের যেসকল প্রকারভেদ আলোচিত হয়েছে তা সবগুলো ‘বিসুদ্ধিমগ্গো’ বর্তমানরূপে বিদ্যমান ছিল না এ কথা বলা যেতে পারে। ‘বিমুক্তিমার্গ’ গ্রন্থে শীলের প্রকারভেদের মধ্যে দুই প্রকার শীলের পর্যায় রয়েছে দশটি, তিন প্রকার শীলের পর্যায় রয়েছে আটটি, চার প্রকার শীলের পর্যায় রয়েছে পাঁচটি।”[১২৫] শীলের পঞ্চম শ্রেণিবিন্যাসে প্রত্যেকটি অংশে পাঁচটি করে দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথা : প্রথম শ্রেণি হলো : পরিয়ন্ত পারিসুদ্ধি, অপরিয়ন্ত পারিসুদ্ধি, পরিপূণ্ন পারিসুদ্ধি, অপরামট্ঠ পারিসুদ্ধি এবং পটিপস্সদ্ধি পারিসুদ্ধি শীল। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো : পহান, বেরমণী, চেতনা, সংবর এবং অবিতক্কম শীল। এছাড়া পঞ্চশীল, উপোসথ বা অষ্টশীল, দশশীল, পটিজাগর উপোসথশীল, পটিহারিয় উপোসথ শীলগুলোর আলোচনা লক্ষণীয় নয়। এ আলোচনার পাশাপাশি ধুতাঙ্গের আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। ধুতাঙ্গের পর্যালোচনায় দেখিয়েছি যে, কিভাবে প্রাচীন সাহিত্যের বিভিন্নাংশে ও পালি সাহিত্যের নানাংশে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবিষয়ের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসসমৃদ্ধ জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ধুতাঙ্গের আলোচনা শীলের প্রকারভেদের জ্ঞানকে যে আরও বেশি সমৃদ্ধ করেছে তা বলার অবকাশ রাখে না।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৪; ই. হার্ডি সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : ১৮৯৬, পি.টি.এস.), পৃ. ১৪-১৫ (সো বত ভিক্খবে ভিক্খু আগরবো অপ্পটিস্সো অসভাগবুত্তিকাসব্রহ্মচারিসু আদি ব্রহ্মচারিকং ধম্মং অপরিপুরেত্বা আদি ব্রহ্মচারিকং ধম্মং পরিপুরেস্সতি'তি নেতং ঠানং বিজ্জতি।)

২. মূল রচনা-অর্হৎ উপতিষ্য স্থবির, মহিম চন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *বিমুক্তি মার্গ* (চট্টগ্রাম : প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫৩২, বাংলা ১৩৯৫, প্রকাশক, প্রিয়ানন্দ মহাথের, নব-পণ্ডিত বিহার, কাতালগঞ্জ), পৃ. ১৩

৩. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৩

৪. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৪; টি. ডব্লিউ. রিস ডেভিডস্ ও জে. ইস্টলিন কার্পেন্টার সম্পাদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৮৯০, পি.টি.এস.), পৃ. ৪

৫. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : ২০১৫, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৮৮৩

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৭. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৪; ভি. ট্রেন্কনার সম্পাদিত, *মজঝিম নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৯৪৮, পি.টি.এস.), পৃ. ১০২ (ইমেনা'হং সীলেন বা বতেন বা তপেন বা ব্রহ্মচরিয়েন বা দেবো বা ভবিস্সামি দেবো পঞ্ঞএতরো বা তি।)

৮. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; শ্রীমতি রিস্ ডেভিডস্ সম্পাদিত, *বিভঙ্গ* (লন্ডন : ১৯০৪, পি.টি.এস.), পৃ. ৩৭৪

Dhaka University Institutional Repository

৯. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৪, আরনোল্ড সি. টেইলর, সম্পাদিত, *পটিসম্ভিদামগ্গ*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৯০৫, পি.টি.এস.), পৃ. ৪৩-৪৪

১০.প্রাগুক্ত

১১.শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, পালি-বাংলা অভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : ২০০১, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ১৩৮৬

১২.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮৬-১৩৮৭।

১৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; হাঃ ও সিঃ সম্পাদিত, বিসুদ্ধিম*গ্গ*, ৪১ খণ্ড (লন্ডন : ১৯৫০, পি.টি.এস.), পৃ. ১১

১৪.মূল রচনা-অর্হৎ উপতিষ্য স্থবির, মহিম চন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *বিমুক্তি মার্গ* (চট্টগ্রাম : প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫৩২, বাংলা ১৩৯৫, প্রকাশক, প্রিয়ানন্দ মহাথের, নব-পণ্ডিত বিহার, কাতালগঞ্জ), পৃ. ১৯

১৫.রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৫

১৬. প্রাগুক্ত

১৭.প্রাগুক্ত

১৮. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৪; আরনোল্ড সি. টেয়লর সম্পাদিত, *পটিসম্ভিদামগ্গ*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৯০৫, পি.টি.এস.), পৃ. ৪৪

১৯.প্রাগুক্ত

২০. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; হাঃ ও সিঃ সম্পাদিত, *বিসুদ্ধিমগ্গ*, ৪১ খণ্ড (লন্ডন : ১৯৫০, পি.টি.এস.), পৃ. ১৩

২১.রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৬

২২. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

২৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; রবার্ট চালমার্স সম্পাদিত, *মজঝিম নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : ১৯৫১, পি.টি.এস.), পৃ. ২১ (ধম্মতা এসা আনন্দ, যদা বোধিসত্তো মাতুকুচ্চিং ওক্‌খন্তো হোতি, ন বোধিসত্তমাতু পুরিসেসু মানসং উপ্পজ্জতি কামগুণু পসংহিতং।)

২৪. মূল রচনা-অর্হৎ উপতিষ্য স্থবির, মহিম চন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *বিমুক্তি মার্গ* (চট্টগ্রাম : প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫৩২, বাংলা ১৩৯৫, প্রকাশক, প্রিয়ানন্দ মহাথের, নব-পণ্ডিত বিহার, কাতালগঞ্জ), পৃ. ২১

২৫. *নালন্দা*, ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (কলিকাতা : ১৯৮২), প্রবন্ধ, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী : বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গ, পৃ. ৩৮

২৬. মোহাম্মদ হারুণ-উর-রশিদ, *সহজ বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : ১৯৯৫, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৩৮৭

২৭. মূল রচনা-অর্হৎ উপতিষ্য স্থবির, মহিম চন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *বিমুক্তি মার্গ* (চট্টগ্রাম : প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫৩২, বাংলা ১৩৯৫, প্রকাশক, প্রিয়ানন্দ মহাথের, নব-পণ্ডিত বিহার, কাতালগঞ্জ), পৃ. ২২

২৮. বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ* (চট্টগ্রাম : ১৯৪০, নালন্দা নিবাস), পৃ. ২৮৫

২৯. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : ২০০০, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৬৮

৩০. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৭; শ্রীমতি রিস্ ডেভিডস্ সম্পাদিত, *বিভঙ্গ* (লন্ডন : ১৯৬৪), পৃ. ২৪৪ (পাতিমোক্‌খ সংবরবুতো বিহরতি আচার গোচর সম্পন্নো অনুত্তেসু বজ্জেসু ভয়দস্‌সাভি সমাদায় সিক্‌খতি সিক্‌খাপদেসু ইন্দ্রিয়েসু গুত্তদ্বারো ভোজনে মত্তঞ্ঞূ...ভাবনানুযোগমনুযুত্তং।)

৩১.উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; ভি ট্রেনকনর সম্পাদিত, *মজঝিম নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৯৪৮), পৃ. ৩৫৫ (কথঞ্চ মহানাম অরিয় সাবকো সীলসম্পন্নো হোতি : ইধ মহানাম অরিয় সাবকো

Dhaka University Institutional Repository

সীলবা হোতি; পাতিমোক্খ সংবর সংবুতো বিহরতি, আচার গোচর সম্পন্নো অনুমত্তেসু বজ্জেসু ভয়দস্সবী সমাদায় সিক্খতি সিক্খাপদেসু।)

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.৭০

৩৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮০

৩৪. গোপেন্দ্র কুমার চৌধুরী অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ* (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ.২৮

৩৫. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৮; ভি ট্রেনকনর সম্পাদিত, *মজঝিম নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৯৪৮), পৃ. ৩৫৫ (সো চক্খুনা রূপং দিস্বা ন নিমিত্তগ্গাহী হোতি নানুব্যঞ্জনগ্গাহী : অন্বাসবেয়্যুং তস্স সংবরায় পটিপজ্জতি, রক্খতি চক্খুন্দ্রিয়ং, চক্খুন্দ্রিয়ে সংবরং আপজ্জতি। সোতেন সদ্দং সুত্বা...পে...ঘানেন গন্ধং ঘায়িত্বা...জিবহায় রসং সায়িত্বা...কায়েন ফোটঠব্বং ফুসিত্বা... মনসা ধম্মং বিঞ্ঞায় ন নিমিতগ্গাহী হোতি নানুব্যঞ্জনগ্গাহী।)

৩৬. *নালন্দা*, ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (কলিকাতা : ১৯৮২), প্রবন্ধ, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী : বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গ, পৃ. ৩৯

৩৭. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৯; ঞানমোলি ভিক্খু, *দি পাথ অফ পিউরিফিকেশন* (কান্ডি : ১৯৬৪), পৃ. ২৪

৩৮. উদ্ধৃত, প্রগুক্ত; রবার্ট চালমার্স সম্পাদিত, *মজঝিম নিকায়*, ২য় খণ্ড (লন্ডন : ১৮০৮, পি. টি. এস.), পৃ. ৭৫

৩৯. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৯৯; টি. ডব্লিউ. রিস্ ডেভিডস্ সম্পাদতি, *দীর্ঘনিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৮৯০), পৃ. ৯-১২ (ব্রহ্মজাল সুত্তং : যথা বা পন একো ভোন্তো সমণ-ব্রাহ্মণা সদ্ধাদেয়্যানি ভোজনানি ভূঞ্জিত্বা তে এবরূপায় তিরচ্ছান বিজ্জায় মিচ্ছা জীবেন জীবিকং

Dhaka University Institutional Repository

কপ্লেতি সেয্যথিদং অঙ্গং, নিমিত্তং উপ্পাদং সুগীনং...মূলভোজ্জানং অনুপ্পাদত্তনং ও সধিনং পটিমোক্খা।)

৪০. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০; ভি ট্রেনকনর সম্পাদিত, *মজঝিম নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৯৪৮), পৃ. ১০ (কতমে চ ভিক্খবে অসবা পটিসেবনা পহাতব্বা : পটিসঙ্খা যোনিসো চীবরং পটিসেবামি, যাবদেব সীতস্ব পটিঘতায়, উণ্হস্স পটিঘতায়, ডংস-মকস,বাতাতাপ-সিবিংসপ সম্ফস্সনং পটিঘতায় যাবদেব হিরোকোপীনং পটিচ্চদনত্তং। পিণ্ডপাতং পটিসেবামি...সেনাসনং...পিলান পচ্চয়ং...ভেসজ্জ পরিক্খারং...)।

৪১.ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *থেরী গাথা* (কলিকাতা : ১৩৫৭ বাংলা সন, মহাবোধি বুক এজেন্সী), পৃ. ৪৪৫

৪২. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১০০; ভিক্খু জে. প্রজ্ঞাবংশ, (*দি*) *অভিধম্ম ফিলসফি* (সারনাথ : ১৯৪৩), পৃ. ২২৬

৪৩. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; এহেরা, এন. আর. এম. *বিমুক্তিমগ্গো* (কলম্বো : ১৯৬১), পৃ. ৩২

৪৪. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১০১; আরনোল্ড সি. টেইলর সম্পাদিত, *পটিসম্ভিদামগ্গো* ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৯০৫), পৃ. ৪২-৪৩

৪৫. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; ই. হার্ডি সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : ১৮৯৬), পৃ. ২৫২ (পঞ্চ ইমে ভিক্খবে আদীনবা দুস্সীলস্স সীল বিপত্তি।)

৪৬. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০২; ঞানমোলি ভিক্খু (*দি*) *পাথ অফ পিউরিফিকেশন* (কান্ডি : ১৯৭১), পৃ. ৪৯

৪৭. ‘সতপথ’ ব্রাহ্মণে (১.১.১০৭) ‘উপসথ’ বা ‘উপবসথ’ শব্দ নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা হয় ঃ ‘উপ’ শব্দের অর্থ ‘নিকট’ এবং ‘সথ’ বা ‘বসথ’ শব্দের অর্থ বাস করা। সুতরাং ‘উপসথ’ শব্দের পাশাপাশি নিকটে বসে ধর্ম শ্রবণ করা বুঝায়’। Mr. Tylor

Dhaka University Institutional Repository

has suggested that ‘fasting’ and ‘intercourse with gods’ were prevalent among all the primitive nations.Tylors Primative Culture, 1891, Vol.ii; ch.xviii. p. 410.

৪৮. মগধরাজ বিম্বিসার প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি বুদ্ধের সমসাময়িক এবং বুদ্ধের পাঁচ বৎসর কনিষ্ঠ ছিলেন। প্রাচনি রাজগৃহ নগরে ত৭ার রাজধানী ছিল। বুদ্ধ প্রথম গ্রহত্যাগ করে রাজগৃহে আসলে বিম্বিসার বুদ্ধকে তাঁর রাজ্য বাস করতে অনুরোধ করেন। বুদ্ধ তাতে সম্মত না হলে বিম্বিসার তাঁকে (বুদ্ধ) বুদ্ধত্বলাভের পর তাঁর রাজ্যে আসবার জন্য নিয়ন্ত্রণ করেন। কথিত আছে বুদ্ধ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার বুদ্ধের অন্যতম গৃহী শিষ্য ছিলেন এবং নব ধর্ম প্রচার তাঁর সর্ব শক্তি নিয়োগ করেছিলেন।

৪৯. অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭০-৭-৭-২৫, নিম্নলিখিতভাবে কর্তব্য নির্দেশ করা হয়েছে ঃ “পানং ন হানে ন চাদিন্ন মাদিযে, মুসা ন ভাসে, ন মজ্জপো সিয় ; অব্রহ্মচরিয়া বিরমেয্য মেথুনা, রত্তিং ন ভুঞ্জেয্য বিকালভোজনং, মালং ন ধারেয্য ন চ গন্দমাচরে মঞ্চে ছমায বসযেথ সন্থিতে, এতং হি অট্ঠঙ্গিকমগ্গ পোসথং”।

৫০. শান্তরক্ষিত মহাথের সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : ২০০১, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ৩৮৫

৫১.জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম্ম-রত্ন-চৈত্য* (তাইওয়ান : ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), পৃ.২৬৮

৫২. *পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ২০০

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩

৫৪. রত্ন মালা (তাইওয়ান : দি করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ২৩

৫৫. প্রাগুক্ত

৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩

Dhaka University Institutional Repository

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৫৮. ড. ধর্মকীর্তি ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্ন সম্ভার* (চট্টগ্রাম : ২০০৩), পৃ. ১০০

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯

৬০. রত্ন মালা (তাইওয়ান : দি করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন) , পৃ. ৮০

৬১.শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চাক্মা সপ্রনীত, *ত্রিরত্ন মুঞ্জুরী* (চট্টগ্রাম : ১৯৭২) পৃ.২৬৪

৬২. শীলরত্ন ভিক্ষু সম্পাদিত, পালি-বাংলা অভিধান (ঢাকা : ২০০২, বাংলা একাডেমি), পৃ. ২৭৪

৬৩. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১০৪; জিওন আবে, *সজ্ঝেপখুজোতনী সীল-ধুতঙ্গ* (পুনা : ১৯৮১), পৃ. ২৪

৬৪. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৪; হেনরী ওয়ারেন ক্লার্ক সম্পাদিত, *বিসুদ্ধিমগ্‌গ* (লন্ডন : ১৯৫০, হার্ভার্ট ওরিয়েন্টাল সিরিজ), পৃ. ৫০

৬৫. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; ভিক্‌খু জে. প্রজ্ঞাবংশ, *(দি) অভিধম্ম ফিলসফি* (সারনাথ : ১৯৪৩), পৃ. ২২৮

৬৬. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; রিস ডেভিডস ও উইলিয়ম স্টীড সম্পাদিত, *(দি) পালি-ইংলিশ ডিকশনারী* (লন্ডন : ১৯২৫, পি.টি.এস.), পৃ. ১৭৭

৬৭. হেনরী ওয়ারেন ক্লার্ক সম্পাদিত, *বিসুদ্ধিমগ্‌গ* (লন্ডন : ১৯৫০, হার্ভার্ট ওরিয়েন্টাল সিরিজ), বিসুদ্ধিমগ্‌গ, পৃ. ৫৯

৬৮. শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চাক্‌মা প্রনীত, ত্রিরত্ন মঞ্জুরী (চট্টগ্রাম : ১৯৭৫), পৃ. ২৬৯-২৭০

৬৯. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১০৫

৭০. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১০৬; রিচার্ড মরিস সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ১ম খণ্ড, (লন্ডন :

Dhaka University Institutional Repository

১৮৮৫, পি.টি.এস.), পৃ. ৩৮ (অদ্ধং ইদং ভিক্খবে লাভানং যদিদং অরঞ্ঞকত্তং পিণ্ডপাতিকং পংসুকুলিকত্তং, তেচীবরকত্তং ধম্ম কথিকত্তং বিনয়ধরবত্তং...)।

৭১.উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; ই. হার্ডি সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : ১৮৯৬) পৃ. ২১৯ (অপ্পিচ্ছতং যেব নিস্সায় সন্তুট্ঠিং যেন নিস্সায় সল্লেখং যেব নিস্সায় পবিবেকং যেব নিস্সায় ইদং অট্ঠিতং যেন নিস্সায় অরঞ্ঞ কো হোতি।)

৭২. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; এহেরা, এন. আর. এম. *বিমুক্তিমগ্গো* (কলম্বো, ১৯৬১), পৃ. ২৭

৭৩. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ২৬

৭৪. অত্থতো লক্খণাদীহি সমাদান বিধানতো,

পভেদতো ভেদতো চ তস্সা নিসংসতো।

কুসলত্তিকতো চেব ধুতাদীনং বিভাগতো,

সমাস ব্যাসতো চাপি বিহ্ঞাতব্বো বিনিচ্ছযো।

বিশুদ্ধিমার্গ (কলিকাতা : ১৯২৩), অনু: পৃ. ৭৩

৭৫. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ২৬-২৭

৭৬. শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত, সাধক প্রভাত চন্দ্র কর্তৃক অনুবাদিত, *বিশুদ্ধি মার্গ ও বৌদ্ধসাধনা* (তাইওয়ান : ১৯৩৬), পৃ. ৭৮

৭৭. প্রাগুক্ত

৭৮. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ২৭

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

Dhaka University Institutional Repository

৮১. শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত, সাধক প্রভাত চন্দ্র কর্তৃক অনুবাদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধসাধনা* (তাইওয়ান : ১৯৩৬), পৃ. ৮০

৮২. প্রাগুক্ত

৮৩. প্রাগুক্ত

৮৪. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১০৭; হেনরী ওয়ারেন ক্লার্ক সম্পাদিত, *বিসুদ্ধিমগ্‌গ* (লন্ডন : ১৯৫০, হার্ভাট ওরিয়েন্টাল সিরিজ), পৃ. ৫৩ (সজ্ঘভত্তং, উদ্দেসভত্তং, নিমন্তন ভত্তং, সলাক ভত্তং, পক্খিক ভত্তং, উপোসথ ভত্তং, পটিপাদিকং, আগন্তুক ভত্তং, মাসিক ভত্তং, গিলান ভত্তং, গিলানপট্ঠিক ভত্তং, বিহার ভত্তং, ধূরভত্তং, বার ভত্তং।)

৮৫. গোপেন্দ্র কুমার চৌধুরী অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ* (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ৮১

৮৬. ভিক্‌খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ৩২

৮৭. শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত, সাধক প্রভাত চন্দ্র কর্তৃক অনুবাদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধসাধনা* (তাইওয়ান : ১৯৩৬), পৃ. ৮১

৮৮. প্রাগুক্ত

৮৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

৯০. প্রাগুক্ত

৯১.প্রাগুক্ত

৯২. ভিক্‌খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ৩৪

৯৩. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *বিশুদ্ধি মার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব* (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ.১০৭-১০৮

Dhaka University Institutional Repository

৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৯৫. শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত, সাধক প্রভাত চন্দ্র কর্তৃক অনুবাদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধসাধনা* (তাইওয়ান : ১৯৩৬), পৃ. ৮৩

৯৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৪

৯৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৯৮. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ৩৮

৯৯. শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত, সাধক প্রভাত চন্দ্র কর্তৃক অনুবাদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধসাধনা* (তাইওয়ান : ১৯৩৬), পৃ. ৮৫

১০০. পাত্রপিণ্ডিকাঙ্গ।

১০১. শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত, সাধক প্রভাত চন্দ্র কর্তৃক অনুবাদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধসাধনা* (তাইওয়ান : ১৯৩৬), পৃ. ৮৬

১০২. পরিয়েসনায় খেদং ন যাতি, ন করোতি সন্নিধিং ধীরো
ওদরিকত্তং পজহতি খুলপচ্ছা ভত্তিকো যোগী।
বিশুদ্ধিমার্গ, অনু: (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ৮৭

১০৩. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ৪০-৪১

১০৪. পবিবিত্তো অসংসট্ঠো পন্তসেনাসনে রতো,
আরাধয়ন্তো নাথস্‌স বনবাসেন মানসং,
একা অরঞ্ঞেঞঞ নিবসং যং সুখং লভতে যতি,
ওসং তস্‌স ন বিন্দন্তি অপি দেবাস-ইন্দকা।

Dhaka University Institutional Repository

বিশুদ্ধিমার্গ, অনু:, কলিকাতা, ১৯২৩, পৃ. ৮৯

১০৫. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ৪৩

১০৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

১০৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬

১০৮. আবাসমচ্ছেরহরে, দেবতা পরিপালিত,

পবিবিত্তো বসন্তোহি রুক্খমূলম্হি সুব্বতো,

অভিরত্তানি নীলানি পণ্ডূনি পতিতানি চ

পস্সন্তো তরুপণ্ণানি নিচ্ছসঞ্ঞঞং পনুদতি।

বিশুদ্ধিমার্গ, অনু: (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ৯১

১০৯. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ৪৬

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

১১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮

১১২. অনাগরিয়ভাবস্স অনুরূপে অদুল্লভে,

তারামনিবিতানং হি চন্দদীপপ্পভাসিতে,

অব্ভোকাসে বসং ভিক্খু মিগভূতেন চেতসা,

থীনমিদ্ধং বিনোদেত্বা ভাবনারামতং সিতো।

বিশুদ্ধিমার্গ, অনু: (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ৯২

১১৩. সংবেগমেতি বিপুলং ন মদং উপেতি,

সম্মা অখো ঘটতি নিব্বুতিং এসমানো।

সোসানিকঙ্গমিতি নিকগুণাবহত্তা,

নিব্বান নিন্নহদয়েন নিসেবিতব্বন্তি।

বিশুদ্ধিমার্গ, অনু: (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ৯৪

১১৪. প্রাগুক্ত, ৫২

১১৫. *বিশুদ্ধিমার্গ*, অনু: (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ৯৫

১১৬. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ৫৩

১১৭. সেয়্য সুখং মিদ্ধসুখং হিত্বা আরদ্ধ বিরিয়ো,

নিসজ্জাবিরতো ভিক্খু সোভয়ন্তা তপোবনং।

নিরামিসং পীতিসুখং যস্মা সমধিগচ্ছতি,

তস্মা সমনুয়ুঞ্জেয়্য ধীরো নেসজ্জিকং বত্তন্তি।

বিশুদ্ধিমার্গ, অনু: (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ৯৬

১১৮. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : ১৯৯৮, কল্পতরু), পৃ. ৫৪-৫৫

১১৯. উদ্ধৃত, রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, বিশুদ্ধিমার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১০৫; জিওন আবে, *সঙ্খেপপখজোতনী-সীল-ধুতঙ্গ* (পুনা : ১৯৮১), ভূমিকা, পৃ. ২৪

১২০. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; হা. ও সি. সম্পাদিত, *বিসুদ্ধিমগ্গো* (লন্ডন : ১৯৫০, পি.টি.এস.), পৃ. ৫৫

১২১. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত; ই. হার্ডি সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : ১৮৯৬, পি.টি.এস.), পৃ. ২১৯-২০ (পপঞ্চ ইমে ভিক্খবে পংসুকুলিকা, রুক্খমূলিকা, সোসানিকা, অব্ভোকাসিকা, নেসজ্জিকা, যথাসন্থতিকা, একাসনিকা, খুলপচ্চভত্তিকা।)

১২২. বিধুশেখর ভট্টাচার্য, *মিলিন্দ পঞ্হো*, প্রথম ভাগ, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : বাংলা ১৩১৫, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), পৃ. ৩৬

১২৩. পারাজিকা।

Dhaka University Institutional Repository

১২৪. মূল রচনা-অর্হৎ উপতিষ্য স্থবির, মহিম চন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *বিমুক্তি মার্গ* (চট্টগ্রাম : প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫৩২, বাংলা ১৩৯৫, প্রকাশক, প্রিয়ানন্দ মহাথের, নব-পণ্ডিত বিহার, কাতালগঞ্জ), পৃ. ৩২-৩৩

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-২৭

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্ব

ভূমিকা

খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতকে মহামানব বুদ্ধ আবির্ভূত হন। তিনি জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও সন্ন্যাস এই চারটি ঘটনা বা দৃশ্য বা নিমিত্ত দর্শন করে তা থেকে চিরমুক্তির জন্য সন্ন্যাস জীবনকে অবলম্বন করে গৃহ ত্যাগ করেন। সাধনার উপযুক্ত স্থান অন্বেষণ করে উরুবিল্ব গ্রামে উপস্থিত হলে সুজাতার প্রদত্ত পায়েস অন্ন গ্রহণ করে বৈশাখী পূর্ণিমার তিথিতে বুদ্ধত্ব বা সর্বজ্ঞতা লাভ করেন। বুদ্ধত্ব লাভ থেকে সুদীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধর্ম প্রচার কার্যে নিয়োজিত হন। ধর্ম প্রচারের শেষ দেড় বছর অর্থাৎ, মহাপরিনির্বাণের দেড় বছর ধর্ম প্রচারে রাজগৃহ থেকে বৈশালী হয়ে কুশিনগরে মল্লদের যমক শাল বৃক্ষতল উপস্থিত হন। ধর্মপ্রচার কালে পাটলি গ্রামে উপাসকগণকে সম্বোধন করে শীল পালন ও ভঙ্গের সুফল-কুফল বর্ণনা করেন। মহাকারুনিক বুদ্ধ তাঁর ধর্মদেশনায় নিয়মানুবর্তিতা এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সকল মানুষের জন্য শীলপালন করা একান্ত কর্তব্য। আর বুদ্ধের দেশিত দশটি শীলের মধ্যে অন্যতম হলো পঞ্চশীল। পঞ্চশীল বৌদ্ধ মাত্রেরই অবশ্য প্রতিপাল্য। এটি ব্যতীত কেউ প্রকৃত বৌদ্ধ নামে অভিহিত হতে পারে না। বৌদ্ধধর্মের নীতিমালার প্রথমে পঞ্চশীল পালন করতে হয়। গৃহীদের পঞ্চশীল পালন করা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয় অধ্যায়ে শীলের শ্রেণিবিন্যাস বিষয়ক আলোচনাপূর্বক জানা যায় যে, সংখ্যাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পঞ্চশীল পালনকারীর সংখ্যা অনেক বেশি। এছাড়া জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমাজজীবনে, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক জীবনে পঞ্চশীলের ধর্মীয় গুরুত্বের পাশাপাশি সামাজিক গুরুত্ব অনেক বেশি বলেই গণ্য করা হয়। সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও অশান্তি উপদ্রবের মূল কারণ পঞ্চবিধ পাপ কর্ম। পূর্বোক্ত বিষয়টি অনুধাবন করে তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চশীলের সামাজিক অবস্থা, পঞ্চশীলের সুফল, গৃহী বা গৃহী বিনয় সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ, গৃহী উপাসক, গৃহী উপাসিকা, গৃহীদের নিত্যকর্ম, উপোসথ পালন করা, গৃহীদের ইহজীবনের শিক্ষণীয় উপদেশ, গৃহীর পরকালের সুখ-সমৃদ্ধি বিষয়ক শিক্ষা, মানবতা লাভে পঞ্চশীলের শিক্ষা, পঞ্চশীলের নৈতিক মূল্যবোধ, পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্ব বিষয়ক তথ্য নির্ভর আলোচনা তুলে ধরা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চশীল অর্থ

পঞ্চশীল শব্দটি 'পঞ্চ' ও 'শীল' শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে 'পঞ্চ' অর্থ পাঁচ সংখ্যা বা সংখ্যক, পাঁচের সমষ্টি আর শীল শব্দের অর্থ চরিত্র, স্বভাব বা আচরণ। পঞ্চবিধ সদাচার পদ্ধতি, পঞ্চ নৈতিক শিক্ষা বা উপদেশ, পাঁচ প্রকার নৈতিক আচার-আচরণ।[১]

পঞ্চশীল

গৃহীদের জন্য এবং যারা বুদ্ধের শরণে আগমন করে তাদের জন্য নিত্য পালনীয় শীলই পঞ্চশীল। পঞ্চশীল এমনভাবে সম্পৃক্ত যে একটি পালন করলে অন্যগুলো পালনের ইচ্ছা হয়। একটি ভঙ্গ করলেও অন্য চারটি গুণ অটুটু থাকে। নৈতিক চরিত্র গঠন ছাড়াও পঞ্চশীল পালন ভবিষ্যৎ কুশলের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস।[২] পঞ্চশীল হলো বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তির মূলমন্ত্র। নিজের দোষ-ত্রুটি ত্যাগ করে বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য পঞ্চশীল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনুষ্যত্বের উৎকর্শ সাধনের জন্য সদাচরণ অনুশীলন প্রয়োজন। এ সদাচরণের ফলেই চরিত্র সুন্দর, পুত পবিত্র হয় ; চরিত্রগঠনের সেই নিয়মগুলোকে বুদ্ধ পঞ্চনীতি নাম দিয়েছেন। মানবচরিত্রের উৎকর্ষসাধনে বুদ্ধের সময়ে একটা স্থায়ী, সুখময়, সমৃদ্ধিশালী, শান্তিপ্রিয়, আদর্শিক সমাজ বা আদর্শিক জীবন গঠনে তথা বিশ্বমানবতার মহাকল্যাণের মহতী প্রচেষ্টায় বুদ্ধ পঞ্চনীতির প্রচার করে বলেছিলেন।

"প্রাণিহত্যা করবে না হবেনা কারণ,
তাতে সম্মতি পরে দিবেনা কখন।
প্রাণি হননের কভু না হবে সহায়,
অপরে আদেশ আর নাহি দিবে তায়।
আত্মবৎ সর্বজীবে হৃদয়ে ভাবিবে,
প্রথম শীলের শিক্ষা এটাই জানবে।

পর-দ্রব্য হরবে না হবেনা কারণ,
তাতে সম্মতি পরে দিবেনা কখন।
হেন আচরণে বভু না হবে সহায়,

অপরে আদেশ আর নাহি দিবে তায়।
পর-দ্রব্য লোষ্ট্রসম হৃদয়ে ভাববে,
দ্বিতীয় শীলের শিক্ষা এটাই জানবে।

নিজ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সম্মতি গ্রহণে,
যথোচিত সময়েতে সহবাস বিনে।
করবেনা মিথ্যা কামচর্য্যা কদাচন,
দিবেনা সম্মতি পরে, হবেনা কারণ।
হেন কুকর্মের কভু হবেনা সহায়,
অপরে আদেশ আর নাহি দিবে তায়।
পরস্ত্রীকে মাতৃসম করবেন জ্ঞান,
নিজ নারী বিনে সব মায়ের সমান।
বিবাহিত হয় নাই যেই সব মেয়ে,
তাদেরকে ভগিনী মত ভাবিবে হৃদয়ে।
বেশ্যা, পরনারী প্রতি নাহি দিবে মন,
স্বীয় রমণীতে তুষ্ট র'বে অনুক্ষণ।
অপর পুরুষে আর রমণী নিচয়,
পিতা সহোদর সম জানবে নিশ্চয়।
এই সব হৃদে সদা অঙ্কিত রাখবে,
তৃতীয় শীলের শিক্ষা এটাই জানবে।

মিথ্যা বৃথা কটু ভেদ বাক্য চতুষ্টয়,
বলবেনা যা'তে সদা কুফল ফলয়।
এ'সবার ব্যবহারে অপরে কখন,
আদেশ সম্মতি নাহি করবে অর্পণ।

Dhaka University Institutional Repository

হবেনা সহায় আর কারণ তার,
যতনে করবে সদা মিথ্যা পরিহার।
নিরন্তর স্বীয় জিহ্বা শাসনে রাখবে,
চতুর্থ শীলের শিক্ষা এটাই জানবে।

কিবা সুরা কিবা গাঁজা আহিফেন ভাঙ্,
নেশা মাত্র করবেনা সেবন কি পান।
আদেশ সম্মতি পরে দিবেনা তায়,
হ'বেনা তার আর কারণ সহায়।
আন্তরিক ঘৃণা তা'হে সতত রাখবে,
পঞ্চম শীলের শিক্ষা এটাই জানবে।"[৩]

পঞ্চশীল সম্পর্কে পণ্ডিতদের অভিমত

পঞ্চশীল হলো সমগ্র মানবজাতির নৈতিকজীবন গঠনে অত্যন্ত উপাদেয় নীতি। পাঁচটি নীতির উৎকর্ষ সাধন করতে পারলে যে কোনো মানুষ সচ্চরিত্রের অধিকারী হয় এবং সুন্দর জীবন গঠনে সক্ষম হয়। এটি হলো আদর্শ জীবনশৈলী, সর্বজনীন কল্যাণপ্রদ আচার সংহিতা।[৪]

পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতি মানব জীবনের আদর্শ এবং মনুষ্যত্ব বিকাশের মূলমন্ত্র। তা থেকে স্খলিত হলেই আর মনুষ্যত্ব থাকে না। সে হয় মনুষ্যনীতি বিবর্জিত চরিত্রহীন মানুষ।[৫]

আমরা যদি পঞ্চশীলের সবগুলো শীলপালন করতে পারি তবেই আমরা মানুষ। এগুলোর পালন করার মধ্যে দিয়ে জীবন যাপন করা উচিত। কেননা, এগুলো পালনে মানবাচরণ উন্নত হয় এবং ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়। সমাজে শান্তি ও সুখের জন্য এগুলো পালন করা অপরিহার্য।[৬]

সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও অশান্তি উপদ্রবের মূল কারণ হলো যথাযথভাবে পঞ্চশীল পালন না করা। এই নীতিসমূহ হতে বিরত না হলে মানবতার বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। এই কারণে

মানবতার অগ্রগতির জন্য কার্যকরী পন্থারূপে বুদ্ধ যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন পঞ্চশীল প্রত্যেকেরই অবশ্য পালনীয় প্রাথমিক কর্তব্য।[৭]

These are the most meaningful activities one can embark upon in life-something truly gratifying and laudable. The precepts from the basis for everything good. Their essential character is one of non violation. For it is by not violating others that one can perfect the purity of the speech and mind.[৮]

Buddhism is the most profound and wholesome education directed by the Buddha towards all people. Five precepts are the curriculum of Buddhist teaching, which are embraced in moral code of Buddhism. By observing precepts, not only do cultivate your moral strength, but you also perform the highest service to your fellow being.[৯]

These five silas are the basic principals of Buddhism know to most people. It is the customary for them to be deliveried during almost every religiousceremony and those present at the ceremonies generally make a formal declaration of their intention to comply with them.[১০]

পণ্ডিতদের মতের সমালোচনা ও নিজেস্ব মতামত

পঞ্চশীল সম্পর্কে বিজ্ঞ পণ্ডিতমহল যথার্থ ও ইতিবাচক এবং গ্রহণযোগ্য মতামত প্রদান করেছেন। তাদের প্রতিটি মতবাদ ইতিবাচক ও গ্রহণযোগ্য বলে নেতিবাচক সমালোচনার সুযোগ নেই। অন্যান্য বিষয়ে দেখেছি দ্বিমত প্রকাশের ও যুক্তিনির্ভর মতামত বা মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার সুয়োগ তৈরি হয়ে থাকলেও এক্ষেত্রে তেমন সম্ভনা নেই। অতএব বিজ্ঞ পণ্ডিতদের মতবাদকে ইতিবাচক ধরে নিজের অভিমতকে যুক্ত করে দিতে চাই। তাই বলা যায় যে, পরিশুদ্ধ ও পবিত্র জীবন-যাপন করার জন্য অন্যতম নিয়ামক হলো পঞ্চশীল। এটির

মেনে চলার মধ্যে দিয়ে মানুষের মনে যেমন পবিত্রতা আসে ঠিক একইভাবে মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান নৈতিক শক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করতে সক্ষম। পঞ্চশীল মানুষের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না। সত্যিকার অর্থে পঞ্চশীল পালনের মধ্যে দিয়েই মানুষ ও মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধিত হয়। সমাজে সুখ-শান্তি ও একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনায় পঞ্চশীল যথার্থ গুরুদায়িত্ব পালন বা পথ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করতে পারে। পঞ্চনীতির সফল পালন ও বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে মানবতার বিকাশ সাধিত হতে পারে। কারণ কোনোভাবেই আমরা মানবতাকে অগ্রাহ্য বা লঙ্ঘন করতে পারি না। সুতরাং সুখ-শান্তি, পবিত্রতা, পরিশুদ্ধ জীবন-যাপন, নৈতিক চরিত্র গঠন, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা এবং সফলভাবে মানবতার বিকাশে পঞ্চশীল বা পঞ্চনীতি বা পঞ্চকর্ম মেনে চলার একটি সার্বজনীন আবেদন আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসে আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

পঞ্চশীলের পর্যালোচনা

পঞ্চনীতি সম্পর্কে নিম্নে একটি পর্যালোচনা প্রদান করা হলো :

প্রথমনীতি : প্রাণিহত্যা হতে বিরতি

বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চশীলের একটি উপদেশ ‘হত্যা করা থেকে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ’। একজন মানুষের সামাজিক দায়িত্ব হলো অন্যের জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কাউকে হত্যা করা বা হত্যার উদ্দেশ্যে আক্রমণ করা বৌদ্ধ ধর্মে সমর্থন করে না। বুদ্ধ প্রাণিহত্যার পাঁচটি[১১] অঙ্গ বলে উল্লেখ করেছেন। ১. প্রাণি ২. প্রাণি বলে ধারণা ৩. হত্যা করার সংকল্প বা ইচ্ছা ৪. হত্যার নিমিত্তে উপক্রম বা প্রচেষ্টা এবং ৫. স্বহস্তে কিংবা আদেশপ্রাপ্ত হয়ে হত্যা করা অর্থাৎ মৃত্যু। এই পাঁচটি অঙ্গ সম্পাদিত হলেই প্রাণি হত্যা হয়। প্রাণিহত্যা বলতে ইচ্ছাপূর্বক সুস্থ মস্তিষ্কে যে কোনো প্রাণির প্রাণ সংহারকে বোঝায়। প্রাণিহত্যা না করা, অপরের দ্বারা হত্যা না করা, অপর কর্তৃক হননের অনুমোদন না করা, সমস্ত প্রাণির প্রতি দণ্ড পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়[১২] মানুষ যদি বেঁচে থাকার

অধিকার লাভ করে তবে অন্যান্য প্রাণিরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। জীবন সকলের কাছে অতি প্রিয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে যথার্থই বলেছিলেন ; আমার বোধহয় সকল ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম জীবে দয়া। প্রেম হচ্ছে সমস্ত ধর্মের মূলভিত্তি যার চিত্ত মৈত্রীপূর্ণ, করুণায় অভিসিক্ত, বিদ্বেষ তাকে আকৃষ্ট করে না ; তিনি প্রাণিহত্যা কিংবা প্রাণিহত্যায় উৎসাহী বা উদ্যোগী হয় না।[১৩] এরূপ বিশ্ব প্রেম বা মহামৈত্রীর স্বরূপ ব্যক্ত করতে গিয়ে বুদ্ধ 'মৈত্রী' সূত্রে বলেছেন, দৃষ্ট-অদৃষ্ট, নিকটে-দূরে, ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রাণিকে সমদৃষ্টিতে ভালবাস। মা যেমন তার একমাত্র পুত্রকে আপন জীবন দিয়ে রক্ষা করে থাকেন, তেমনি সকল প্রাণির প্রতি সেরূপ অপ্রমেয় মৈত্রীভাব পোষণ করবে[১৪] বুদ্ধের এহেন সার্বজনীন বাণী মানবতার রক্ষাকবচ যা সর্বপ্রকার পাশবিক ইন্দ্রিয় অবদমিত করে আর্দশিক শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনে উদ্বুদ্ধ করে।

দ্বিতীয়নীতি : অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরতি

গোপনে অথবা প্রকাশ্যে কারো সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এর ফলে মানুষের জীবন ও সম্পদ নিদারুণ নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে। চৌর্যচিত্তে অপরের স্থাবর-অস্থাবর যে কোনো বস্তু এমনকি একটি সুতার নাল পর্যন্ত স্বত্বাধিকারীকে না বলে গ্রহণ করিবে না। এজন্য অপরকে উৎসাহিত করা যাবে না। যে ব্যক্তি গ্রামে কিংবা অরণ্যে অপরের অধিকারভুক্ত ধন-সম্পত্তি চুরি করে আনয়ন পূর্বক তা নিজে ভোগ করে, তাকেও চোর বলে জানবে।[১৫] চৌর্যের দ্বারা যে অপরের অদত্ত দ্রব্য আত্মসাৎ করে সেই জাতিচ্যুত।[১৬] সৎভাবে জীবিকা অর্জন প্রশংসার দাবীদার, মানুষ লোভের বশবর্তী হয়ে চুরি করে। অনেকেই স্বভাবগত কারণে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে। অভাব এবং স্বভাব এ দু'য়ের যে কোনো কারণেই চুরি করুক না চুরিকে চুরিই বলে। এ চুরি আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক[১৭] কর্মের পরিপন্থী। আর চুরি করার ফলে ব্যক্তি মাত্রই অপরাধের ভয়ে সর্বদা ভীত এবং সন্ত্রস্থ থাকে। এমনকি প্রচলিত দেশীয় আইনানুযায়ী তার শাস্তিও হয়। নীতি বিবর্জিত কাজ সকলের নিকট শুধু নিন্দনীয় নয় ; শাস্তিযোগ্য অপরাধও বটে। যে ব্যক্তি ক্রোধপরায়ণ হিংসুক ও পাপলিপ্ত সে পরের ধন চুরি করে।[১৮] অপরের দ্রব্যমাত্রই পরিবর্জনীয়। একে-অপরকে চৌর্যে প্রবৃত্ত করা যেমন উচিত নয় তেমনি চৌর্যের অনুমোদনও যথার্থ নয়।

সর্বোপরি সর্বপ্রকার অদত্তবস্তু ব্যক্তিমাত্রই পরিবর্জনীয়।[১৯] এই শীল লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে অতীব দরিদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং ধন ধান্য অন্ন বস্ত্র ইত্যাদি ভোগ্য বস্তু হতে বঞ্চিত হয়। দিন শেষে পিণ্ডাচরণ করেও উদরান্নের সংস্থান করতে পারে না। তারা সর্বদা গৃহহারা, বাস্তুহারা, রোগে, শোকে, অভাব অনটনে নির্যাতিত হয়ে দুঃখে দিন কাটায় এবং মৃত্যুর পর নরকে গমন করে অসীম দুঃখ ভোগ করে। চুরি করার মধ্যে দিয়ে সামাজিকভাবে চৌর্যবৃত্তিব্যক্তিকে সকলে ঘৃণার চোখে দেখে। তার সাথে কেউ আত্মীয়তা বা কোনো সম্পর্ক করতে সম্মত থাকে না। এক কথায় সামাজিকভাবে তাঁর কোনো সম্মান থাকে না। সমাজে শান্তি বিঘ্নিত হয়ে থাকে।

তৃতীয়নীতি : ব্যভিচার হতে বিরতি

ব্যভিচার বলতে অন্যায় আচরণ, অবৈধ নারী সম্ভোগকারী কিংবা অন্যথাচারীকে বুঝায়। আইন সম্মত কিংবা সামাজিক স্বীকৃতি নাই এমন মিলন যথাকালে নিজ স্ত্রী, নিজ স্বামী ব্যতীত অন্য কোন নর-নারী এমন কি তির্যক জাতীয় স্ত্রী-পুরুষের সঙ্গে কামপরিভোগ করাকে বোঝায়। এ শীলে যৌনবৃত্তি থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে বলা হয়নি বরং জোর দেওয়া হয়েছে সৎভাবে নিজের ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করার উপর। পুরুষ স্ত্রী এবং নারী স্বামী ব্যতীত অপর নারী-পুরুষের কামভোগ নিষিদ্ধ। পরস্ত্রীকে মাতৃসম এবং কুমারীদের ভগিনীর মত ভাবতে হয়।[২০] স্বেচ্ছা প্রণোদিত কিংবা অনিচ্ছাকৃত যেকোনো ব্যভিচার বা কামাচার নৈতিকতা ও বিশুদ্ধি চরিত্র গঠনের পরিপন্থী। ধর্মপদে উক্ত রয়েছে যে, পরদার গমনকারী প্রমত্তব্যক্তি চার রকম দুঃখ পায় - প্রতিক্ষণে তার পাপ সঞ্চিত হয়, উদ্বেগ চিত্তে বিনিদ্র রজনী যাপন করে, সর্বত্র সে নিন্দিত হয় এবং মৃত্যুর পর নরকে গমন করে।[২১] সামাজিক সংহতি, শ্লীলতা ও শোভন জীবনযাপন নিশ্চিত করার জন্য বৌদ্ধ ধর্ম মানুষকে ব্যভিচার প্রতিরোধের দায়িত্ব দিয়েছে। কাজেই মানুষ নিজে যেমন এ অনাচার থেকে দূরে থাকবে তেমনি অন্যদেরকেও তা থেকে বিরত রাখার ব্যবস্থা করবে। প্রয়োজনীয় প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণের পরও যদি কেউ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় তাহলে তার ব্যাপারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা মানুষের সামাজিক দায়িত্ব। ব্যভিচারী নারী এবং ব্যভিচারী পুরুষ সকলের জন্যই শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। গৌতম বুদ্ধ বলেছেন, 'ব্যভিচার করিওনা'[২২] ব্যভিচার, অশ্লীলতা একটা অতিশয় জঘন্য কাজ এবং

Dhaka University Institutional Repository

নিকৃষ্ট পথ। যারা ব্যভিচারী কিংবা কামাচারী লোকে তাদেরকে দুঃশীল, দুরাচার এবং সর্বোপরি লম্পট বলে নিন্দা ও ঘৃণা করে। তাদের দর্শন কুদর্শনের ন্যায় নাসিকা কুঞ্চিত করে সবাই চোখ মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়। তারা সভাসমিতিতে বা সৎপুরুষের সান্নিধ্যে যেতে সাহস পায় না।[২৩] এ ব্যভিচার বা মিথ্যা কামাচারকারীরা ভোগ ঐশ্বর্য বিনাশজনিত অসংখ্য ও ভয়ানক বিপদের সম্মুখীন হয়। তাই উল্লেখিত হয়েছে ; কায়মনোবাক্যে কোনোরকম পাপ করা উচিত নয়। কামনা পরিত্যাগ করে স্মৃতিমান সম্প্রজ্ঞ হয়ে অনর্থবহ দুঃখসেবন থেকে বিরত হওয়াই বিধেয়।[২৪] বুদ্ধ অব্রহ্মচর্য্য বা ব্যভিচার এর তিনটি অঙ্গের কথা বলেছেন : অগমনীয় স্ত্রীলোক, মৈথুন সেবন চিত্ত, মার্গে মার্গে প্রতিপাদন।[২৫] যে পুরুষ নিজের স্ত্রীতে অসন্তুষ্ট হয়ে পতিতার সাথে জড়িত হয় পরস্ত্রীর সাথে কামসেবা করে তা হলে তার পরাজয় হয়।[২৬] আর যদি কোন ভিক্ষু শিক্ষাপদ সমূহে স্থিত থেকে শীল পালনে তার দুর্বলতা প্রকাশ না করে মনুষ্য-অমনুষ্য বা তির্যক জাতের সঙ্গে মৈথুন বিষয়ক কোন কর্ম করেন সেই ভিক্ষুর পারাজিকা[২৭] আপত্তি হয়। তিনি ভিক্ষু শাসন হতে পরাজিত হন।[২৮] পশুরা প্রাকৃতিকভাবে একজন সহচরের সাথে সন্তুষ্ট হতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। এমন কি কেউ কেউ পশুপক্ষীদের এক জোড়া স্ত্রীপুরুষের মিলনকালে এ প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত করার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত যুদ্ধ করে। কিন্তু এরকম করা মানব প্রকৃতি নয়, একজন জীব হিসেবে সে শুধুমাত্র প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয় না। একারণে বুদ্ধের তৃতীয়নীতি আমাদের প্রকৃতি পরিচালনার জন্য আমাদেরকে ব্যভিচার না করতে স্মরণ করে দেয়।

চতুর্থনীতি : মিথ্যাবাক্য ভাষণ থেকে বিরতি

'মিথ্যাচার' হচ্ছে অসত্য কথা বলা, অসত্য সংবাদ দেওয়া, অবাস্তব বর্ণনা ও অসত্য তথ্য প্রদান। আর মিথ্যা হলো সকল পাপের জননী। প্রত্যেক যুগেই মিথ্যা একটি সামাজিক আপদ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। যে সমাজে জনগোষ্ঠীর মধ্যে মিথ্যার প্রচলন রয়েছে সে সমাজে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়নি যতক্ষণ পর্যন্ত না সত্য তাদের সাহায্য করেছে। মিথ্যা পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে, ফলে তারা তাদের মধ্যকার পরস্পর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এতে তাদের মধ্যকার বিশ্বস্ততা, ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্ব লোপ পায়। মিথ্যাচার একটি ঘৃণ্য

Dhaka University Institutional Repository

বদস্বভাব। মিথ্যাচার মানুষকে কলংকিত ও মর্যাদা ক্ষুন্ন করে তার জন্য ক্ষতি বয়ে আনে। সর্বধর্মে মানবজাতিকে সর্বাস্থায় মিথ্যাচারিতা পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে জোরালো তাগিদ দেওয়া হয়েছে। ধর্মপদে বলা হয়েছে :

সহস্‌স'পি চে বাচা অনত্থপদসংহিতা,
একং অত্থপদং সেক্কো সং সুত্বা উপসম্মতি।[২৯]

অর্থাৎ, অর্থহীন পদ সমন্বিত হাজারো বাক্য শ্রবণ অপেক্ষা সার্থক একটি বাক্য শ্রবণ করে যদি প্রশান্তি লাভ করা যায় তাও শ্রেয়। মানুষের কথাবার্তা এমন হৃদয় গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর হওয়া উচিত যা সঠিক, মার্জিত রুচিসম্মত ভারসাম্যপূর্ণ। ন্যায়সংগত বলে বলুন আর তর্ক-বিতর্ক যাই করুন, তা করতে হবে উত্তম পন্থায়। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের অধিকাংশ সদস্য যদি সত্য কথা বলার দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন তাহলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, দলমত-নির্বিশেষে পারস্পারিক, দ্বন্দ্ব-কলহ, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা-বিদ্বেষ, পরচর্চা-পরনিন্দা ও প্রতিশোধ প্রবণতা বহুলাংশে লোপ পাবে এবং মানুষের মধ্যে অযথা শত্রুতা সৃষ্টি হবে না। এ প্রসঙ্গে ধর্মপদে উক্ত হয়েছে :

মা'বোচ ফরুসং কঞ্চি বুত্তা পটিবদেয়্যু তং;
দুক্‌খাহি সারম্ভকথা পটিদণ্ডা ফুসেয়্যু তং।[৩০]

অর্থাৎ, কাউকে কর্কশবাক্য বলো না, কারণ কর্কশ কথার প্রত্যুত্তর কর্কশই হবে। ক্রুদ্ধ বাক্যমাত্রই দুঃখদায়ক বা দুঃখকর, তজ্জন্য দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকেই স্পর্শ করবেই। সুতরাং মিথ্যাভাষণ বর্জন অত্যাবশকীয়। মিথ্যাভাষণ প্রদানকারীরা অসংখ্য দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে। এটি অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক বাক্যের পরিপন্থী। বুদ্ধ মিথ্যাবাক্য ভাষণ, উদ্বুদ্ধকরণ, মিথ্যার অনুমোদন না করা এবং সর্বপ্রকার মিথ্যা পরিবর্জনীয় বলে উল্লেখ করেছেন।[৩১] এটি সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর উপদেশ। এ মিথ্যাভাষণের মধ্যে নিহিত আছে বাচনিক বা অকথনীয় বাক্য। যেমন : মিথ্যা, ভেদ, কটুভাষণ ও বৃথাবাক্য। যে ব্যক্তি নিজের জন্য, পরের জন্য কিংবা ধন-সম্পত্তির জন্য সাক্ষীরূপে জিজ্ঞাসিত হয়ে মিথ্যা কথা বলে থাকে ; তাকেও জাতিচ্যুত বলে জানবে।[৩২] সজ্ঞানে মিথ্যা ভাষণ হচ্ছে, কোনো এক ব্যক্তির বিশ্বাস স্থাপনের নিমিত্ত মিথ্যাবাদিতামূলক এক ধরনের

বাক্য প্রকাশভঙ্গি বা উচ্চারণভঙ্গি-যা বাচনিকভাবে অষ্ট অনার্য বা হীন বাক্য; যথা : ১. অদৃষ্টকে দৃষ্ট বলা; ২. অশ্রুতকে শ্রুত বলা; ৩. অঘ্রাণিতকে ঘ্রাণিত, অনাস্বাদিতকে আস্বাদিত ও অস্পৃকে স্পৃষ্ট বলা; ৪. অজ্ঞাতকে জ্ঞাত বলা; ৫. দৃষ্টকে অদৃষ্ট বলা; ৬. শ্রুতকে অশ্রুত বলা; ৭. ঘ্রাণিতকে অঘ্রাণিত, আস্বাদিতকে অনাস্বাদিত ও স্পৃষ্টকে অস্পৃষ্ট বলা ; এবং ৮. জ্ঞাতকে অজ্ঞাত বলা।[৩৩]

বর্তমান সমাজে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মানুষের কথাবার্তায় অহেতুক মিথ্যাচার, অপবাদ, দোষারোপ, কলংক রটানো, অসাক্ষাতে নিন্দা ও প্রতারণামূলক অন্যায় কার্যকলাপ কমবেশি প্রায় ঘটেছে। বাক্যালাপে সদাচার ও মিথ্যাচার উভয়ই মানুষের ভেতর তথা মনোভাব ও অতিব্যক্তির সঙ্গে ওতোপ্রোতেভাবে সম্পর্ক যুক্ত। আর এগুলো মানুষের কথার্বাতা, কাজকর্ম, ব্যবহার ও আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। তাই বাক্যালাপে প্রকাশ বা গোপনে কথাবার্তায়, কাজেকর্মে শিষ্টাচারিতা রক্ষায় ভারসাম্যপূর্ণ সাবলীল ভাষা ব্যবহার ও প্রাঞ্জল বক্তব্য প্রয়োগে সামঞ্জস্য থাকা উচিত।

পঞ্চমনীতি : মদ-সুরা-জাতীয় দ্রব্য সেবন হতে বিরতি

সুরাপান জাতীয় দ্রব্য বলতে এমন কতকগুলো দ্রব্যকে বোঝায় যা পান করলে মানুষের সংজ্ঞা রহিত হয়, মানুষ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে ; সর্বোপরি উন্মাদ হয়ে পড়ে। তারা ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য বোঝার শক্তি হারিয়ে ফেলে। তাদের স্মৃতি বিদ্যা ও বুদ্ধি সব লোপ পায়। ব্যভিচার ও নরহত্যার মত জঘন্য অপরাধগুলোর অধিকাংশই মাদকাশক্তির পরিণাম। মাদকাশক্তি মারাত্মক অপব্যয়। তারা অর্থের অপচয় করতে কুণ্ঠিত হয় না। মাদক দ্রব্য সেবনের ফলে চক্ষুদ্বয় চণ্ডালের ন্যায় রক্তিম বর্ণ, আচরণ বিনয়হীন, নির্দয় কঠোর, নিষ্ঠুর, কর্কশ ও বদ মেজাজি হয়। তারা লোক সমাজে নিন্দনীয় ও হেয় প্রতিপন্ন হয়। সর্বদা দাহ পরিদাহ, জ্বালা-যন্ত্রনায় দিন কাটায়। নেশায় আসক্ত ব্যক্তিগণ এই শীল লজ্ঞন করে অনন্ত দুঃখ ভোগের পথ প্রশস্ত করে। মাদকদ্রব্যের মধ্যে আছে মদ, গাঁজা, তাড়ি, আফিম, চরস, হাশিশ, ভাং, মারিজুয়ানা, হেরোইন, মরফিন, পেথেড্রিন, ভেলিয়াম, সোনারিল, কোকেন, মেনড্রেকস, পলিটামিন, কোডেইন, ফেনসিডিল প্রভৃতি। মাদকদ্রব্য সেবনে ব্যক্তির নিজ সত্ত্বা যেমন তেমনি রাষ্ট্র এবং বিশ্বমানবতাও মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। বুদ্ধ এ জাতীয় ব্যক্তিদেরকে পরাজিত বলে অভিহিত করেছেন।[৩৪] সুরাপায়ী নরকে,

তির্যকযোনিতে, প্রেত-ভবনে ও অসুরলোকে উৎপন্ন হয়। যে অকিঞ্চন দরিদ্র ব্যক্তি মদ্যপায়ী হয়, সুরাপানে যেয়ে যথেষ্ট পরিমাণ সুরা পান করতে থাকে, সে জলে নিমগ্ন হওয়ার ন্যায় ঋণ-সাগরে ডুবে অবিলম্বে নিজকে বিপন্ন করে।[৩৫] যে ব্যক্তি সকাল সকাল ঘুমায়, রাত্রিতে চেতন পায় না, নিত্য সুরাপানে মত্ত থাকে সে গৃহবাসের যোগ্য নয়।[৩৬] জাতক সাহিত্যে[৩৭] নেশাপানকে একটি প্রায়শ্চিত্তিক অপরাধ বলে অভিহিত করা হয়েছে। বুদ্ধ মাদকদ্রব্যের আসক্তি হতে ছয় প্রকার[৩৮] অনিষ্টকর বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। যেমন : ১. প্রত্যক্ষ ধননাশ ২. কলহ বৃদ্ধি ৩. বিবিধ রোগের উৎপত্তি ৪. অযশের প্রচার ৫. বিবস্ত্র অবস্থায় চলাচল করা এবং ৬. বুদ্ধিনাশ। এগুলো দ্বারা কর্মোদ্যাগ, কর্মস্পৃহা বিনষ্ট হয়, তাই এগুলো পণ্ডিত দ্বারা প্রশংসিত হয় না।[৩৯] মাদকদ্রব্য সেবনকারীরা উন্মত্ত, নিলর্জ্জ, দীন, বিপদগ্রস্থ, শোকপরায়ণ ও কুৎসিত দেহধারী হয়।[৪০] তাই মদ্যপানে রত না হওয়া, কাউকে মদ্যপানে প্রবৃত্ত না করা ; মদ্যপানের অনুমোদন উচিত নয়।[৪১] আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মাদকদ্রব্য সেবন ও অকল্যাণকর বাণিজ্য দণ্ডনীয় অপরাধরূপে গণ্য। এই ধর্ম যে গৃহীলোকের রুচিকর হবে, তিনি মদ্যপান হতে বিরত হবেন ; মদ্যপান করতে কাউকে উৎসাহিত করবেন না, মদ্যপানের অনুমোদনও করবেন না, কারণ মদ্যপানে আসক্ত ব্যক্তি উন্মাদগ্রস্ত হয়ে থাকে।[৪২] তাই বলা যায় যে, নেশায় আসক্ত ব্যক্তিগণ এই শীল লংঘন করে অনন্ত দুঃখ ভোগের পথ প্রশস্ত করে। এই শীল ভঙ্গের অপকারিতা অত্যন্ত ভয়াবহ। তাই সুশীলতাই এই বিপদ হতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায়। পঞ্চশীল সম্পর্কে ধর্মপদ গ্রন্থে অতি মূল্যবান উপদেশ :

যো পাণং অতিপাতেতি মুসাবাদঞ্চ ভাসতি,
লোকে অদিন্নং আদিযতি পরদারঞ্চ গচ্ছতি।
সুরামেরেয পানঞ্চ যো নরো অনুযুঞ্জতি,
ইধেবমেসো লোকস্মিং মূলং খণতি অত্তনো।
এবং ভো পুরিস, জানাহি পাপধম্মা অসঞ্ঞতা,
মা তং লোভো অধম্মো চ চিরং দুক্খায বন্ধেয্যুং।[৪৩]

অর্থাৎ, যে প্রাণিহত্যা করে, পরের দ্রব্য অপহরণ করে, পরদার গমন করে, মিথ্যাকথা বলে এবং মদ, সুরা প্রভৃতি মাদকদ্রব্য সেবন করে সে ইহ জগতে নিজেই নিজের ধ্বংস সাধন করে। সে জন্য বুদ্ধ মানুষের মঙ্গল কামনায় উপদেশ প্রদান করেন এভাবে : তোমরা যদি লোভ সংবরণ ও পাপকর্মে সংযত না হও, তাহলে দীর্ঘকাল দুঃখ ও অনুতাপ ভোগ করবে। যাতে তোমাদের ইহ পরকালে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয় তেমন কাজের অনুসরণ কর।

জাতকের উপদেশে পঞ্চশীল

জাতক ত্রিপিটকের একটি অনন্য সংযোজন। এখানে ধর্মীয় ভাব চেতনায় প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য ও প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক জীবন যাত্রার ইতিহাস সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। 'জাত' শব্দ হতে জাতক শব্দের উৎপত্তি। জন্মগ্রহণ করেছে অর্থে জাতক। গৌতম বুদ্ধ পারমী পূরণকালীন যে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এক একটি আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। তাই জাতকে লিপিবদ্ধ হয়েছে। অর্থাৎ গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্বপূর্ব বিভিন্ন জন্মের কাহিণি। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে গৌতম বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পারমী পূরণার্থে পাঁচশ পঞ্চাশ বার জন্ম নিয়েছিলেন। বিভিন্ন যোনিতে তাঁর এ জন্ম পরিগ্রহ হয়েছিল। সেই অনুসারে পাঁচশ পঞ্চাশটি জাতক থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান সঙ্কলনে আমরা পাঁচশ সাতচল্লিশটি জাতক পাই। জাতকের উপদেশে পঞ্চশীল সম্পর্কিত বেশ কিছু কাহিণি জানা যায়। যেগুলো সম্পর্কে পাঠ করলে শীল পালনের আগ্রহ আরো বেশি বেড়ে যায়। এমন কিছু জাতকের আলোকে পঞ্চশীলের প্রভাব তুলে ধরা হলো :

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব রাজার পুরোহিত ছিলেন। তিনি নানাবিধ পুণ্যকর্ম করতেন এবং যথা নিয়মে পঞ্চশীল পালন করতেন। এ জন্য রাজা অন্য সব ব্রাহ্মণ অপেক্ষা তাঁকে বেশি পছন্দ করতেন।

একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবতে লাগলেন, রাজা আমাকে অন্য সকল ব্রাহ্মণের থেকে বেশি সম্মান করেন। তিনি আমাকে এত শ্রদ্ধা করেন যে আমাকে গুরুর পদে বরণ করেছেন। এখন আমাকে দেখতে হবে, রাজা আমাকে এত শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ কেন করেন। তিনি আমাকে আমার বংশমর্যাদা ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য, না কি আমার চরিত্রগুণের জন্য এত সম্মান করেন, তা আমাকে দেখতে হবে পরীক্ষা করে।

এর পর একদিন বোধিসত্ত্ব রাজার সঙ্গে দেখা করে বাড়ি ফিরার সময় রাজার ধনপালের ধন রাখার পাত্র হতে একটি মুদ্রা তুলে নিলেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন বলে ধনপাল তাকে শ্রদ্ধা করতেন। তাই ধনপাল তা দেখতে পেয়েও কিছু বললেন না।

পরদিন বোধিসত্ত্ব সেই ধনপালের পাত্র হতে দুটি মুদ্রা তুলে নিলেন। সেদিনও ধনপাল তাঁকে কিছু বললেন না। তৃতীয় দিনও বোধিসত্ত্ব ধনপালের ধনপাত্র হতে একমুঠো মুদ্রা তুলে নিলেন। তখন ধনপাল তাকে বললেন, 'আজ পর্যন্ত আপনি পর পর তিন দিন রাজার ধন অপহরণ করেছেন।' এই বলে ধনপাল চিৎকার করে বলে উঠলেন, এই লোক রাজার ধন চুরি করেছে। এই চিৎকার শুনে অনেক লোক ছুটে এল। তারা সবাই বোধিসত্ত্বকে বলতে লাগলেন, ব্রাহ্মণ, তুমি না নিজেকে শীলবান বলে পরিচয় দিতে? এই বলে তারা সকলে বোধিসত্ত্বকে বেঁধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে গেল। রাজা তখন দুঃখিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণ তুমি কেন এই কার্য করলে? বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি চোর নই মহারাজ। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, চোর নও ত এই কুকর্ম ও কদর্য কাজ করলে কেন? বোধিসত্ত্ব বললেন, ভাবলাম, একবার পরীক্ষা করে দেখি, রাজা আমাকে যে এই সম্মান দেন তা আমার বংশমর্যাদার জন্য, না কি আমার চরিত্রগুণের জন্য। তাই আমি এটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই আমি ধনপাত্র হতে মুদ্রা তুলে নিয়েছি। এখন বুঝতে পারলাম চরিত্রগুণেই আমার এত সম্মান হয়েছে, কুলগৌরব বা বিদ্যার জন্য নয়। পথে আসার সময় দেখলাম, সর্পরাও শীলবান হতে পারে। বোধিসত্ত্বকে যখন বেঁধে রাজার কাছে ধরে আনা হচ্ছিল, তখন কয়েকজন সাপুড়ে সাপ খেলা দেখাচ্ছিল। সাপুড়েরা এক একটা সাপের লেজ ও গলা ধরে নিজেদের গলায় জড়াচ্ছিল। তা দেখে বোধিসত্ত্ব বললেন, বাপু সকল, তোমরা এমন করে গলায় সাপ জড়িয়ে ধরলে সাপে তোমাদের কামড়ে দিতে পারে। তাহলে তোমরা মারা যাবে। সাপুড়েরা বলল, ঠাকুর, আমাদের সাপেরা শীলবান, তারা সদাচার জানে। তারা তোমার মত দুঃশীল নয়। তুমি দুঃশীল বলেই ত রাজার ধন হরণ করেছ, তাই ওরা তোমায় বেঁধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব তখন ভাবলেন, সর্পেরাও যদি দংশন না করে তবে তাদের শীলবান বলে, তাহলে মানুষের ত কথায় নেই। অতএব আমি এখন হতে শীলবান হবো এবং চিরদিন শীলব্রত পালন করব নিষ্ঠার সঙ্গে। বোধিসত্ত্ব আবার রাজাকে বলেন, মহারাজ, বুঝেছি জীবনে শীল সবচেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উত্তম বস্তু। কিন্তু গৃহে থেকে বিষয় ভোগ করে গেলে কিছুতেই প্রকৃত শীলবান বা চরিত্রবান হতে পারব না। তাই আমি স্থির করেছি, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে গমন করব। একটি গাথার মাধ্যমে শীলধর্মের ব্যাখ্যা করার পর তিনি রাজার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। রাজা তাঁকে এই অনুমতি দান করলে বোধিসত্ত্ব তখনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে গমন করলেন। সেখানে দীর্ঘ কাল ধ্যানসুখে নিমগ্ন হওয়ার পর ব্রহ্মলোকে গমন করলেন।[৪৪] এখানেও শীল পালনের গুরুত্ব ফুটে ওঠে।

পুরাকালে বারাণসী রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব হিমালয় প্রদেশে মহিষরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দেহ বিশাল ও বলিষ্ঠ হয়েছিল। তিনি পাহাড় পর্বত, কন্দর, গহন, অরণ্য প্রভৃতি সর্বত্র বিচরণ করে বেড়াতেন। একবার বোধিসত্ত্ব এক জায়গায় একটি রমণীয় বৃক্ষ দেখে তার মূলে বিশ্রাম করতেন। ঐ সময় একটি ধূর্ত বানর সেই বৃক্ষে বাস করত। সেই বানর গাছ থেকে নেমে মহিষরূপী বোধিসত্ত্বের পিঠে চাপত। তাঁর পিঠের উপর মলমূত্র ত্যাগ করত। খেলা করার জন্য তাঁর শিং ধরে ঝুলত, তাঁর লেজ ধরে দোল খেত। বোধিসত্ত্বের চিত্ত ক্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়ায় পূর্ণ ছিল বলে তিনি বানরের এই অত্যাচার সব সহ্য করতেন। কোনোরূপ বিরক্তির ভাব দেখাতেন না। তাই বানর বারবার এই কুকর্ম করত। সেই বৃক্ষে এক দেবতা বাস করতেন। একদিন তিনি বৃক্ষের উপর দাঁড়িয়ে বোধিসত্ত্বকে বললেন, মহিষরাজ, এই দুঃশীল বানর তোমায় নিত্য জ্বালাতন করে। তুমি তার অপমান সহ্য কর কেন? কেন তাকে শিং দিয়ে আঘাত করে পা দিয়ে পীড়ন কর না? বিনা প্রতিশোধে এই মূর্খ বানর সদাই উৎপীড়ন করে তোমায়। দেখে মনে হয় এ যেন তোমার সর্বকামপ্রদ প্রভু। এই কথা শুনে বোধিসত্ত্ব বললেন, এই মূর্খ মর্কট অন্য কোনো মহিষকে আমার মত মনে করে এই আচরণ করবে। যখন কোনো উগ্র মহিষের সঙ্গে এইরকম আচরণ করবে তখন সে একে বধ করলে আমার কষ্টের অবসান হবে এবং আমাকে প্রাণিহত্যার পাপে লিপ্ত হতে হবে না। এর পর বোধিসত্ত্ব অন্যত্র চলে গেলেন। তখন এক উগ্র প্রকৃতির মহিষ, এসে সেই বৃক্ষমূলে অবস্থান করতে লাগল। সেই দুষ্ট মর্কট তাকে বোধিসত্ত্ব ভেবে তার পিঠে চেপে মলমূত্র ত্যাগ করল। সেই উগ্রচণ্ড মহিষ তখন রেগে গিয়ে তার পিঠটা কাঁপিয়ে বানরকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর শিং দিয়ে বুকে জোর আঘাত করে পা দিয়ে তার দেহটাকে দলিত করল। এইভাবে

বানরের দেহ চুর্ণবিচূর্ণ হলো এবং সে তার দুষ্কর্মের প্রতিফল পেল। বোধিসত্ত্বকে প্রাণিহত্যাকর্মে জড়াতে হয়নি। এভাবে বোধিসত্ত্ব প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হয়ে শীলকে রক্ষা করলেন।[৪৫] একবার সম্যকবুদ্ধের সময়ে এক আর্য তাপসের সাথে এক সঙ্গতিসম্পন্ন নাপিতের ঘনিষ্ঠতা হলে তাঁরা একটি জাহাজে করে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন এবং যাবার সময়ে নাপিতের স্ত্রী আর্য তাপসের হাতে স্বামীকে অর্পণ করেছিলেন। সপ্তম দিনে যাত্রাপথে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে একটি দ্বীপে আটকে গিয়ে নাপিত আহারের জন্য কয়েকটি পাখি মেরে রান্না করে আর্য তাপসকে দিয়ে খেতে চাইলেন কিন্তু তাপস তা খেলেন না। তাপস ঝড়ের কবল থেকে উদ্ধারের জন্য ত্রিরত্নগুণ স্মরণ করতে লাগলেন। তাতে সেই দ্বীপের নাগরাজ তাঁর দেহখানি একটি বড় নৌকায় পরিণত করে তাপসকে নিয়ে যেতে চাইলেন। কারণ আর্য তাপস শীল রক্ষা করেছিল।[৪৬] পরবর্তীতে তাপস পূর্বে নাপিতের স্ত্রীকে দেওয়া কথামত তাঁকে বাঁচানোর জন্য শীলফল দান করেন এবং নাপিত তা গ্রহণ করেন। এই উপাসক শ্রদ্ধাবান ও শীলবান বলেই নাগরাজ নিজে নৌকা হয়ে একে বহন করলেন।[৪৭]

বোধিসত্ত্ব একবার হস্তিকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আশিহাজার হস্তিকুলের অধিপতি ছিলেন। তাঁর মাতা ছিল অন্ধ। তিনি মাতাকে অন্যের মাধ্যমে খাবার পাঠাতেন কিন্তু তারা না দিয়ে নিজেরাই খেয়ে ফেলতেন। বোধিসত্ত্ব পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি নিজে মায়ের সেবা করবেন। একদিন তিনি মাকে নিয়ে চণ্ডোরণ পর্বতের পাদদেশে চলে গেলেন। একদিন এক ধূর্ত বারাণসীবাসী সেই বনের মধ্যে পথ হারিয়ে বন থেকে বের হতে না পেরে আর্তনাদ করছিল। শীলবান বোধিসত্ত্ব সেই আর্তনাদ শুনে অনুকম্পাবশতঃ লোকটির কাছে এসে বললেন, ভয় নেই, আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেব। এই বলে লোকটিকে পিঠে নিয়ে লোকালয়ে দিয়ে আসলেন কিন্তু ধূর্ত লোক সেই পথটি চিনে রাখলেন। সেই সময় বারাণসীরাজের মঙ্গলহস্তিটি মারা যায়। রাজাকে বহন করার জন্য যদি কেউ কোনো ভালো হস্তি পায় তাকে যেন খবর দেন। ধূর্ত লোকটি রাজাকে বললেন আমি এক বনে আপনাকে বহন করার উপযুক্ত সর্বাঙ্গসুন্দর, শীলবান ও শ্বেতবর্ণের একটি হাতি দেখেছি। আপনি তাকে ধরে আনার জন্য গজাচার্যদের পাঠার আমি পথ দেখিয়ে দেব। রাজা তাই করলেন। বোধিসত্ত্ব গজাচার্যদের দেখে বুঝতে পারলেন ধূর্ত লোকটি এ কাজ করেছে। বোধিসত্ত্ব চাইলে ধরা না দিতে পারতেন। বোধিসত্ত্বের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে কেউ নিয়ে যেতে পারত না।

তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বল প্রয়োগ করলে তাঁর শীলভঙ্গ হবে তাই নীরব দাঁড়িয়ে রইলেন। গজাচার্যরা তাঁকে দেখে বুঝলেন এটির রাজাকে বহন করার জন্য উপযুক্ত। তাঁকে এসো পুত্র বলে নিয়ে গেলেন রাজার কাছে। রাজা তাঁকে উৎকৃষ্ট ও মধুররসযুক্ত খাবার এনে খেতে দিলেন কিন্তু বোধিসত্ত্ব তা খেলেন না। বোধিসত্ত্ব তাঁর মায়ের অবস্থা রাজার কাছে বর্ণনা করলেন। রাজা সব কথা শুনে বললেন, এই শীলবান হস্তিবর মাতার পোষণে রত। একে মুক্ত করে দাও। সে তাঁর মাথার কাছে গিয়ে সেবা করুক। বোধিসত্ত্ব শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তখনি চণ্ডোরণ পর্বতে মায়ের কাছে চলে গেলেন।[৪৮]

বোধিসত্ত্ব একবার রুরুমৃগকুলে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সে সময় আশিকোটি ধনসম্পন্ন এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর এক পুত্র সন্তান ছিল। তাঁর নাম ছিল মহাধনক। বিদ্যাশিক্ষা করতে কষ্ট হবে বলে তাকে তার পিতা-মাতা বিদ্যাশিক্ষা করালেন না। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে শ্রেষ্ঠী তাঁর বিবাহ দিলেন। কালক্রমে তাঁর পিতা-মাতা মৃত্যু বরণ করলেন। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর মহাধনক তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ মদ্যপান আর পাশাখেলার মধ্যে দিয়ে নষ্ট করল। অনেকের কাছে ঋণ নিয়ে না দিতে পেরে একদিন নদীতে ঝাপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে চাইলেন। কিন্তু সে সময় বোধিসত্ত্ব তাকে জীবিত উদ্ধার করলেন এবং মহাধনককে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিলেলন। মহাধনক যখন বারাণসীতে ফিরে গেলেন এবং জানতে পারলেন যে রাজার অগ্রমহিষীর স্বপ্ন পূরণের জন্য সোনার হরিণ খুঁজছেন। যে সোনার হরিণের সন্ধান দিতে পারবে তাকে সহস্রমুদ্রা ও অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া হবে। এ কথা শুনে মহাধনক রাজাকে সেই উপকারী সোনার হরিণরূপী বোধিসত্ত্বের খোঁজ দিতে নিয়ে গেলেন। রাজার লোকেরা পুরো এলাকা ঘিরে ফেললে রুরুমৃগ তা জানার জন্য রাজার দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন। এমন সময় রাজা চিন্তা করলেন, হরিণটি তাঁর কোনো ক্ষতি করবে এ ভেবে মৃগকে লক্ষ্য করে শরনিক্ষেপ করতে উদ্যত হলেন। তখন সুবর্ণমৃগরূপী বোধিসত্ত্ব মানুষের মত মধুর কণ্ঠে রাজাকে অভিবাদন করলে রাজা শরায়ন ত্যাগ করে তাঁর কথা শুনতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব রাজার কাছ থেকে জানতে পারলেন, মহাধনক যাকে একদিন জীবন বাঁচিয়ে ছিলেন সেই তাঁর খোঁজ রাজাকে দিয়েছে। বোধিসত্ত্ব পুরো ঘটনা রাজাকে জানালে রাজা তাকে হত্যা করার কথা বললেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বললেন, সাধুজন কখনো প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা বা প্রাণিহত্যা চান না।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে ঘোষিত পুরস্কার মহাধনককে দিতে বললেন এবং সমস্ত প্রাণির জন্য অভয় আশ্রম চাইলেন। অতঃপর মহা সমাদরে নগরমধ্যে গিয়ে রাজঅগ্রমহিষীকে ধর্মকথা শুনিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করলেন এবং প্রাণিহত্যা থেকে শীল রক্ষা করার দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।[৪৯]

পঞ্চাল নগরে পঞ্চাল নামে এক রাজার অগ্রমহিষী পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। মহিষীর পূর্বজন্মে এক সপত্নী ছিল। সে একদিন ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিল, আমি যেন তোর গর্ভজাত পুত্রকে ভক্ষণ করতে পারি। এই কামনা করে মৃত্যুর পর সে যক্ষী হয়ে জন্ম গ্রহণ করল। মহিষী পুত্র প্রসব করার পর পর্যায়ক্রমে দুইটি পুত্রকে সূতিকা ঘরেই ভক্ষণ করল। তৃতীয়বার পাহাড়াদারদের জন্য খেতে না পেরে পুত্র সন্তান নিয়ে পালিয়ে যাই। শিশুটি যক্ষীকে মা ভেবে তার স্তনে মুখ দিল। তখন যক্ষীর হৃদয়ে অপত্যস্নেহ জাগল। সে শিশুটিকে তাঁর বাসায় নিয়ে গিয়ে লালন-পালন করতে লাগল। শিশুটি বড় হলে যক্ষী মানুষের মাংস এনে খেতে দিত। কুমার মনুষ্যভাব ভুলে যক্ষীর সঙ্গে নরমাংস খেত। সে নিজেকে যক্ষীর পুত্র বলেই মনে করত। যক্ষীরা যেহেতু যে কোনো সময়ে যে কোনো রূপ ধারণ করতে পারে। কুমার যেহেতু মানব সন্তান তাই তাকে সেরূপ ধারণের জন্য যক্ষী তাঁকে একটি শিকড় দিলে তা দিয়ে সে তাই করত এবং সেই মত চলাফেরা করত।

রাজমহিষী যখন চতুর্থ পুত্র সন্তান লাভ করলেন তখন যক্ষী আর বেঁচে ছিলেন না। এতকিছু জয় করে যাঁর বেঁচে থাকা তাই তার নাম করণ করা হয় জয়দ্দিস। বিদ্যাশিক্ষার করে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাকে রাজ্যের দায়িত্বভার দেওয়া হয়। কালক্রমে জয়দ্দিস রাজার অগ্রমহিষীর গর্ভে বোধিসত্ত্ব জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর নাম রাখা হলো অলীনশক্রকুমার। বয়ঃপ্রাপ্তির পর বিদ্যাশিক্ষা শেষে সে উপরাজের পদ লাভ করলেন।

এদিকে যক্ষীর পালিতপুত্র অসাবধানতাবশতঃ সেই শিকড়টি হারিয়ে ফেলেছিল। তাই সে আর মানুষের অদৃশ্য হতে পারত না। সে শ্মশানে বাস করত এবং লোকচক্ষুর সামনেই নরমাংস খেত। এমন খবর পেয়ে রাজা তাকে ধরার আদেশ দিলেন। কিন্তু রাজকর্মচারীরা ও সৈনিকগণ তাকে ধরতে ব্যর্থ হলে সে বনে পালিয়ে যাই এবং বনের পথের ধারের মানুষ ধরে খেতে থাকল। পঞ্চালরাজ জয়দ্দিস মৃগয়া করার জন্য ঐ বনে যাত্রা করার পথে একধার্মিক ব্যক্তির চারটি গাথা ফিরে এসে শুনবেন বলে কথা দিয়ে যান। রাজা বনে গিয়ে ঘটনাক্রমে ঐ যক্ষীর কবলে পড়েন।

যক্ষী তাঁকে ক্ষেতে চাইলে বলেন, আমি একজনকে কথা দিয়ে এসেছি তাঁর গাথা শুনে তাঁকে পুরস্কৃত করব। আমাকে একদিনের সময় দিন আমি আগামীকাল এখানে চলে আসব। রাজা সব কাজ শেষ করে যেতে চাইলে তাঁর পুত্র বললেন, আমি আপনার জায়গায় যেতে চাই। আমি আপনাকে ছেড়ে রাজ্য লাভ করতে চাইনা। প্রয়োজন হলে আমি যক্ষের কাছে প্রাণবলি দিয়ে আপনাকে দায়মুক্ত করব। অপেক্ষারত যক্ষী রাজার পরিবর্তে রাজপুত্রকে দেখতে পেল। সে যক্ষীর কাছে গিয়ে বলল, আমি পঞ্চালরাজ জয়দ্দিসের পুত্র। পিতার সত্য রক্ষা করার জন্য নিজের প্রাণবলি দিতে এসেছি। আমাকে ভক্ষণ কর। যক্ষী ভাবল, এ যুবক অতিশয় ধার্মিক। তাঁকে ভক্ষণ করার ক্ষমতা আমার নেই। যক্ষী তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য বলল, কাঠ এনে আগুন জ্বালাও। সে কাঠ নিয়ে ফিলে এলে, যক্ষ তাঁকে বললেন, তুমি ফিলে যাও পিতা-মাতার সেবা কর। রাজপত্র কাঠ আনার ব্যাপারে জিজ্ঞেসা করলে যক্ষী বললেন, তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য কাঠ আনতে বলেছিলাম। যক্ষ কুমারকে বিদায় দিলে কুমার তাঁকে সংযম ও পঞ্চশীল শিক্ষা দিলেন।[৫০]

চাম্পেয় জাতকে দেখা যায় যে, বোধিসত্ত্ব এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নাগপূজার দিন সকলের সঙ্গে নদীতীরে গিয়ে নাগরাজের ঐশ্বর্য দেখতে পান। দেখে লোভ জন্মায় তাঁর মনে। তিনি মনে মনে ঐ ঐশ্বর্য প্রার্থনা করে শীলরক্ষা করে চলতে লাগলেন। পরে তাঁর নাগকুলে জন্ম হলে বোধিসত্ত্ব সবকিছু বুঝতে পেরে আবার মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করার জন্য এবং মানুষকে সত্য শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রাসাদে থেকেই শীলব্রতপালন করতে লাগলেন। কিন্তু নাগকন্যারা প্রায়ই নানা অলংকারে ভূষিত হয়ে তাঁর কাছে আসত বলে তাঁর শীলভঙ্গ হতে লাগল। তখন তিনি প্রাসাদ হতে বের হয়ে উদ্যানে গিয়ে পোষধব্রত পালন করতে লাগলেন। কিন্তু নাগকন্যারা সেখানেও যেতে লাগল। রাজপ্রাসাদে শীল পালন ব্যাহত হত বলে তিনি নগরের বাহিরে নির্জনে পথের ধারে এক বল্মীক স্তূপের উপর থাকতেন। নরলোক ভিন্ন অন্য কোথাও কেউ সংযম ও শুদ্ধি লাভ করতে পারে না। সেই সংযম ও ও শুদ্ধি বলে আমি নরজন্মলাভ করে ভব সমুদ্র পার হবো।[৫১]

মাতঙ্গ জাতকে দেখা যায় যে, বোধিসত্ত্ব চণ্ডালকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নাম রাখা হয় মাতঙ্গ। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি প্রভূত জ্ঞান বিদ্যা অর্জন করে মাতঙ্গ পণ্ডিত নামে বিখ্যাত হন। ঘটনাক্রমে

জাতিমন্তের কথায় ক্রুদ্ধ হওয়ার মত হলেও তিনি তা করেননি কারণ তা করলে তাঁর শীল ভঙ্গ হবে বলে অন্য উপায়ে জাতিমন্তের গর্ব চুর্ণ করেছিলেন।[৫২]

দশব্রাহ্মণ জাতকে রাজাকে তাঁর অমাত্য বিদুর নগরবাসী ও রাজাসহ সবাইকে পঞ্চশীল পাললে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করেছিলেন সে কাহিনি জানা যায়।[৫৩]

বর্তমান প্রচলিত দণ্ডবিধির সাথে পঞ্চশীলের তুলনামূলক আলোচনা

'দণ্ড' শব্দটি অবিকলভাবে বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে।[৫৪] 'দণ্ড' শব্দের অর্থ হলো ভয় প্রদর্শনের উপায়, শঙ্কিত করার পথ, ভীষণতা, ভয়ানকতা, উৎপীড়ন, আক্রমণ, অনিষ্ট, জ্বালাতন, শাস্তি, প্রতিবিধান, সাজা ইত্যাদি।[৫৫] পাপের শাস্তি কিংবা অন্যায়ের প্রতিবিধানে দণ্ড প্রদান অনাদিকাল থেকে চলে আসছে। দণ্ড প্রদান করা এবং দণ্ডিত হওয়া এর কোনোটাকে আদৌ বুদ্ধ সমর্থন করেনি।[৫৬] বরং উভয়ের প্রতি অপরসীম মমত্ব দেখিয়েছেন। বৌদ্ধ বিনয়ে শীল পালনের গুরুত্ব এবং শীল ভঙ্গের পরিণাম সম্পর্কে বিবি-বিধান রয়েছে। এগুলো হলো ধর্মীয় অনুশাসন। এতে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা এবং শাস্তির বিধানও সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তবে এ সমস্ত বিধি-বিধান হচ্ছে বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘের জন্য সীমিত। সংঘ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এসব বিধান প্রযোজ্য। বৌদ্ধধর্ম নির্বাণমুখী পরমার্থ ধর্ম। নির্বাণে পৌঁছার সকল বিধি-বিধান এখানে বিধৃত। সামাজিক বিধান বা রাষ্ট্রের আইন ও বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা সংঘের বিধি-বিধান থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। এ সকল বিধি-ব্যবস্থায় দৈহিক শাস্তি, অর্থদণ্ড এবং দণ্ডের বিধান বলবৎ রয়েছে। এ সকল শাস্তির ব্যবস্থা সমাজে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও সমাজদেহ হতে অপরাধের প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে বলা যায় না।[৫৭] কারণ তাদের অন্তরে যে পাশব শক্তি রয়েছে তার অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত অন্যায়ের অবসান হতে পারে না। বৌদ্ধ ধর্ম এ পাশব শক্তিকে চিরতরে বিলোপ করতে অবিরাম প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

দণ্ড বা শাস্তি দৈহিক ও মানসিক পীড়া দায়ক। ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করে মৃত্যু ভয়ে কে না ভীত? আবার সুখ, আনন্দ, ভালোবাসা, প্রেম-প্রীতি কে না চায়? একথাগুলোর অর্থ হলো সমস্ত প্রাণিজগৎ এক মূল সুরে বাঁধা। আর সে সুর হচ্ছে সুখ এবং দুঃখ। এ দুটো সুর সকলের মধ্যে

Dhaka University Institutional Repository

সমানভাবে অনুরণিত। এ চেতনাকে আত্মস্থ করা একান্ত প্রয়োজন। এ সত্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সকল প্রাণিকে নিজের মতো তুলনা করে কাউকে আঘাত করা কিংবা হত্যা করা উচিত নয়। সুখের প্রত্যাশায় এ জগতের সকল মানুষ ঘুরছে। এ ঘোরার পেছনে নিজের স্বার্থটা সবচেয়ে বড় করে দেখে। লোভাতুর মানুষ অপরের অধিকারের কথা ভুলে যায়। তাই আত্মসুখে মগ্ন হয়ে মানুষ দণ্ডের দ্বারা অপরের সুখ হনন করে। এরূপ সুখ হননকারী নিষ্ঠুর ব্যক্তি পরলোকে দুঃখই ভোগ করে থাকে। কাজেই কাউকে দণ্ড প্রদান করে তাকে সুখের অধিকার হতে বঞ্চিত করা উচিত নয়।

বর্তমানে আমাদের সমাজে যারা দণ্ড দেবার ক্ষমতা অর্জন করেছেন বা পেয়েছেন তারা বুদ্ধের পঞ্চশীল সম্পর্কে ধারণা রাখবেন এবং একই সাথে মেনে চলার চেষ্টা করবেন এটাই স্বাভাবিক। দণ্ড প্রদানকারী বিচারকদের সতর্ক করে দিয়ে কিছু সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্যে। অর্থের বশে বা কোনো লোভে প্রলুব্ধ হয়ে নিরস্ত্র, নিরপরাধ ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করলে তাঁর হীনমন্যতা এবং কাপুষতারই বহি:প্রকাশ পায়। শুধু তাই নয়, দশ প্রকার[৫৮] দুর্ভোগের মধ্যে যে কোনো দুর্ভোগ তার উপর নিপতিত হয়। যেমন :

১. তীব্র বেদনা দায়ক পীড়ায় আক্রান্ত হওয়া;
২. সম্পদহানী ও অর্থের অপচয় হওয়া;
৩. দুর্ঘটনা জনিত কারণে অঙ্গহানি ঘটা;
৪. পক্ষাঘাত, কুষ্ঠরোগ প্রভৃতি জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়া;
৫. চিত্ত বিকৃত হয়ে উন্মাদ জনিত রোগ হওয়া;
৬. রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্ত হয়ে রাজদণ্ড ভোগ করা;
৭. অভূতপূর্ব, অকৃতপূর্ব ও অশ্রুতপূর্ব বিষয়ে জড়িত হয়ে কলঙ্কের ভাগী হওয়া;
৮. হিতৈষী আত্মীয়য়ের বিয়োগ ঘটা;
৯. সঞ্চিত খাদ্যশস্য, স্বর্ণ রৌপ্য, মনিমুক্তা, কার্পাস বীজ, গৃহপালিত পশু প্রভৃতি ধন সম্পদ হানি হওয়া এবং
১০. বারংবার গৃহদাহ হওয়া।

এরূপ দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন হীনমন্য বিচারক উক্ত দশ প্রকারের মধ্যে যে কোনো এক প্রকার দুর্ভোগ ছাড়াও মৃত্যুর পর নিদারুণ নরক যন্ত্রনা ভোগ করে। এজন্যে বিজ্ঞ বিচারকগণ বাদী বিবাদীর বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে রায় প্রদান করেন। এমন বিচার ব্যবস্থাকে পঞ্চশীলের প্রথম শীলের সাথে তুলনা করা যায়। কারণ প্রাণি হত্যা করলে যে পাপ হয় ভুল বিচারে একজনের যদি মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়ে কার্যকর হয় তা সমঅপরাধতুল্য বলতে দ্বিধা থাকে না। যদিও বৌদ্ধধর্মে এরূপ বর্তমান বিশ্বে প্রচলিত হয়ে আসা মৃত্যুদণ্ডাদেশকে কোনো ভাবেই সমর্থন করার কোনো সুযোগ নেই। চৌর্যবৃত্তি হলো পঞ্চশীলের দ্বিতীয় শীল। আমাদের সমাজব্যবস্থায় তথা সারা বিশ্বে চৌর্যবৃত্তিকে অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখা হয়। যদি বুদ্ধের এ শীলটি প্রতিপালন করা সম্ভব হয় তাহলে দণ্ডের কোনো প্রয়োজন পড়ে না। কেননা সমস্যার শুরুতেই যদি সমাধান করা সম্ভব হয় তাহলে আর কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা ঘটার সুযোগ থাকে না। এ ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পায় দ্বিতীয় শীলের সাথে সমাজের প্রচলিত দণ্ডবিধানের সম্পর্ক রয়েছে। কর্কশ বাক্য প্রতিকর্কশ বাক্যের উৎপত্তি করে। কটূক্তির উত্তর কটূক্তিই হয়ে থাকে। কর্কশ এবং কটূক্তি মনে যত আঘাত হানে অন্য কিছুতেই তেমন হয় না। রোষবহ্নি উত্তরোত্তর প্রজ্বলিত হয়ে উভয় পক্ষকে দগ্ধ বিদগ্ধ করে। কাজেই পুরুষ বাক্যবাণে কেউ যেন আহত না হয় তার জন্যে বাক্যে সংযত হতে হবে। সংযত বাক্য ভগ্ন কাঁসার মত নীরব। ক্রোধ তার কাছে পরাভূত। নির্বাণ তার হস্তগত হয়।[৫৯]

ব্যভিচার সমাজে নানা রকম অশান্তির মূল কারণ হতে পারে তা বলা অপেক্ষা থাকে না। ব্যভিচারকারীদের সেই বোধ আর কাজ করে না। ফলে এটি আজ জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সম্যসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে আমাদের এরই মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। এরফলে যে সকল সংকট সৃষ্টি হচ্ছে তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা যদি বুদ্ধের পঞ্চশীলের তৃতীয় শীলের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পায় অবৈধ কামাচার বা ব্যভিচার হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। যদি সেটিই করা সম্ভব হয় তাহলে আর কোনো দণ্ডের প্রয়োজন পড়ে না। যখন তা সম্ভব হয় না তখন আবারও সেই প্রচলিত দণ্ডের দিকে যেতে হয়। কথায় বলে মিথ্যা হলো সকল পাপের জননী। মিথ্যাকথা যদি ব্যক্তিপর্যায় থেকে বন্ধ করা না সম্ভব হয় তাহলে কোনো কিছুই সমাধান করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। মিথ্যা বলা মানুষের একপ্রকার মানসিক রোগের মত। এ

রোগ থেকে যদি মানুষ বের না হয়ে আসতে পারে তাহলে এ সমাজ কাঠামোকে বদলানো সম্ভব নয়। মানুষ তার ব্যক্তি স্বার্থে বা যেকোনো স্বার্থে মিথ্যা বলতেই থাকলে সমাজে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তা থেকে বের আসা বেশ কঠিন। ফলে এটি হতে যে অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্ম হয় তার সমাধানে আমাদের প্রচলিত দণ্ডের দিকে যেতে হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে পঞ্চশীলের চতুর্থ শীলের সাথে প্রচলিত দণ্ডবিধির সম্পর্ক বিদ্যমান। পঞ্চশীলের সর্বশেষ শীল হলো সুরা-মদ (নেশাজাতীয়) দ্রব্য সেবন ও প্রমাদ হতে বিরত থাকার শিক্ষাপদ গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। আমরা দেখতে পায় যে, যদি পঞ্চশীলের পাঁচ নং শীল না মেনে চলার ফলে যে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেগুলো মোকাবেলা করার জন্য আমাদের প্রচলিত দণ্ডবিধানের মুখোমুখি হতে হয়। মুলত পঞ্চশীল সঠিকভাবে না মেনে চলার ফলে এ ধরণের সমস্যার সৃষ্টি হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্তমানে প্রচলিত দণ্ডবিধির প্রয়োগ বন্ধে পঞ্চশীল হতে পারে অন্যতম নিয়ামক শক্তি এটা সহজেই অনুধাবন যোগ্য।

এ জীবন যৌবন, ধন-সম্পত্তি সবই ক্ষণস্থায়ী। অস্থায়ীত্বের আবরণে মৃত্যুরূপী মহাকাল দণ্ডপানি রাখালের মতো আয়ুকে অবিশ্রান্ত তাড়িয়ে যাচ্ছে। তাকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। পাপ কর্মের পরিণাম সম্বন্ধে যে অজ্ঞ সেই মহামূর্খ। এতে তার কর্ম প্রবৃত্তি বেড়ে যায়। দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের সৃষ্ট আগুনে নিজেই দগ্ধ হবার মতো পাপ যন্ত্রণা ভোগ করে। মন থেকে পাপ চিন্তা পরিহার করতে হবে। মনের পবিত্রতাই প্রকৃত মুক্তি। মনকে বাদ দিয়ে নগ্নচর্যা, জটা ধারণ, পঙ্কলেপন, অনশন, ভূমিশয্যা, ধূলি বা ভস্মলেপন, উৎকুটিক চর্যা প্রভৃতি আত্মপীড়নের দ্বারা মুক্তির নিকটেও যাওয়া যায় না। বাহিরের আবরণ তুচ্ছ। প্রকৃত মনুষ্যত্ব অন্তর্নিহিত। সেজন্যে অহিংসক ও শমচারীকে প্রকৃত ধর্মদূত বলা হয়। প্রকৃত ধর্মদূত নিন্দনীয় কাজ এড়িয়ে চলেন। তিনি শ্রদ্ধা, শীল, বীর্য, সমাধি ও ধর্ম বিনিশ্চয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে দুঃখ অপনোদন করেন। সেজন্যে জল সেচকের ইচ্ছানুরূপ জল চালনার মতো অথবা শর নির্মাতার শর ঋজু করার মতো কিংবা সূত্রধরের কাঠ নমিত করার মতো আত্ম শাসনে নিবেদিত সুব্রত ব্যক্তি মুক্তির পথকে অলঙ্কৃত করেন। অর্হত্বমার্গ অলঙ্কৃত হয়ে জীবন সার্থক করেন।

গৃহী বা গৃহী বিনয় সম্পর্কে বুদ্ধের উপদেশ

বৌদ্ধ ধর্মীয় নীতিমালার মধ্যে প্রথমে পালন করতে হয় 'পঞ্চশীল'। গৃহী এবং ভিক্ষু-শ্রামণ উভয়কেই এই শীল পালন করতে হয়। এই পঞ্চশীলকে বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি ও শক্তি বলা হয়। এরকম অনেক রীতি আছে যা শ্রামণ-ভিক্ষু ও গৃহীদের পালন করতে হয়। এই নীতিমালাকে বলা হয় বিনয়। শ্রামণ-ভিক্ষুদের জন্য ভিক্ষু বিনয় আর গৃহীদের জন্য গৃহী বিনয়। শ্রামণ হওয়ার প্রথম উপায় ত্রিশরণ মন্ত্র, দ্বিতীয় দশশীল। দশশীলের মধ্যে পঞ্চশীলও আছে। শ্রামণ থেকে ভিক্ষু ধর্মে দীক্ষার নাম উপসম্পদা[৬০] শ্রামণ বা ভিক্ষুর প্রথম লক্ষ্য সংযম এবং ধ্যান। ভিক্ষুদের জন্য চারটি বিধান হলো : ১. ব্যভিচার করবে না, ২. চুরি করবে না, ৩. জীবহত্যা করবে না, ৪. নিজের মধ্যে দৈবশক্তি আরোপ করবে না।

'গিহী' একটি পালি শব্দ এবং এর বাংলা অর্থ 'গৃহী'। আভিধানিক শব্দের অর্থ গৃহস্থ, গৃহস্থ ব্যক্তি বা সংসারী লোক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্ত্রী পুত্রের সাথে সংসার জীবন যাপন করে।[৬১] বৌদ্ধধর্মে সাধারণত পারিবারিক জীবনে ত্রিশরণ এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত সকল দায়ক-দায়িকা বা উপাসক-উপাসিকাদের গৃহী বলা হয়। বৌদ্ধগৃহী বলতে উন্নত স্তরের মন মানসিকতা সম্পন্ন মানুষদেরকে বোঝায়। সত্য, ধর্ম, অধ্যবসায় ও ত্যাগ এই চার প্রকার ধর্ম যেসকল শ্রদ্ধাবান গৃহীগণ লাভ করেছেন, মরণের পর তাঁরা অপায়-দুঃখ লাভ করবেন না। ইহকাল ত্যাগ করে পরকালে তাদের কোন অনুশোচনা করতে হয় না।[৬২] যাদের কার্যক্রমে পরিবার, সমাজ, সংগঠন ও জাতি সুগঠিত, সুশৃঙখল, উন্নত নীতিবাদ এবং আদর্শ স্থাপনে ভূমিকা রাখে। গৃহী তথা উপাসক-উপাসিকা বলতে বোঝায় যিনি বা যাঁরা শ্রদ্ধাচিত্তে বুদ্ধের ত্রিশরনসহ পঞ্চশীল এবং অষ্টশীল নীতিধর্ম প্রতিপালন এবং অনুসরণ করেন বিশেষতঃ প্রতি সপ্তাহের অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা তিথিতে উপোসথ ব্রত পালনকারী। গৃহীরা সাধারণত দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধধর্মে পঞ্চশীল বা গৃহীশীল পালন করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে গৃহীরা সর্বোচ্চ অষ্টশীল বা উপোসথ পালন করতে পারে। আদর্শ নৈতিক চেতনার দিক থেকে উপাসক ও উপাসিকাদের স্থান অতি উচ্চে। বুদ্ধ নির্দেশিত গৃহী বা উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে মহান গুণাবলীর আদর্শ অনুধ্যান অবশ্যই অপরিহার্য। উপাসক-উপাসিকা মাত্রই সদ্ধর্মের পূজারী, ভক্ত, উদার সহানুভূতিশীল সেবক,

Dhaka University Institutional Repository

মাঙ্গলিক উৎসাহশীল সদ্ধর্মহিতৈষী এবং কল্যাণকামী। যতক্ষন উপরোক্ত আদর্শ নীতিমালার মধ্যে নিজেকে তৈরি অথবা ঐসব গুণাবলী সম্পর্কে জ্ঞানী হতে সক্ষম নন তারা সত্যিকার অর্থে বৌদ্ধগৃহী তথা বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকা হতে পারে না। সাধারণ নারী ও পুরুষের মত ভূমিকায় থাকবেন। অর্থাৎ যে ব্যক্তি অনন্ত গুণ সম্পন্ন বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি বিশ্বাস ও আন্তরিক শ্রদ্ধাসম্পন্ন এবং মহান আদর্শের শরণাপন্ন হন এবং পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাকে বলা হয় আদর্শ গৃহী তথা উপাসক-উপাসিকা। যে ব্যক্তি ত্রিশরণ গ্রহণ করেন ও সম্যকরূপে পঞ্চশীল পালন করেন তার কখনো অধোগতি হয় না। মৃত্যুর পর সেই ব্যক্তি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কারণ আদর্শ নৈতিক চেতনার দিক থেকে উপাসক-উপাসিকাদের স্থান অতি উচ্চে। আর গৃহীরা তিনটি বিষয়ে বেশি কথা বলে, বেশি চিন্তা করে কিংবা এগুলোর জন্য কাজ করে। যেমনঃ চারটি মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসা), দায়িত্ব ও কর্তব্য, দৈনন্দিন বাঁধাধরা কাজ।[৬৩] এছাড়াও সিগালোবাদ সূত্রে গৃহীদের এমন কোন বিষয় নেই যা আলোচনা করা হয়নি।

অতএব ভিক্ষু ছাড়া গৃহীদের বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার জন্য ত্রিশরণ ছাড়া অন্য কোন মন্ত্র নেই। ভিক্ষুদের যে সব নিয়ম আছে তার মধ্যে কতগুলো গৃহীদের পালনীয়। যেমন : প্রাণীহত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ ও সুরাপান থেকে বিরত থাকা। এই পঞ্চনীতির নাম পঞ্চশীল। এগুলো গৃহীদের জন্য বুদ্ধের উপদেশ বা নির্দেশ। এরই নাম গৃহী বিনয়।

গৃহী উপাসক

যে ব্যক্তি নিয়ম-রীতি মেনে চলেন তিনি মানবীয় গুণে গুণান্বিত। মানবীয় আদর্শে উজ্জীবিত ব্যক্তিত্ব যথার্থ নীতিবান উপাসক নামে অভিহিত। তিনি গুণগত মানানুসারে বুদ্ধের ধর্ম বিনয়ের প্রতিভূ পুণ্য পুরুষদেরকে যাচাই বাছাই করে দান দেবেন, পূজা করবেন। সংঘের সুখ-দুঃখের ভাগী হওয়া, সদ্ধর্মকে অখণ্ড রাখার দৃঢ় সংকল্প, লব্ধ সম্পত্তিকে সুচারুরূপে সমান ভাগ করে ভোগ করা, বুদ্ধশাসনে অবিচল থাকা, একে চিরস্থায়ী রাখার জন্য উৎসাহশীল থাকা, অপরের সম্পত্তিতে ঈর্ষা বা লোভ না করা, পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হওয়া, যেই গুণ নিজের ভিতরে বিদ্যমান নেই সেই গুণ অপরের কাছে জাহির না করা, সহনশীলতা ও দয়া দাক্ষিণ্য গুণে ভরপুর থাকা এবং

ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রভৃতি কল্যাণ ধর্মই উপাসকের লক্ষণ। বৌদ্ধ সাহিত্যে উপাসকের লক্ষণ ছাড়াও দশ প্রকার গুণের উল্লেখ আছে :

১. ধর্মকে নিজ অধিপতিরূপে গ্রহণ করেন।
২. যথাশক্তি সংবিভাগরত অর্থাৎ প্রাপ্ত বস্তুর ভাগ অপরকেও দেওয়ার জন্য অনুরাগী হন।
৩. জিন বা বুদ্ধ শাসনের পরিহানি দেখে অভিবৃদ্ধির বা উন্নতির জন্য উদ্যমশীল হন।
৪. সম্যকদর্শী হন, মাঙ্গলিক বস্তু ব্যবহারে কৌতুহল ত্যাগ করেন।
৫. প্রাণ গেলেও অপর শাস্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন না অর্থাৎ অন্য বা ভ্রান্ত ধর্মমত গ্রহণ করেন না।
৬. এ বুদ্ধ শাসনে উপাসক মাত্রেই সংঘের সাথে সুখ-দুঃখে ভাগী হন।
৭. প্রাণী হত্যা, চুরি ও পরদার এ ত্রিবিধ কায়িক অকুশল, মিথ্যা, বৃথা, কটু ও সম্প্রলাপ এ চারি বাচনিক পাপকর্ম থেকে নিজকে রক্ষা করেন।
৮. তিনি ঐক্যে আনন্দ অনুভব করেন এবং ঐক্য বিধানে রত হন।
৯. অসুরাবিহীন হন এবং কুহক বা প্রবঞ্চনা দ্বারা শাসনে বিচরণ করেন না।
১০. বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণাগত হন।[৬৪]

বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষে ধর্মপ্রাণ রাজা বিম্বিসার, রাজা অজাতশত্রু, রাজা প্রসেনজিৎ, কোশল, ধনাঢ্য উদারপ্রাণ অনাথপিণ্ডিক, ঘোষিত শ্রেষ্ঠী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যথার্থ ধার্মিক উপাসকের দৃষ্টান্ত পালন করেছিলেন। তাঁরাই বৌদ্ধধর্মের প্রচার, প্রসার, মহান ভিক্ষুসংঘের অগ্রগতি এবং শাসন সদ্ধর্মের উন্নতি ও রক্ষার জন্য যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

গৃহী উপাসিকা

পারিবারিক বা গৃহস্থ জীবনে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত নারী বা মহিলাকে বলা হয় উপাসিকা। উপাসিকাদের সহায়তায় বুদ্ধ শাসন রক্ষা করা হয়েছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে ভিক্ষুসংঘকে আহার দান ও অন্যান্য সাহায্য দ্বারা পালন করে থাকেন। তারা ভিক্ষুসংঘকে মাতৃতুল্য বাৎসল্য দান করেন। সেবাপরায়ণতা ও যে কোন পুণ্য কার্যে রত থাকার প্রবণতা এবং ত্যাগধর্মীতা স্বভাবতঃ নারী বা উপাসিকাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়ে ভূষিত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সেনানী কন্যা

Dhaka University Institutional Repository

সুজাতা, মৃগার মাতা বিশাখা, শ্যামবতী, উত্তরামাতা, কোলীয় কন্যা সুপ্রবাসা, কাত্যায়িনী ও কালী উপাসিকা প্রভৃতি। আর যে সকল পুরুষ বা উপাসক পুণ্যশীলা উপাসিকাকে ভরণপোষণ, সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেন তারা দেবগণের নমস্য। এ শ্রেণীর উপাসিকাদের প্রতি পাঁচ প্রকার নির্দেশ আছে- যেমন, তাঁদের যথোচিত সম্মান করা, অপমানজনক আচরণ বা ব্যবহার না করা, ব্যভিচার না করা, ঐশ্বর্য ও অলংকারাদি দান করা। এ প্রসঙ্গে কোশলরাজ প্রসেনজিতের পাটরাণী উপাসিকা মল্লিকাদেবীর দশ প্রকার আদর্শ ব্রত প্রণিধানযোগ্য :

১. আমি কখনও আদর্শব্রত ভঙ্গ করব না।
২. আমি বয়োবৃদ্ধগণকে সদা সম্মান করব।
৩. আমি কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হব না।
৪. আমি কায় বাক্য মনোকর্মে স্বার্থপরায়ণতা ত্যাগ করব।
৫. আমি কারো প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হব না।
৬. নিজের ধনের অংশ পরহিতার্থে বন্টন করব।
৭. সকলের সাথে নম্র ব্যবহার করব, দীন-দুঃখীদের সাহায্যের জন্য যত্নবান হব। নিজের সুখের চাইতে পরে যাতে সুখী হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখব এবং পক্ষপাত বিহীন হয়ে অপরের সাহায্য করব।
৮. দুঃখে সান্ত্বনা ও রোগে সেবা দ্বারা সাধ্যমত সকলকে সাহায্য করব।
৯. উশৃঙ্খল ব্যক্তিকে সাধ্যমত সুপথে আনার চেষ্টা করব এবং অশান্ত মানুষকে শান্ত করার চেষ্টা করব।
১০. আমি সদ্‌পদেশ শুনতে অবহেলা করব না। কেননা সদুপদেশই মানুষকে শান্ত পথে চালনা করে।

পুণ্যশীলা উপাসিকাগণ নিজের কৃত পুণ্যের ফলে পরমানন্দ লাভ করে থাকেন। উত্তরা উপাসিকার নিম্নোক্ত বাণীই এর জ্বলন্ত প্রমাণ : "আমি নিজে শীল ও দানের দ্বারা যশস্বিনী তথা নিজের পুণ্যের প্রভাবে মনে প্রাণে সুখী হয়েছে।" উপাসিকা সুন্দরী পরিব্রাজিকা বলেছেন, যে আমি আমার অনাবিল শ্রদ্ধা ভগবান বুদ্ধের কাছে নিবেদন করে বলেছিলেন 'আমি একটি মাত্র ফুল বুদ্ধের চরণে

অর্পণ করে কল্প কোটি পর্যন্ত দুর্গতি কি জিনিস জানি না।' বুদ্ধ ও ভিক্ষুসংঘের হিতোপদেশে উপাসিকাগণ জীবন সত্য উপলব্ধির জন্য আধ্যাত্মিক ধ্যান সাধনায় রত হয়ে চারিমার্গ ও চারিফলজ্ঞান স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অরহত্ব ফলাদি লাভ করতে পারেন। উপাসিকাদের মধ্যে বিশাখা ষোল বছর বয়সে স্রোতাপন্ন উপাসিকা নামে খ্যাত ছিলেন।[৬৫]

সুতরাং বলা যায় যে, পুণ্যবান ও শীলবান উপাসক-উপাসিকা ইহ জীবনে সুখে প্রসন্ন চিত্তে থাকেন এবং কৃত পুণ্যের ফলে পরবর্তী জন্মে সুখ ও আনন্দময় জীবন যাপন করেন। পুণ্যকর্মে রত শীলবান ও ধার্মিক উপাসক ও উপাসিকাকে দেবরাজ ইন্দ্রও সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন।

গৃহীদের নিত্যকর্ম

জগতের সকল বস্তুই কোন না কোন নিয়ম, শৃঙ্খলা দ্বারা পরিচালিত হয়। বিশ্বজগত নিয়ম শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। নিয়ম ব্যতীত কোনো কিছুই সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হওয়া সম্ভব না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও নিয়ম শৃঙ্খলার উপযোগিতা অত্যাধিক। নিম্নে বর্ণিত নিয়মগুলো গৃহীদের দৈনন্দিন জীবন যাপন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য অপরিহার্য। যথা :

পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া

প্রাণিহত্যা করবে না এবং তার কারণও হবে না। তা দেখে মনে আনন্দও আনবে না। চৌর্যচিত্ত হতে বিরত থাকবে। এমনকি চুরির কাজে কাউকে নিয়োজিত বা সাহায্য করবে না। সম্মত হোক অথবা অসম্মত হোক পর স্ত্রী, কন্যা ও পুরুষের সাথে কামসেবন করবে না। প্রাণান্তে মিথ্যা কথা বলবে না। কেননা মিথ্যা হলো সকল পাপের জননী। সুরা-গাঁজা, অহিফেন, ভাঙ, চরস ইত্যাদি সব রকম নেশাদ্রব্য সেবন হতে বিরত থাকবে। এগুলো পান করলে সমাজের মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। নেশাগ্রস্ত হয়ে তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, ফলে তারা কোন অন্যায় করতে দ্বিধা করে না। পঞ্চশীলের মধ্যে বুদ্ধ মূলত গৃহীদের সব রকম পালনীয় বিষয়গুলো একত্রিত করেছেন।[৬৬]

বাক্যালাপ ও বিচারকার্য

শ্রুতিকটু, পরিহাস ও বিদ্রুপ বাক্য বলবে না। পক্ষাবলম্বন করে কাউকে পরিহাস করা যাবে না। অন্যায় পক্ষ নিয়ে কোন বিচার কাজ করবে না। প্রতিহিংসাবশতঃ কারও ক্ষতি করবে না। কারও ভয়ে ভীত হয়ে অন্যের কোন প্রকার অনিষ্ট সাধন করবে না। ভুলেও কোন প্রকারে পাপ কাজ করা যাবে না।[৬৭] কাকেও কর্কশ বাক্য বলবে না, যাকে বলবে প্রত্যুত্তরে সেও কর্কশ বাক্য বলতে পারে। ক্রোধপূর্ণ বাক্য দুঃখদায়ক। দণ্ডের প্রতিদণ্ড তোমাকেও ভোগ করতে হবে।[৬৮] ধম্মপদ এ উল্লেখ আছে, অসত্যবাদী নরকে যায় এবং যে অন্যায় করিয়া 'আমি করি নাই' বলে, সেও নরকে গমন করে; এই উভয় হীনকর্মা মানুষই পরলোকে সমগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।[৬৯]

কর্মপথ বর্গে উল্লেখ আছে, নিজে কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত থাকার উৎসাহিত করে, কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হওয়ার সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং কর্কশবাক্য ভাষণ হতে বিরত হওয়ার গুণ ভাষণ করে এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে।[৭০]

দ্যূত ক্রীড়ার দোষ ও আলস্যপরায়ণতা

রাত্রে পথে-ঘাঠে বিচরণ ও মজা-মজিলিসে যোগ দিবে না। তাস, পাশা ও জুয়াজাতীয় যত প্রকার ক্রীড়া আছে তা ত্যাগ করতে হবে। ধূর্ত, চরিত্রহীন, নেশাখোর, জুয়াচোর, প্রবঞ্চক ও ডাকাত প্রভৃতি পাপীদের সাথে মেলামেশা করবে না। যদি ভালো বন্ধু না থাকে তবে অবসর সময়ে সৎগ্রন্থ পাঠ করবে। এখন অতি শীত, অতি গ্রীষ্ম, অতি সকাল, অতি সন্ধ্যা, অতি ক্ষুধার্ত, অতি রাত্র ইত্যাদি ভেবে করণীয় কাজ অসম্পূর্ণ রাখবে না। অলসতার দ্বারা অনুৎপন্ন ধন উৎপন্ন হয় না বরং সঞ্চিত ধন বিনষ্ট হয়ে যায়। ভোরে শয্যা ত্যাগ করবে। দুপুরে আধ ঘন্টার বেশি ঘুমাবে না।[৭১] যে অলস ব্যক্তি অধিকভোজী, খাদ্যপুষ্ট স্থূল বরাহের ন্যায় নিদ্রালু ও পার্শ্বপরিবর্তনপূর্বক শয়নশীল হয়, সে মন্দবুদ্ধি বার বার মাতৃজঠরে জন্মগ্রহণ করে।[৭২]

সখ্য স্থাপনে দায়িত্বশীলতা

কৃপনতা ত্যাগ করে মিতব্যয়ী হবে। নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানসম্পূর্ণ লোকদের সাথে মেলা-মেশা করবে। তাঁদের অভাবে সমশ্রেণী লোকের সাথে মিশবে। অজ্ঞানীকে উপদেশ দিয়ে জ্ঞানবান ও ধার্মিক করার চেষ্টা করাও মহাপূণ্যের কাজ। চোর, বাক্যবীর, চাটুকার ও অপকর্মে সাহায্যকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করা পাপ। তাদের মিত্ররূপী শত্রু বলে জানবে। অতীতের ভোগ সম্পত্তির অহংকার ও ভবিষ্যৎ-সমৃদ্ধি দেখিয়ে দম্ভ করিবে না। অনর্থক অতিরিক্ত কথা বলা দোষের। বর্তমান কাজে ভয় করবে না এবং অপরকেও ভয় দেখাবে না। অকুশল কাজে অসম্মতি প্রদান ও কল্যাণকর কাজে সম্মতি প্রদান করবে। বন্ধুকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে ও কল্যাণকর কাজে নিয়োজিত করবে, যে সব ভাল কথা বা ধর্ম কথা শোনেনি তা শোনাবে এবং স্বর্গে গমনের রাস্তা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করবে। বন্ধুর অধঃপতন দেখে উৎফুল্ল হবে না। বন্ধুর উন্নতিতে আনন্দ অনুভব করবে। কেউ বন্ধু বা গুরুজনের নিন্দা করলে তার প্রতিবাদ করবে এবং সুখ্যাতি করলে প্রশংসা করবে।[৭৩]

পরার্থপরতা ও ন্যায়-অন্যায়বোধে দায়িত্বজ্ঞান

সব সময় পরের উপকার করার চেষ্টা করবে। সর্বজীবের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হবে। সৎ উপদেশ দিবে এবং ভাল কাজে সাহায্য করবে। কেউ ভয় পেলে তাকে আশ্রয় দিবে। তার উপস্থিত কাজে সফলতা অর্জনে সহায়তা করবে। বন্ধুন গোপণীয় বিষয় সাবধানে গোপন রাখবে। আপদে-বিপদে বন্ধুকে ত্যাগ করবে না। দৈনিক বা মাসিক আয়কে চার ভাগ করবে। এক ভাগ জীবিকা নির্বাহ, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাগ নিজের ও পরিবারের কাজকর্মে প্রয়োগ করবে এবং চতুর্থ ভাগ যে কোন আপদ বিপদের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে।[৭৪]

পূর্বদিকরূপী মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও দানধর্ম

পিতামাতা কর্তৃক সযত্নে লালিত পালিত বলে বৃদ্ধ ও অসহায় অবস্থায় তাঁদের ভরণপোষণ নির্বাহ করবে। নিজের কাজ রেখে পূর্বে তাঁদের কাজ শেষ করবে। বংশের আচার ও মর্যাদা রক্ষা করবে। তাঁদের উপদেশে থেকে তাঁদের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে এবং পূর্ব পুরুষদের জন্য দানধর্ম করবে। সন্তানদের পাপ কাজ থেকে বিরত এবং কল্যাণকর কাজে নিয়োগ করবে। অর্থকরী ও

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মকরী বিদ্যা শেখাবে। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত পাত্রপাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেবে। যথাসময়ে বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করবে।[৭৫] সুত্তনিপাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, মাতাপিতার সেবা, স্ত্রী-পুত্রের সযত্নে প্রতিপালন এবং শান্তিপূর্ণ জীবিকা, ইহাই সর্বোত্তম মঙ্গল।[৭৬] যদি কোন ব্যক্তি বিদ্যার্জন করে মাতাপিতাকে মিথ্যাদৃষ্টি হতে উদ্ধার করে সদুপদেশ প্রদান করে সৎ ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন এবং আত্মত্যাগের দ্বারা মাতাপিতার অন্ত:করণে জ্ঞান রূপ শিখা উদ্দীপ্ত করতে সক্ষম হয় তবেই তাঁর দ্বারা মাতৃ-পিতৃ ঋণ পরিশোধ করা সম্ভব। তিনি জগতে যথার্থ সৎপুত্ররূপে পরিগণিত হয়।[৭৭] সব্রক্ষক সূত্রে উল্লেখ আছে, মাতাপিতা ব্রহ্ম এবং পূর্বাচার্য বা আদি গুরু বলে অভিহিত। তাঁরা পুত্র-কন্যাদের সেবা লাভের যোগ্য, কারণ তাঁরা পুত্র-কন্যার প্রতি অনুকম্পাশীল। তদ্ধেতু তারা মাতাপিতাকে নমস্কার ও পূজা-সৎকার করবে। পণ্ডিত পুত্র কন্যাগণ অন্ন, পানীয়, বস্ত্র, শয্যা প্রদান, শরীর মার্জন, স্নান ও পাদধৌতকরণ প্রভৃতি দ্বারা মাতাপিতার সেবা করে থাকে। মাতাপিতার প্রতি এসব কর্তব্য পালনের জন্য তারা ইহজীবনে প্রশংসা লাভ করে থাকে এবং পরলোকে স্বর্গে প্রমোদিত হয়।[৭৮]

দক্ষিণ দিকরূপী আচার্য বা শিক্ষকের প্রতি দায়িত্ব

শিক্ষক বা গুরুজনের সম্মুখীন হলে আসন হতে উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান জানাবে। তাঁদের দিনে তিনবার বন্দনা করবে। তাঁদেও সেবা ও আদেশ পালন করবে। মনোযোগ সহকারে তাঁদের উপদেশ শ্রবন ও বিদ্যাভ্যাস করবে। শিক্ষকতা করলে ভদ্র চালচলন শিক্ষা ও শিক্ষার খুঁটিনাটি বিষয় শিক্ষা দিবে। কোনটা পড়া উচিত আর কোনটা পড়া অনুচিত তা বলে দিবে। ছাত্রের আত্মীয়-স্বজনের কাছে তার প্রশংসাযোগ্য বিষয়ে প্রশংসা করবে। আপদ-বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করবে।[৭৯]

স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের প্রতি কর্তব্য পালন

স্ত্রীর সাথে সম্মানজনক ও ভদ্র বাক্য ব্যবহার করবে। তাদের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগী হবে। সাধ্যমত কাপড় ও অলংকার দেবে। স্ত্রীও সুচারুরূপে গৃহের কাজ সম্পাদন করবে, স্বামীর মিত্র-পরিজন ও অথিতিদের যথাসাধ্য আপ্যায়ন করবে। স্বামীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি রাখবে। স্বামীর বিষয়

Dhaka University Institutional Repository

সম্পত্তির অপচয় করবে না। সকল কাজ সুদক্ষা ও আলস্যহীন হবে। স্বামীর পরে শয়ন করবে এবং পূর্বে শয্যা ত্যাগ করবে। উভয়কে সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতে হবে।[৮০]

উত্তর দিকরূপী আত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন

আত্মীয় স্বজনকে প্রয়োজনমত সাহায্য করবে। তাদের সাথে সহৃদয়তা দেখাবে, প্রগাঢ় সহানুভূতি প্রদর্শন ও ভাল ব্যবহার করবে। তাদের বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করবে। ভীত হলে তাকে অভয় দেবে। আপদে-বিপদে সঙ্গ ত্যাগ করবে না। মাঙ্গলিক কাজ ও উৎসবে নিমন্ত্রণ করবে।[৮১]

অধোদিকরূপী কর্মচারীদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন

কর্মচারীদের শক্তি অনুযায়ী তাদের কাজের ভার প্রদান করবে এবং উপযুক্ত আহার ও পারিশ্রমিক দিবে। রোগের সময় সেবা করবে। উত্তম খাদ্য-ভোজ্য হলে ভাগ দিবে। মাঝে মধ্যে অবসর দিবে। কর্মচারীগণ প্রত্যহ গৃহস্বামীর পূর্বেই শয্যা ত্যাগ করবে এবং রাতে পরেই শয়ন করবে। প্রভুর অজ্ঞাতসারে কিছুই আত্মসাৎ করবে না, তার কাজ ভালভাবে করবে। সর্বসাধারণের নিকট তার সুখ্যাতি ও সম্মানজনক বাক্য বলবে।[৮২]

উর্ধ্বদিকরূপী ভিক্ষুসংঘের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি

ভিক্ষুসংঘকে ভক্তিসহকারে সেবা-পূজা ও অন্ন-বস্ত্র দান করবে এবং অবসর সময়ে ধর্মশ্রবণ ও ধর্মালোচনা করবে। অপরকেও ধর্ম কথা শ্রবণে উৎসাহিত করবে। সর্বদা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তাঁদের হিতাকাঙ্ক্ষী হবে। যেহেতু ভিক্ষুসংঘ দায়ক-দায়িকাদের পাপ কাজ হতে বিরত রাখেন, ভাল কাজে নিয়োজিত করেন, মঙ্গল কামনা করেন, যেসব ধর্মকথা শোনেনি তা শোনাবেন, ভূল বিষয় সংশোধন করে দেন এবং সুগতি লাভের উপায় দেখিয়ে দেন।[৮৩] এছাড়াও গৌরবনীয় ব্যক্তির প্রতি গৌরব করা, তাঁদের প্রতি বিনয় প্রদর্শন করা, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকা, উপকারীর উপকার স্বীকার করা ও যথাসময়ে ধর্মশ্রবন করা উত্তম।[৮৪]

গৃহীদের ইহজীবনের শিক্ষণীয় উপদেশ

ভগবান বুদ্ধ গৃহীদের ইহজীবনে সুখ-সমৃদ্ধিকারী এবং পরজীবনের শান্তিদায়ক কিছু শিক্ষণীয় বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। ব্যগ্‌ঘপজ্জ[৮৫] সূত্রে তা উল্লেখ আছে। নিম্নে গৃহীর ইহজীবনে মঙ্গলজনক ও সুখকর শিক্ষণীয় চারটি বিধান উল্লেখ করা হলো:-

১. উৎসাহ;

২. সংরক্ষণ;

৩. সৎলোকের সংশ্রব বা সঙ্গলাভ এবং

৪. শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন।

উৎসাহ

গৃহীদের গার্হস্থ্য জীবন যাপন করতে হলে কৃষি-বাণিজ্য, গো-পালন, সৈনিকের কাজ, রাজকর্ম কিংবা যে কাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবে, পরিশ্রমী এবং উপায়কুশল হতে হবে এবং যে কাজ যে প্রণালীতে করা প্রয়োজন, সে প্রণালীতে তা সম্পন্ন হয়েছে কিনা তারও সন্ধান নেওয়া দরকার। একে উন্নত গার্হস্থ্য জীবন যাপনের উৎসাহ বলা হয়।[৮৬]

সংরক্ষণ

যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় কঠোর শ্রমে, কষ্টে ও উদ্যমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ধর্মত প্রভূত ধন-সম্পত্তির মালিক হয় এবং তার সেই অর্জিত সম্পত্তি রক্ষার জন্য তাকে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হয়। সে এরূপ চিন্তা করে- “আমার শ্রমলব্ধ ধন কিভাবে সুরক্ষিত করা যায়, অন্যায়ভাবে কেউ যাতে হস্তক্ষেপ করতে না পারে, চোরে যেন হরণ না করে, আগুনে যেন পুড়ে না যায়, বন্যায় যাতে ভেসে না যায় কিংবা ঈর্ষাপরায়ণ জাতি যাতে ক্ষতি করতে না পারে সেভাবে রক্ষা করতে হবে।” এভাবে আপন সম্পত্তি রক্ষার যে প্রচেষ্টা তাকে সংরক্ষণ বলে।[৮৭] কুল সূত্রে বলা হয়েছে, যে গৃহী বিনষ্ট অন্বেষণ করে, জীর্ণ সংস্কার করে, পরিমিত ভোজনকারী হয় এবং শীলবান স্ত্রী বা পুরুষকে উচ্চ পদমর্যাদায় নিয়োগ করে। এই চারটি কারণে তাদের ভোগসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না। তারা মহাভোগ প্রাপ্ত এবং ভোগ চিরস্থায়ী হয়।[৮৮]

Dhaka University Institutional Repository

সৎলোকের সংশ্রব বা সঙ্গলাভ

কোন একজন গৃহী এক গ্রামে বাস করে। সে গ্রামে আরও শ্রদ্ধবান, পুণ্যবান, দানশীল ও প্রজ্ঞাবান গৃহপতি বাস করে। সে এরূপ প্রতিবেশী সৎলোকের সাথে সর্বদা দেখা করে ও আলাপ-আলোচনা করে। এরূপ সৎলোকের সঙ্গলাভে সেও শ্রদ্ধাবান, শীলবান, দাতা ও জ্ঞানী হয়। সে কারণে সৎলোকের সংশ্রবে আসলে মানব জীবনের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। একে সৎলোকের সংশ্রব বলে।[৮৯] যে ব্যক্তি কাউকে হিংসা না করে সকলের প্রতি মৈত্রী প্রদর্শন করে নিজের মত জ্ঞান করেন, যিনি অত্যন্ত বিনয়ী, ক্ষমাশীল, অপ্রতিবাদী, তিনি সুখী হন। যিনি বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠীদের বিদ্যা, কুল ধন ও জাতির অহংকার না করেন কিংবা অবজ্ঞা না করেন, অথচ প্রজ্ঞার দ্বারা সুন্দর বিচার করতে সমর্থ, তিনি সুখী হন। যার মিত্রগণ সৎলোক, বিশ্বস্ত, অহিংসাবাদী, মিত্রদ্রোহী নন ও প্রয়োজনে সাহায্য করেন, তিনি মিত্রগণ থেকে সুখ পেয়ে থাকেন।[৯০] ধম্মপদে উল্লেখ আছে, যে সকল মুনি অহিংসাপরায়ণ এবং সতত কায়-সংযত, তাঁহারা এমন অচ্যুত স্থানে (নির্বাণে) গমন করেন, যেখানে গিয়ে শোক করতে হয় না।[৯১] হিংসাচিত্ত সূত্রে উল্লেখ আছে, চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে ; নিজে অহিংসাত্মক চিত্তসম্পন্ন হয়, অপরকেও অহিংসাত্মক চিত্তসম্পন্ন হওয়ার জন্য উৎসাহিত করে, অহিংসাপরায়ণের প্রতি সম্মতি প্রদানকারী হয় ও অহিংসাপরায়ণের গুণ ভাষণ করে।[৯২]

ক্রোধপরায়ণ সূত্রে বলা হয়েছে, কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ক্রোধপরায়ণ হয় না, কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে পরনিন্দাপরায়ণ হয় না, কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে লাভ প্রত্যাশী হয় না, কেউ সত্যধর্মের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে সৎকার প্রত্যাশী হয় না।[৯৩]

শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন

একজন গৃহস্থকে তার সংসারের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝে সংসার পরিচালনা করতে হয়। অথচ সে কৃপণও নয়, অমিতব্যয়ীও নয় অর্থাৎ মিতব্যয়ী, আয়-ব্যয়ের পরিমাণ অনুযায়ী খরচ করে তাকে ব্যয়ের চেয়ে অধিক আয় করার জন্য সর্তক থাকতে হয়। যেমন - দোকানদার পাল্লাকে কিভাবে ধরলে কোনদিকে ওজন বেশি হবে জানতে পারে ঠিক সেভাবেই গৃহস্থদের আয়-ব্যয় সম্বন্ধে জ্ঞান

থাকা উচিত। আর যেসব গৃহী নিজের আয়-ব্যয়ের পরিমাণ বুঝে না, সে গৃহস্থালীতে কিছুতে উন্নতি করতে পারে না এবং সংসার জীবনে প্রতিটি পদে বিপদগ্রস্থ হতে হয়। আবার প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হয়েও যে ব্যক্তি দানকর্মে কৃপণতা প্রদর্শন করে, তার জীবনে কোন সার্থকতা নেই। তার দ্বারা মঙ্গলজনক কোন কাজ সম্পাদন করা হয় না। আয়-ব্যয়ের মাত্রা বুঝে সংসার নির্বাহ করলে তার গার্হস্থ্যজীবন সুখের ও সুন্দর হয়। এরূপ জীবনযাত্রা নির্বাহ করাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবন যাপন বলে।[৯৪]

সম্পত্তি বিনষ্ট হওয়ার কারণ

বহুকষ্টে, বহুশ্রমে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে অদম্য উৎসাহে সঞ্চিত সম্পত্তি চারটি কারণে বিনষ্ট হয়। তা হলো- পতিতাসক্তি, মদ্যপানাসক্তি, জুয়াখেলা বা দ্যূতক্রীড়াসক্তি ও দুঃশীল বা কুলোকের সাথে মিত্রতা। যেমন- একটি পুকুরে জল প্রবেশের চারটি পথ ও জল বাহির হবার চারটি পথ আছে। কেউ যদি পুকুরে জল প্রবেশের পথ বন্ধ করে বাহির হবার পথ খুলে দেয়, তবে পুকুর অচিরে শুকিয়ে যাবে। সেরূপ ধনক্ষয়ের চারটি পথ স্বরূপ পতিতা, মদ, জুয়া ও কুসঙ্গী ত্যাগ না করলে ধনবৃদ্ধির কোন প্রকার সম্ভাবনা নাই বরঞ্চ সঞ্চিত ধন অচিরে নিঃশেষ হয়ে যায়। সেজন্য- প্রতিতার প্রতি অনাসক্তি, মদ্যপান বিরতি, জুয়াখেলা বিরতি, কুসঙ্গীর সংশ্রব ত্যাগ করা প্রয়োজন। এই চারটি উপায়ে গার্হস্থ্য জীবনে ইহলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়।[৯৫]

গৃহীর পরকালের সুখ-সমৃদ্ধি বিষয়ক শিক্ষা

চারটি বিষয়ে গৃহী পারলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যথা ঃ-

১. শ্রদ্ধাগুণ

২. শীলগুণ

৩. দানগুণ

৪. প্রজ্ঞাগুণ।

শ্রদ্ধাগুণ

কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করার নামান্তরই শ্রদ্ধা। অর্থাৎ শীলবানকে দর্শনের ইচ্ছা, সদ্ধর্ম্ম শ্রবণের ইচ্ছা ও মাৎসর্য্য ময়লা ত্যাগের ইচ্ছা হয় তাকে শ্রদ্ধাবান বলে।[৯৬] শ্রদ্ধার লক্ষণ হলো প্রসন্নতা উৎপাদন ও অগ্রগতি সাধন। শ্রদ্ধা উৎপন্ন হলে পঞ্চনীবরণ ক্ষীণ হয়ে যায়। পঞ্চনীবরণ প্রহীন চিত্ত কলুষ বিহীন, নির্মল ও সুপ্রসন্ন হয়। ইহাই শ্রদ্ধার প্রসন্নতা উৎপাদন লক্ষণ। আর শ্রদ্ধার অগ্রগতি সাধন হলো যোগী অন্যের চিত্ত পাপমুক্ত দেখে স্রোতাপত্তি, সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হৎফল প্রাপ্তির জন্য উদ্যোগ করেন। অপ্রাপ্ত বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রচেষ্টা করেন। অনধিগত বিষয় অধিগত হওয়ার জন্য সাধনা করেন। সাক্ষাৎকৃত বিষয় সাক্ষাৎ করার জন্য পুনঃ পুনঃ উদ্যম করেন। ইহাই শ্রদ্ধার অগ্রগতি লক্ষণ।[৯৭] শ্রদ্ধাসম্পন্ন গৃহী বুদ্ধের প্রতি আস্থাবান হয়ে বলে, "বুদ্ধ অর্হৎ, সম্যক সম্বুদ্ধ, বিদ্যাচরণ সম্পন্ন, সুগত, লোকবিধ, সর্বশ্রেষ্ঠ, অদম্য পুরুষের দমনকারী সারথি এবং নর-দেব-ব্রহ্মাদি দেব-মানবের শিক্ষক ও শাসক।" এই দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণাকেই 'শ্রদ্ধাগুণ' বলে।[৯৮]

শীলগুণ

শীল হলো সব রকম শিষ্টাচারের বিধান। যেসব নিয়ম পালন করলে চরিত্র শুদ্ধ ও দৃঢ় হয় তাকেই শীল বলা হয়। যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ মানুষকে নির্বাণের দিকে নিয়ে যায়, সেগুলোর মধ্যে সম্যক বাক্য, কর্ম ও জীবিকা এই তিনটিকেও শীল বলে। প্রাণিহত্যা, চুরি, পরদার লঙ্ঘন, মিথ্যা-পিশুন-পরুষ-সম্প্রলাপ ভাষণ ও সুরা-গাঁজা-অহিফেনাদি যে কোন নেশাদ্রব্য সেবন হতে বিরত হওয়াকে 'শীলগুণ' বলে। শীলের লক্ষণ প্রতিষ্ঠা। পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ, চর্তুবিধ নির্বাণমার্গ, চারি সম্যক প্রধান, চারি স্মৃত্যুপ্রস্থান, চারি ঋদ্ধিপাদ ইত্যাদি কুশলধর্ম সমূহের প্রতিষ্ঠাই শীল।[৯৯] শীল সাধনা দ্বারা যখন চিত্ত পরিশোধিত হয়ে যায় তখনই সর্ব জীবের প্রতি যথার্থ মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। এই সমস্ত পাপ কর্ম হতে বিরত না হলে মানবতার বিকাশ আদৌ সম্ভব নয়। এই কারণে মানবতার অগ্রগতির জন্য কার্যকরী পন্থা রূপে পঞ্চশীল প্রত্যেকেরই অবশ্য অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক কর্তব্য। শীল বা সদাচারকে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তি বা সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না।[১০০]

দানগুণ

“দীযতী’তি দানং” অর্থাৎ যা দেয় তাই দান বা দানীয় দ্রব্য। ‘রত্ন মেঘ’ নামক মহাযান সূত্রে উক্ত হয়েছে, “দানং হি বোধি সত্ত্বস্য বোধিঃ।” বোধিসত্ত্বের বোধি দানেই প্রতিষ্ঠিত। যার যে বস্তুর প্রয়োজন কোনও শোক না করে তাকে সে বস্তু প্রদান করব, বোধিসত্ত্বকে এরূপ সংকল্প গ্রহণ করতে হয়। দান দেওয়ার পূর্বে তিনটি বিষয় জেনে রাখা উচিত। যথা- ১। বত্থুসম্পত্তি-বস্তু সম্বন্ধে বিচার, ২। চিত্তসম্পত্তি-চিত্তের হীন-শ্রেষ্ঠ চেতনাই কুশলাকুশল কর্ম, ৩। পটিগ্গাহকসম্পত্তি-প্রতিগ্রাহক বা যারা দান গ্রহণ করবে, তাদের পূত চরিত্রের উপর দানফল শ্রীবৃদ্ধির কারণ নির্ভর করে।[১০১] কৃপনতা ত্যাগ করে যথাশক্তি দান করা এবং তাতে প্রীতি অনুভব করা, ভিক্ষুসংঘ, পথিক, যাচক ও দীন-দুঃখী এমনকি পশু পক্ষীদেরকেও যথাশক্তি দান দিয়ে উপকার করা, ইহাকে ‘দানগুণ’ বলে। মানুষ স্বভাবত স্বার্থপর, দানের অনুশীলন দ্বারা তার স্বার্থ বুদ্ধি দূর হয় এবং আত্ম প্রসার সাধিত হয়। সর্ব জীবের নিমিত্ত সকল বস্তু দান বা ত্যাগ করা এবং তৎসঙ্গে দান ফলও ত্যাগ করা। নির্বাণ লাভ করতে হলে সর্বস্ব ত্যাগ করতে হয়। আমার মন নির্বাণ-কামী; অতএব সমস্তই যখন আমাকে ত্যাগ করে যেতে হবে, তখন তা প্রাণীগণকে দান করাই শ্রেয়।[১০২]

প্রজ্ঞাগুণ

প্রজ্ঞা অর্থ জ্ঞান, সম্যক জ্ঞান, পূর্ণজ্ঞান, বিশেষ বিভাজনীয় জ্ঞান, পরিজ্ঞান। প্রজ্ঞা হলো প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সাথে সর্বপ্রকার উচ্চস্তরের কার্যক্ষমতা অথবা মনোবৃত্তির অন্তর্গত বিষয়।[১০৩] প্রজ্ঞার মাধ্যমেই সত্ত্বা তার স্ব-অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞাত হয়, এর মাধ্যমেই তার লক্ষ্য মার্গ নির্ণিত হয় এবং এর মাধ্যমেই পরম শান্তি বা নির্বাণ লাভ হয়। বোধিচর্যাবতারে এরূপ চিত্তানুভূতিকে শূন্যতা অবস্থা বলা হয়েছে। যা আচার্য নাগার্জুনে মাধ্যমিক কারিকায়ও প্রকাশ পেয়েছে।[১০৪] সংস্কারের অনিত্যতা উপলব্ধি অর্থাৎ জগতের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি ও বিনাশের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্বন্ধে সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করে দুঃখ হতে মুক্তির চেষ্টা করাকে প্রজ্ঞাগুণ বলে।

Dhaka University Institutional Repository

চার প্রকার গৃহী ও গৃহীপত্নীর মিলন

মিলন বলতে অন্তরের মিল বা ঐক্যকে বোঝানো হয়। শেষান্তে গৃহী ও গৃহীপত্নীর মিলন সাধন হয়েছে। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মানুষকে মিলেমিশে জীবন-যাপন করতে হয়। জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ জীবনের সকল পর্যায়ে একজন আর একজনের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ভগবান বুদ্ধ মধুরা[১০৫] এবং বৈরঞ্জের[১০৬] মধ্যবর্তী দীর্ঘ রাস্তা দিয়ে গমন করছিলেন। বহু গৃহপতি, গৃহপত্নীও সে পথে গমন করছিলেন। কিছুক্ষণ পর ভগবান পথপার্শ্বস্থ কোনো এক বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হলেন। গৃহপতি, গৃহপত্নীগণ ভগবানকে বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট অবস্থায় দেখতে পেয়ে ভগবানের কাছে উপস্থিত হয়ে অভিবাদনপূর্বক একপার্শ্বে উপবেশন করল। ভগবান তাদেরকে এরূপ বললেন, হে গৃহপতিগণ, গৃহীদের মিলন চার প্রকার। সেই চার প্রকার কী কী? যথা :

১. অসুরের সাথে অসুরীর মিলন,
২. অসুরের সাথে দেবীর মিলন,
৩. দেবের সাথে অসুরীর মিলন এবং
৪. দেবের সাথে দেবীর মিলন।

অসুরের সাথে অসুরীর মিলন

এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে ; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহেঅবস্থান করে, শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষন করে, মদ্যপান করে ; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যশল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে ; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল অসুরের সাথে অসুরীর মিলন।[১০৭]

অসুরের সাথে দেবীর মিলন

এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রত হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে ; দুঃশীল, পাপধর্মপরায়ণ হয় এবং মাৎসর্যমল চিত্তে গৃহেঅবস্থান করে, শ্রমণ-

ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রতা হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষন করে না, মদ্যপান করে না ; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যশল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে ; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি হল অসুরের সাথে দেবীর মিলন।[১০৮]

দেবের সাথে অসুরীর মিলন

এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না ; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে ; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। কিন্তু তার স্ত্রী প্রাণিহত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচারে রতা হয়, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে, মদ্যপান করে ; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যশল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে ; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের তিরস্কারকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে অসুরীর মিলন।[১০৯]

দেবের সাথে দেবীর মিলন

এ জগতে কোনো স্বামী প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রত হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষণ করে না, মদ্যপান করে না ; সুশীল, সদ্ধর্মপরায়ণ এবং মাৎসর্যমলবিহীন চিত্তে গৃহে অবস্থান করে ; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারী হয়। তার স্ত্রীও প্রাণিহত্যা করে না, চুরি করে না, ব্যভিচারে রতা হয় না, মিথ্যাবাক্য ভাষন করে না, মদ্যপান করে না ; দুঃশীলা, পাপধর্মপরায়ণা হয় এবং মাৎসর্যশল চিত্তে গৃহে অবস্থান করে ; শ্রমণ-ব্রাহ্মণগণের প্রশংসাকারিণী হয়। এটি হল দেবের সাথে দেবীর মিলন।[১১০]

গৃহপতি, এগুলো (হচ্ছে) চার প্রকার মিলন।”
“স্বামী স্ত্রী উভয়ের হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী,
সেই মিলনকে বলা হয় অসুর-অসুরী।
স্বামী হলে দুঃশীল, কদর্যভাষী ভীষণ,
স্ত্রী মিষ্টভাষী, শীলবতী আর মাৎসর্যহীন।
এটাকে বলে অসুরের সনে দেবীর মিলন,

স্বামী হলে শীলবান, মিষ্টভাষী, মাৎসর্যহীন।
স্ত্রী হলে কদর্যভাষিণী আর দুঃশীলা ভীষণ,
এটাকে বলে অসুরীর সনে দেবের মিলন।
উভয়ে শ্রদ্ধাশীল, মিষ্টভাষী, সংযত ধার্মিক,
দম্পতি তারা, পরস্পরের আনন্দদায়ক।
ভোগাকাঙ্খাবহুল, আমোদপ্রিয়ে আবির্ভাব,
সমআচরিতে লভে অমিত্র, দুঃখ কারাবাস।
উভয়ে হলে লোকে শীলবান ও ধর্মচারী,
দেবলোকে আনন্দিত, সব ইচ্ছা পূর্ণকারী।"[১১১]

প্রথম ইহ লৌকিক সুত্রে উল্লেখ রয়েছে, চারগুণে গুণান্বিতা নারীগণ পরলোকে ক্ষমতা জয় করে, পর জগৎ তাদের হাতের মুঠোয়।

সুকর্ম সম্পাদনকারিণী, পরিজনবর্গের উপকারিণী
স্ত্রী হয় স্বামীর সন্তোষকারিণী,
স্বামীর সঞ্চিত ধন সে অনুক্ষণ করে সংরক্ষণ।
সে হয় শ্রদ্ধাসম্পন্না, দানশীলা, অকৃপণা,
নিত্য নির্বাণ মার্গ করে বিশুদ্ধ পরলোকের মঙ্গল কামনায়।
এরূপে যে নারীর এ অষ্টধর্ম থাকে বিদ্যমান
সে নারীই হয় কথিত ধার্মিকা, সত্যবাদিনী, শীলবতীরূপে।
ষোড়শাকার-সম্পন্না, অষ্টগুণালংকৃতা স্ত্রী
শীলবতী উপাসিকা নামে হয় কথিত,
তাদৃশা স্ত্রী জন্ম নেয় মনোজ্ঞ দেবলোকে।"[১১২]

কটুবিয় সূত্রে শীল সম্পর্কে বলা হয়েছে :

তাহারা এইরূপ না করিয়া ছাড়িবে না।
তাহার চিন্তন রাগ কেন্দ্রিভূত মক্ষিকা সদৃশ একত্রিত হইবে।

গলিত মাংসের দুর্গন্ধ সদৃশ ভিক্ষা দূষিত কলুষিত।

নির্বাণ হইতে সে বহু দূরে, দুঃখের ভাগী হয় সে।

গ্রামে বা বনে সেই ভিক্ষু ঘুরিয়া বেড়ায়,

নির্বোধ, বিহ্বল তাহা সদৃশ সাথি খুঁজিয়া পায় না,

মক্ষিকা (রাগ) দ্বারা পরিবৃত হয়।

কিন্তু যাঁহারা শীলে প্রতিষ্ঠিত, প্রশান্ত

প্রজ্ঞা দ্বারা উপশমে রত তাঁহারা সুখে বাস করেন,

তাঁহাদের মধ্যে রাগ মক্ষিকা বিনষ্ট হইয়াছে।"[১১৩]

আরও একইভাবে উল্লেখ রয়েছে :

এক সময় গৌতমবুদ্ধ মথুরা বেরঞ্জ গ্রামের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে গমন করেছিলেন। তিনি বিশ্রামের জন্য এক বৃক্ষের নিচে উপবেশন করলে অনেক গৃহী ও তাদের পত্নী উক্ত পথ দিয়ে যাবার সময় সেখানে বুদ্ধকে বন্দনা করত: বিশ্রাম করেছিলেন। তখন বুদ্ধ তাদেরকে বলেন-গৃহী ও গৃহপত্নীদের চারটি পথ নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন- ১. এক চণ্ডাল চণ্ডালিনীর সঙ্গে বাস করে ; ২. এক চণ্ডাল দেবীর সঙ্গে বাস করে ; ৩. এক দেবতা চণ্ডালিনীর সঙ্গে বাস করে ; ৪. এক দেবতা দেবীর সঙ্গে বাস করে।

১. যে সমস্ত পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণী হত্যা করে, চুরি করে, ব্যভিচার করে, মিথ্যাবাক্য বলে, নেশাপান করে তারা চণ্ডাল চণ্ডালিনীর সঙ্গে বাস করে ; ২. যে সমস্ত পুরুষ প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, নেশাপান ইত্যাদি করে এবং যে সমস্ত স্ত্রীলোক প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য, নেশাপান ইত্যাদি করে না তারা চণ্ডাল দেবীর সঙ্গে বাস করে ; ৩. যে সমস্ত পুরুষ প্রাণী হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যাবাক্য ও নেশাপান হতে বিরত থাকে তারা দেবতুল্য পুরুষ, প্রাণীহত্যা ইত্যাদি পঞ্চশীল লঙ্ঘনকারী চণ্ডালিনীর সঙ্গে বাস করে ; ৪. যে সমস্ত পুরুষ প্রাণীহত্যা ইত্যাদি হতে বিরত হয়ে পঞ্চশীল পালনকারী তারা দেবতুল্য এবং পঞ্চশীল পালনকারী দেবী তুল্য স্ত্রীলোকের সঙ্গে বাস করে।[১১৪]

Dhaka University Institutional Repository

গৃহীদের দৈনন্দিন করণীয় কর্ম

গার্হস্থ্য জীবনে যারা সিগালোকবাদ সূত্র, সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম, ব্যগঘপজ্জ সূত্রে উল্লেখিত নিয়মগুলো রক্ষা ও পালন করে চলেন সর্বদাই তাদের কল্যাণ সাধিত হয়। আর আদর্শ বৌদ্ধজীবন গঠনের জন্য দৈনন্দিন জীবনের করণীয় কর্মকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা : প্রাতঃকৃত্য, সারা দিনের কর্ম জীবন, সান্ধ্যকৃত্য ও রাতের কৃত্য।

প্রাতকালে করণীয় কর্ম

আদর্শ বৌদ্ধ জীবন গঠনের জন্য সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে শয্যা ত্যাগ করতে হয়। শয্যা ত্যাগ করার সময়ে জগতের পরম হিতকামী সর্বজ্ঞ বুদ্ধকে 'নমোতস্স ভগবতো অরহতো সম্মাসম্বুদ্ধস্স' বলে তিনবার প্রণাম করা উচিত। প্রাতঃকালীন তথা জীবনের সকল সময়ে করণীয় কর্ম স্মৃতি সহকারে করা উচিত। কারণ স্মৃতি হলো 'সব্বত্থ সাধিকা'। যখন যা করা হয়, তৎপ্রতি মনোনিবেশ করতে হয়। প্রাতঃকালীন শারীরিক কৃত্যঃ শৌচকর্মাদি স্মৃতি সহকারে সম্পাদন করে বুদ্ধ পূজা এবং বুদ্ধ বন্দনা করতে হয়। যদি নিকটে বুদ্ধ বিহার থাকে তাহলে পুষ্প প্রদীপ, ধূপবাতি এবং আহার্য দ্রব্যাদি দিয়ে সেখানে পূজা ও বন্দনা করা উচিত। বিহারে ভিক্ষু থাকলে তাকেও বন্দনা করে দিনের কর্মসূচি শুরু করা যেতে পারে।

সারাদিনের কর্মজীবন

মানুষ মাত্রই মরণশীল। আর মরণশীল জীবন বড়ই কষ্টকর। সৎপথে জীবিকা অর্জন করে কষ্টকর জীবন অতিবাহিত করতে পারলে মৃত্যুর পর সুগতি লাভ করা যায়। সৎপথের জীবিকা সম্বন্ধে বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন- অস্ত্র, প্রাণী, মাংস, বিষ ও মদ এই পঞ্চ বাণিজ্য নিষিদ্ধ। এছাড়া 'তুলাকুট' অর্থাৎ ওজনে কম দেওয়া, 'মানকুট' অর্থাৎ ঠকাবার ইচ্ছায় ওজনে নিতে বেশি নেওয়া এবং দিতে কম দেওয়া, 'করমকুট' অর্থাৎ কোন ভাল দ্রব্যের সাথে মন্দ দ্রব্য মিশ্রিত করে ভাল বলে লাভের আশায় বিক্রয় করা প্রভৃতি গর্হিত কর্ম বলে চিহ্নিত করা হয়। তাই সৎ উপায়ে জীবিকা অর্জনের জন্য কৃষিকাজ, হস্তশিল্প ও অন্যান্য বাণিজ্য করা যেতে পারে।

সান্ধ্যকালীন করণীয় কর্ম

সন্ধ্যা হলে মুক্ত বাতাসে কিছুক্ষণ পদাচরণ করলে স্বাস্থ্য ও মন প্রফুল্ল থাকে। তাই খোলা বাতাসে কিছুক্ষণ ভ্রমণ করে ভালোভাবে মুখ হাত ধৌত করে নিকটে বিহার থাকলে বিহারে কিংবা নিজ বাড়ির কোন নির্দিষ্ট স্থানে এককভাবে কিংবা সমবেতভাবে বুদ্ধ বন্দনা করা উচিত। যদি বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষু থাকেন তিনি সন্ধ্যায় একটা নির্দিষ্ট সমবেত বুদ্ধ বন্দনার আয়োজন করবেন।

রাতের করণীয় কর্ম

গভীর রাতে আহার করতে নেই। রাতের আহার হবে খুবই পরিমিতবোধের। ঐ আহার গ্রহণ করার নিয়ম স্মৃতি সহকারে ভোজন করা উচিত। ভোজন শেষে নিদ্রা যেতে নেই। রাতে নিদ্রার আগে মৈত্রীভাবনা বা মরণাস্মৃতি ভাবনা করতে করতে নিদ্রা যাওয়া উচিত।

গৃহীদের প্রতি বিধুর পণ্ডিতের উপদেশ

বিধুর বসমানস্স গহট্ঠস্স সকং ঘরং,
খেমাবুত্তি কথং অস্স কথং নু অস্স সঙ্গহো ?[১১৫]

অর্থাৎ, হে বিধুর, গৃহীকে স্বীয় ঘরে বাস করতে হলে, কিরূপে ক্ষেমাস্পদ, নির্ভয় ও চর্তুবিধ[১১৬] সংগ্রহে থেকে বাস করা যায় ?

অব্যাপজ্জ কথং অস্স সচ্চবাদী চ মানবা,
অস্মা লোকা পরং লেঅকং কথং পেচ্চ ন সোচতী'তি ?[১১৭]

অর্থাৎ, কিরূপে নিদুঃখী হওয়া যায়, কিরূপে সত্যবাদী বলে কথিত হয় এবং কিরূপেই বা ইহলোকে এবং মরণের পর পরলোকে শোক করতে হয় না ?

তং তত্থ গতিমা ধিতিমা মতিমা অত্থদস্সিমা,
সঙ্খতো সব্বধম্মানং বিধুরো এতদব্রবি।[১১৮]

অর্থাৎ, বিধুর এই উত্তর দিলেন যে, নিজ প্রজ্ঞাবলে যদি সন্মার্গগামী, দৃঢ় বীর্যবান, সূক্ষদর্শী, প্রাপ্তজ্ঞান ও সকল বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন হয়, তা হলে উক্তরূপে গ্রহবাস করা যায়।

ন সাধারণদারস্স ন ভুঞ্জে সাধুমেককো,

Dhaka University Institutional Repository

ন সেবে লোকাযতিকং নেতং পঞ্ঞায বড্ঢনং ।[১১৯]

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পরদার গমনে প্রবৃত্ত হয় না, মধুর খাদ্য-ভোজ্য একাকী ভোজন করে না, স্বর্গাদি সম্বন্ধে অর্থহীন জ্যোতিষ শাস্ত্রের ভুল ধারণা গ্রহণ করে না, সেই ব্যক্তিই উক্ত সদ্ভাবে গৃহবাস করতে পারে।

সীলবা বত্তসম্পন্নো অপ্পমত্তো বিচক্খণো,

নিবাতবুত্তি অথদ্ধো সুরতো সখিলো মুদু ।[১২০]

অর্থাৎ, শীলবান, গৃহবাস সম্বন্ধীয় সম্পন্ন, পুণ্যকর্মে অপ্রমত্ত, বিচার-বুদ্ধিপরায়ণ, নিরভিমানী, বদ্ধমাৎসর্যহীন, সুবিনীত, মিষ্টভাষী এবং শান্ত ব্যক্তিই সদ্ভাবে গৃহবাস করতে পারে।

সঙ্গহেতা চ মিত্তানং সংবিভাগী বিধানবা,

তপ্পেয্য অন্নপানেন সদা সমণব্রাহ্মণে ।[১২১]

অর্থাৎ, দানাদি সদুপায়ে কল্যাণ মিত্র সংগ্রহকারী, যাচকদেরকে সম বণ্টনকারী, গৃহী উচিত কর্ষণ-রোপণে কালাকালজ্ঞ, শ্রমণ ব্রাহ্মণদেরকে প্রচুর দান সর্বদা তুষ্টকারী ব্যক্তি উক্তরূপে গৃহবাস করতে পারে।

অম্মকামো সুতধরো ভবেয্য পরিপুচ্ছকো,

সক্কচ্চং পযিরুপাসেয্য সীলবন্তে বহুস্সুতে ।[১২২]

অর্থাৎ, যে ধর্মকামী, জ্ঞানী, ধার্মিক শ্রমণ ব্রাহ্মণদের নিকট ধর্মজিজ্ঞাসা করে এবং শীলবান, বহুশ্রুতদের সগৌরবে সেবা করে সে সদ্ভাবে গৃহবাস করতে পারে।

ঘরমাবসমানস্স গহট্ঠ সকং ঘরং,

খেমাবুত্তি সিযা এবং নু অস্স সঙ্গহো ।[১২৩]

অর্থাৎ, এরূপে স্বীয় ঘরে বাসকারী গৃহী ক্ষেমাস্পদ হয়ে এবং চার প্রকার সংগ্রহে বা বিষয়ে পরিপূর্ণ থেকে বাস করতে পারে।

অব্যাপজ্জো সিযা এবং সচ্চবাদী চ মানবো,

অস্মালোকা পরং লোকং এবং পেচ্চ ন সোচতী'তি ।[১২৪]

অর্থাৎ, এইরূপে জনপ্রিয় ও সত্যবাদী মানব ইহলোকে এবং মৃত্যুর পরে পরলোকে গিয়ে শোক করে না।

মানবতার বিকাশ সাধনে পঞ্চশীল

মানবতা বলতে বোঝায় মানুষের প্রতি মানুষের দয়া মায়া প্রীতি। এছাড়াও মানুষের স্বাভাবিক গুণ ধর্ম ভাব ইত্যাদি।[১২৫] লোকনাথ বুদ্ধ গৃহীদের আদিকল্যাণ স্বরূপ যেই পঞ্চশীল অর্থাৎ পাঁচটি অবশ্য প্রতিপালনীয় নীতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তা বাস্তবিকই মানবত্ব লাভের পক্ষে একান্ত হিতকর। এই পাঁচটি নীতি কেবল বৌদ্ধদের নয়, হিন্দু-মুসলমানাদি প্রত্যেক জাতির পক্ষেও পরম প্রয়োজনীয়। সেজন্য ইহা সর্বজনীন। যারা কল্যাণ পথের যাত্রী তাদের প্রত্যেকের এই নীতির অনুসরণ করতে হবে। আর যারা বৌদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করে মহামানব গৌতম বুদ্ধের আদিশিক্ষা পঞ্চশীল পালনে ও অনুশীলনে যত্নপর নয়, তারা প্রকৃতপক্ষে নামে বৌদ্ধ মাত্র কার্য্যত নয়। সেজন্য বলেছেন- বৌদ্ধ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রত্যেকের পঞ্চশীল, শীলভঙ্গের কারণ ও শীল পালনের ফল ইত্যাদি ভালোভাবে জানা থাকা এবং সকাল-সন্ধ্যা দুইবার করে স্মৃতিপটে জাগ্রত রাখা একান্তই প্রয়োজন। করণীয় মৈত্রী সূত্রে বলা হয়েছে, এমন ক্ষুদ্র পাপাচরণও করবেনা, যাদ্বারা অপর বিজ্ঞজন নিন্দা করতে পারে। 'সকল প্রাণী সুখী হউক, উপদ্রব বিহীন হউক, শান্তি সুখ উপভোগ করুক' বলে প্রাণীদের হিতচিন্তা করতে হবে। এছাড়াও পরস্পরকে বঞ্চনা করোনা, কোথায়ও কাউকে অবজ্ঞা করোনা। হিংসা বা আক্রোশের বশবর্তী হয়ে পরস্পরের মধ্যে দুঃখোৎপাদনের চেষ্টা করোনা। কায়-বাক্যের রুক্ষতা ও কর্কশতা নিবারণ, উচ্ছৃঙ্খলতা অপসারণ, বধ-বন্ধন প্রহার, চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, পৈশুন্য, সম্প্রলাপ, পরুষবাক্য, নেশাপান নিবারণ শীলের কাজ। শীলতা যেন সুকর্ষিত ভূমি, সকল গুণের আধার ও সমাজের মেরুদণ্ড।[১২৬]

যে সকল পাপকার্য নিষিদ্ধ, তদ্ব্যতীত কাম, ক্রোধ, লোভ, পরনিন্দা, অহংকার প্রভৃতি মনুষ্যের সর্বপ্রকার কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্মের উপদেশ বিধান আছে। যে সমস্ত ধর্মনীতি পালনীয় তা পিতৃভক্তি, গুরুভক্তি, স্নেহ, দয়া, অহিংসা, চিত্তের স্থৈর্য, ধৈর্য ক্ষমা। বুদ্ধের উপদেশ- সত্য ও প্রিয়বাক্য বলবে, কারো হিংসা করবে না ; সাধুতার দ্বারা অসাধুকে পরাজয় করবে, সত্য দ্বার

অসত্যকে পরাজয় করবে, মৈত্রী গুণে শত্রুকে পরাভব করবে।[১২৭] বুদ্ধ পঞ্চশীলকে সর্বজনীন নীতিতত্ত্ব বলে অভিহিত করেছেন। যে জীবিকা হিংসাত্মক আচরণ, অসৎভাষণ, মদ্য প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত তা বর্জন করা উচিত।[১২৮]

শীল গ্রহণ ও প্রদানের বিধান

যে কোন উপাসক ও উপাসিকা উক্ত শীলসমূহের মধ্যে যে কোন প্রকারের শীল গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হলে তাঁরা ভিক্ষুর সম্মুখে শান্ত চিত্তে উৎকুটিক অবস্থায় উপবেশন করে পঞ্চশীল, অষ্টশীল ইত্যাদি (প্রার্থনা অনুযায়ী মনোনীত শীল) তিনবার প্রার্থনা করবেন। তখন ভিক্ষু বলবেন : "যমহং বদামি তং বদেহি" (আমি যাহা বলি, তুমি তাহা বল) শীল গ্রহণকারী একজনের অধিক হলে বহুবচনে "বদেথ" বলবেন। উপাসক-উপাসিকা "আম ভন্তে" (হাঁ ভন্তে) বলে বন্দনা করবেন। ভিক্ষু বলবেন, "নমো তস্স ভগবতো, অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্স।" গৃহী বা উপাসক উপাসিকা তা তিনবার বলবেন। তৎপর ভিক্ষু "বুদ্ধ সরণং গচ্ছামি" ইত্যাদি শরণ পূর্বোক্ত ত্রিশরণের এক একটি শরণপৃথক করে বলবেন। গৃহী বা উপাসক উপাসিকা ও ভিক্ষুর মুখে মুখে বলবেন দুতিযম্পি-ততিযম্পি হিসেবে ত্রিশরণ বলা শেষ হইলে ভিক্ষু বলবেন, "তিসরণ গমনং সম্পন্নং" (ত্রিসরণ গমন বা গ্রহণ শেষ)। গৃহী বা উপাসক-উপাসিকা "আম ভন্তে" (হাঁ ভন্তে) বলে বন্দনা করবেন। তদন্তর ভিক্ষু শীল-পর্বে লিখিতানুসারে শীল এক একটি বলবেন। গৃহী বা উপাসক-উপাসিকাগণ ভিক্ষুর মুখে মুখে বলবেন। পঞ্চশীল বলা শেষ হলে ভিক্ষু বলবেন "তিসরণেন সদ্ধিং পঞ্চসীলং ধম্মং সাধুকং সুরক্খিতং কত্বা অপ্পমাদেন সম্পাদেতব্বং"(ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল সাধু বা পবিত্র ও সুন্দররূপে রক্ষা করে অপ্রমাদের সাথে সম্পাদন কর)। এরূপে পঞ্চশীল গ্রহণকারীকে বলবেন। অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল গ্রহণকারীকে পঞ্চসীলং স্থানে "অট্ঠঙ্গ সমন্নাগতং উপোসথ সীলং", মিথ্যাজীব সমথ শীল গ্রহণকারীকে 'মিচ্ছাজীব সমথ সীলং', দশ সুচরিত শীল গ্রহণকারীকে 'দসসুচরিতসীলং', দশশীল গ্রহণকারীকে 'দসসীলং', প্রব্রজ্যা শীল গ্রহণকারীকে 'পব্বজ্জা সামণের দসসীলং' ইত্যাদি যথানিয়মে বলবেন। শীল গ্রহণকারী "আম ভন্তে" বলে বন্দনা করবে। ভিক্ষু ও গৃহীর এই বিধানানুসারে শীল প্রদান ও গ্রহণ করতে হয়।

পঞ্চশীলের নৈতিক মূল্যবোধ

বৌদ্ধ ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নৈতিকতা। যে সব গুণ মানুষকে সত্যিকার অর্থে মহৎ করে তোলে, নৈতিকতা তাদের মধ্যে অন্যতম। নৈতিকতা মানব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ স্বরূপ। সুষ্ঠু সামাজিক পরিস্থিতি, সুসংগঠিত জীবন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য নৈতিক শিক্ষার পরিচর্যা অনুশীলন ও প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই বরং পরিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে প্রথম ও সর্বশেষ অপরিহার্য শর্ত হলো নৈতিক শিক্ষা। নৈতিক শিক্ষা মানুষের চেতনাকে জাগ্রত ও বোধকে শাণিত করে জ্ঞানকে করে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ। যে কোন ধর্ম-বর্ণের মানুষের মধ্যে নৈতিকতা জাগ্রত হলে বা নীতিবোধ কাজ করলে, সে ব্যক্তি কখনো অন্যায় বা অসামাজিক কাজ করতে দ্বিধাগ্রস্থ হবে, বিবেক তাকে নিবৃত্ত করবে। নিম্নের তিনটি স্বতঃসিদ্ধ সত্যের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিকতার ধারণা প্রকাশ করা যেতে পারে :

প্রথমত : অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকা ;

দ্বিতীয়ত : ভালো কাজ সম্পাদন করা ;

তৃতীয়ত : নিজের মনকে পরিশুদ্ধ করা।

বুদ্ধ তাঁর ধর্মে নৈতিক আচরণকে প্রাধান্য দিয়েছেন। আদর্শ ও নীতির কথাই পঞ্চশীলে উচ্ছলিত হয়েছে। মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখায় তাঁর নীতির মধ্যে। মহান আর্দশে উৎসর্গ করে সকলের আস্থা বা বিশ্বাস স্থাপন করার বহু দৃষ্টান্ত বৌদ্ধধর্মে রয়েছে। শীলবান ব্যক্তিকে এখানে আদর্শবান বলা যায়। চারিত্রিক শীল প্রতিপালিত হলে ব্যক্তি স্বভাব বা আচরণ সুষমামণ্ডিত হয়। বুদ্ধ মানুষকে শীল পালন করে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে উপদেশ দিয়েছেন। ধম্মপদে বলা হয়েছে :

সীলদস্‌সন সম্পন্নং ধম্মট্ঠং সচ্চবেদিনং,

অত্তনো কম্মকুব্বনং তং জনো কুরুতে পিযং।[১২৯]

অর্থাৎ, যিনি শীলবান, দার্শনিক, ধার্মিক, সত্যবাদী এবং স্বীয় কর্তব্যে নিয়োজিত, তিনি সকলেরই প্রিয় হয়ে থাকেন।

বুদ্ধ মানুষকে চরিত্রবান হতে, তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রতী হতে, ধার্মিক হওয়ার আদর্শে, সত্যবাদী হওয়ার অনুপ্রেরণায় এবং স্বীয় কর্তব্যে অটল থাকার লক্ষ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। এখানে ভোগের চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

ত্যাগের মহত্ত্বকে বড় করে দেখানো হয়েছে। জীবনকে সম্যক উপলব্ধির জন্য নীতি বাক্য সমূহের এগুরুত্ব অপরিসীম। এতেই প্রমাণিত হয় যে, পবিত্রতা, বিশুদ্ধি, নির্মলতা করো নিকট থেকে চেয়ে অর্জন করা যায় না, নিজের কর্ম বিশুদ্ধির মাধ্যমে তা অর্জন করতে হয়।[১৩০] জ্ঞানই মনুষকে মহৎ করে তুলেছে। জ্ঞানের পথ সাধনার পথ, উপলব্ধি ও অনুভূতির পথ। জ্ঞানীরা নিজের জীর্ণত্ব সম্বন্ধে সচেতন। সহস্র বর্গে বলা হয়েছে : জীবনের মূল্যায়ন দীর্ঘ স্থায়ীত্বে নয়, অমূল্য হয়ে উঠে শীল ও সমাধির অনুশীলনে। তাই দুঃশীলের শতবর্ষ বেঁচে থাকার চেয়ে সুশীলের একদিন বেঁচে থাকা কল্যাণপদ।[১৩১] ধম্মপদে আরো বলা হয়েছে :

উত্তিটঠে নপ্পমজ্জেয্য ধম্মং সুচরিতং চরে,

ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।[১৩২]

অর্থাৎ, উদ্যমশীল হও, প্রমত্ত হয়ো না, সুচারুরূপে ধর্মাচরণ করো, ধর্মাচরণকারী ইহ-পরলোক সুখে থাকেন।

বৌদ্ধধর্মে পঞ্চশীলে নৈতিকতার প্রথম, প্রধান এবং বলা যায় একমাত্র বৈশিষ্ট্য হলো, এখানে মানুষের চরিত্রের স্বাভাবিক, চিরন্তন এবং সর্বজনীনভাবে কাম্যগুণগুলোই গৃহীত হয়েছে। সাধারণভাবে চরিত্রের যে বিশেষ দিক ও গুণগুলোকে অনাদিকাল থেকে মানুষ গ্রহণীয় মনে করে এসেছে তারই প্রথাসিদ্ধ, সুশৃঙ্খল শোভন উপস্থাপনা হলো পঞ্চশীলের নৈতিকতা। নৈতিকতা ধর্মের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ। বুদ্ধ নৈতিকতার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন ; সকল অন্যায় কাজ থেকে বিরতি, কুশলকর্ম সম্পাদন করা এবং আত্মচিত্তকে পরিশুদ্ধ করার কথা বলেছেন।[১৩৩] মানুষের প্রকৃতিতে চরিত্রের অনুভূতি একটি স্বাভাবিক অনুভূতি। এটা এক প্রকারের গুণ ও কাজকে পছন্দ করে এবং অন্য এক প্রকারের গুণ ও কাজকে অপছন্দ করে। পছন্দ-অপছন্দের এই অনুভূতি ব্যক্তিগতভাবে কারো কম বা বেশি হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবতার তীব্র চেতনায় এই অনুভূতি তীব্র ও চিরন্তন। চরিত্রের কোনো কোনো গুণকে ভালো এবং কোনো কোনো গুণকে মন্দ বলার ক্ষেত্রে মানবতা চিরদিন এক ও অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেছে। সততা, সত্যবাদিতা, সুবিচার, প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা এবং বিশ্বাসপরায়ণতাকে সবসময় প্রশংসনীয় গুণ মনে করা হয়েছে। মিথ্যা, ব্যভিচার, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে কোনোকালেই প্রশংসনীয় মনে করা

হয়নি। সহানুভূতি, দয়া, দানশীলতা, উদারতা সবসময়ই সম্মান পেয়েছে। পক্ষান্তরে স্বার্থপরতা, নিষ্ঠুরতা, কৃপণতা ও সংকীর্ণতা কখনোই মর্যাদা পায়নি। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দৃঢ়তা আদর্শপরায়ণতা, বীরত্ব, উচ্চাশা সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য গুণ বিবেচিত হয়েছে। আর হত্যা, মিথ্যাচার, চুরি, ব্যভিচার মাদকদ্রব্য পান, নীচতা, হীনমানসিকতা ও কাপুরুষতা সর্বজনীনভাবে অগ্রহণযোগ্য গুণ বলে বিবেচিত হয়েছে। আত্মসংযম, আত্মসম্মানবোধ, নিয়মানুবর্তিতা ও অকপটতা মানুষের কাম্য বৈশিষ্ট্য হিসেবে নন্দিত হয়েছে। বিপরীতদিকে প্রবৃত্তির দাসত্ব, অশালীন আচরণ, বিশৃঙ্খলা ও কুটিলতা সবসময়ই মন্দ বৈশিষ্ট্য হিসেবে নিন্দিত হয়েছে। কর্তব্যপরায়ণতা ও কর্মদক্ষতা চিরদিনই সম্মান পেয়েছে। কর্মবিমুখ, দায়িত্বজ্ঞানহীন, উদাসীন মানুষ কখনোই মানুষের স্বীকৃতি ও শ্রদ্ধা পায়নি।

কেবল ব্যক্তিগত গুণ নয় বরং সমাজ-জীবনের ভালো ও মন্দ গুণাবলি সম্পর্কেও মানবতার সিদ্ধান্ত চিরকাল প্রায় এক জায়গাতেই রয়েছে। পৃথিবীতে সম্মান ও মর্যাদা কেবল সে সমাজই লাভ করতে পেরেছে যাতে নিয়ম-শৃঙ্খলা, সহানুভূতি, পারস্পরিক সহযোগিতা, কল্যাণকামিতা, সামাজিক সুবিচার ও সাম্য আছে। উশৃঙ্খলতা, বিভেদ-বৈষম্য, অনিয়ম, অনৈক্য, পারস্পরিক শত্রুতা ও অসহযোগিতাকে পৃথিবীর ইতিহাসে কোনোদিনই সামাজিক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যের মধ্যে গণ্য করা হয়নি। ব্যক্তিগত ও সামাজিক কাজ-কর্মের ভালোমন্দের ক্ষেত্রেও পঞ্চশীলের নৈতিক মূল্যবোধ সবসময় এক এবং অভিন্ন সিদ্ধান্ত অব্যাহত রেখেছে। হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, পরচর্চা, হিংসা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কাজকে কখনোই ভালো কাজ মনে করা হয়নি। সৎকর্মশীল ও অন্যের কল্যাণকামী ব্যক্তি চিরদিনই সম্মান লাভ করেছে। বস্তুত উত্তম চরিত্রের এই চিরন্তন স্বীকৃতি ও মূল্যায়নের বাস্তব প্রতিকৃতি হলো নৈতিকতা। এখানে সে সকল বিষয়কেই অবশ্য করণীয় মনে করা হয়েছে যা মানবিক মূল্যবোধ ও আকাঙ্খার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্ব

পঞ্চশীল হলো সমাজের ভারসাম্যের ধারক ও বাহক। পরস্পর বিরোধী দাবীর মধ্যে এই শীল ন্যায় বিচার ভারসাম্য রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। নিম্নে পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

সামাজিক মূল্যবোধ

মূল্যবোধ বলতে মানুষের এমন এক বিশ্বাস, বোধ ও মানদণ্ডকে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোন জিনিসের ভাল-মন্দ বিচার করা হয়। মানুষের আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, চাল-চলন, কার্যক্রম প্রভৃতি মূল্যবোধ অনুকরণ করে পরিচালিত হয়।[১৩৪] মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে নৈতিকতা, আদর্শ, কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও অপরাপর অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়। আর সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পঞ্চশীল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সমাজ থেকে চুরি, হত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদি দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজকে কলুষমুক্ত করা যেতে পারে।

ধম্মপদে উক্ত হয়েছে :

নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো।[১৩৫]

অর্থাৎ, শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা কখনও প্রশমিত হয় না, শত্রুহীনতার দ্বারা শত্রুতা প্রশমিত হয়। জগতে ইহাই সনাতন ধর্ম।

অসারে সারমতিনো, সারে চাসারদস্সিনো,
তে সারং নাধিগচ্ছন্তি মিচ্ছাসংকল্পগোচরা।[১৩৬]

অর্থাৎ, যারা অসারকে সার, সারকে অসার মনে করে তারা মিথ্যা সংকল্প পরায়ণ বলে কখনো সার বস্তুকে গ্রহণ করতে পারে না।

সারঞ্চ সারতো ঞত্বা অসারঞ্চ অসারতো,
তে সারঞ্চ অধিগচ্ছন্তি সম্মাসংকল্প গোচর।[১৩৭]

অর্থাৎ, যাঁরা সারকে সার এবং অসারকে অসার মনে করে তাঁরা সত্য সংকল্প পরায়ণ বলে সার বস্তুকে গ্রহণ করতে পারেন। বৈরিতা বা হিংসা দিয়ে সমাজ তথা জগতের বৈরিতা দমন করা যায় না। অহিংসার বাণীই সবচেয়ে প্রাচীন অর্থবহ। হিংসার চরমরূপ হত্যা। হত্যা জীবন থেকে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরূপ গর্হিত কাজ বোধ হয় সমাজ তথা জগতে আর নেই। অহিংসার অপর নাম প্রেম-মৈত্রী-ভালোবাসা। সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে হলে মানুষকে নৈতিকতা বোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। ধর্মের সার আর নৈতিকতা বোধ একই সুতাই গাথা। তাই সামাজিক মূলবোধের

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন। যেখানে পঞ্চশীলের শিক্ষা সামাজিক মূলবোধের শিক্ষার সাথে একান্তভাবে মিশে কাজ করে।

সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরণ

সমাজ একটি গতিশীল প্রত্যয়। সামাজিক ব্যবস্থাই চিরস্থায়ী নয়। সমাজে চুরি, হত্যা ও মাদকাসক্ত ব্যাক্তিরা সমাজকে অস্থির করে তোলে। তাদের সঙ্গবদ্ধ গোষ্ঠীকে কোনভাবেই উৎসাহিত করা যাবে না। সমাজ কোন দিন একই অবস্থায় থাকেনি তাই চুরি, হত্যা ও নেশাপান থেকে বিরত করতে পারলে আমাদের চারপাশে যে অস্থিরতা আছে তা দূর করা সম্ভব। ধম্মপদে বলা হয়েছে-

তে ঝায়িনো সাততিকা নিচ্চং দল্‌হপরাক্কমা,

ফুসন্তি ধীরা নিব্বানং যোগক্‌খমং অনুত্তরং।[১৩৮]

অর্থাৎ, সে সকল ধ্যানী, অধ্যবসায়ী, উদ্যোমী ও নিয়ত দৃঢ়পরাক্রমশীল, তাঁরা ক্রমে প্রশান্ত নির্বাণ লাভ করেন।

উট্‌ঠানেন অপ্‌পমদানেন সঞ্‌ঞমেন দমেন চ,

দীপং কয়িরাথ মেধাবী যং ওঘো নাভিকীরতি।[১৩৯]

অর্থাৎ, জ্ঞানীরা উত্থান, অপ্রমাদ, সংযম ও দান্ত হয়ে নিজেদের জন্যে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন তা প্লাবনও ধ্বংস করতে পারে না।

এ দেহকে মৃত্তিকার-কলস জ্ঞান করে চিত্তকে নগরের ন্যায় সুরক্ষা করে প্রজ্ঞাস্ত্র দিয়ে মারের সাথে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধে জয় লাভ করে বিজিত ধনকে সযত্নে রক্ষা করো এবং পার্থিব সুখে অনাসক্ত হও।[১৪০] মাতাপিতা কিংবা জ্ঞাতীরা যে উপকার মানুষের করতে পারে না, সুপরিচালিত চিত্ত তার চেয়ে অধিক উপকার করে।[১৪১] সামাজিক অস্থিরতা দূরীকরণে স্থির চিত্ত এবং স্থির চিত্তের মানুষ একান্ত প্রয়োজন। আর এরই মধ্যে দিয়ে পঞ্চশীলের পালন করা সম্ভব হলে এ সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

সমাজে শান্তি শৃঙখলা আনয়ন

পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে চিত্ত কলুষতা থেকে মুক্ত হয়। এতে কুশল কর্ম সম্পাদিত হয়। প্রাণীহত্যা থেকে বিরত হওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশিত হয়। মিথ্যাকে সকল পাপের জননী বলা হয়। ধম্মপদে উল্লেখ রয়েছে :

অভিত্থরেথ কল্যাণে, পাপা চিত্তং নিবারয়ে,

দন্ধং হি করোতা পঞ্ঞং পাপস্সিং রমতে মনো।[১৪২]

অর্থাৎ, অতি সত্ত্বর কল্যাণ কর্ম সম্পাদন কর, পাপ থেকে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখ, আলস্যে পুণ্য সম্পাদনকারীর মন পাপে রমিত হয়ে পড়ে।

পুণ্য কাজে কখনও অবহেলা করতে নেই। অল্প অল্প সঞ্চয় করে বিজ্ঞলোক পুণ্যময় হয়ে উঠেন। সুখের উৎস হলো পুণ্য। এজন্য পুণ্য কাজ অভ্যাসের দ্বারা, পুনরাবৃত্তির দ্বারা ক্রমে ক্রমে বাড়াতে হবে। সৎ কর্ম পুনঃপুনঃ করতে হয়। এতে কাজের অনুরাগ সৃষ্টি হয়। সৎকর্মে অনুরাগ বৃদ্ধি পায় কিন্তু পাপ কর্মে আসক্তি বৃদ্ধি হয়। তাই পাপ কাজ সম্পাদিত হলে তা যেন আসক্তির রূপ পরিগ্রহ করে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে সতর্ক থাকা উচিত। পাপের পরিণামে যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়। কর্মের ফলকে উপেক্ষা করা যায় না। বীজ অনুযায়ী ফল অবশ্যম্ভাবী। পাপের দুর্গতি কিংবা পুণ্যের সুগতি তাৎক্ষণিকভাবে দৃষ্টিগোচর হয় না। অনেক সময় বিপরীতমুখী ফল ভোগ করতে দেখা যায়। এরূপ বিপরীতধর্মী ফল ভোগ নিত্যান্ত সাময়িক। অন্তিমেই বোঝা যায় অসৎ কর্মের দুর্ভোগ এবং সৎ কর্মের সুখ ভোগ কত ধ্রুব, কত নিশ্চিত। পাপের পরিণাম অপ্রতিরোধ্য। পাপের ফল শকটের চাকার মতো পদাঙ্ক অনুসরণ করে। পৃথিবীতে নিষ্পাপ, নির্দোষ, নিষ্কলুষ ও নিরীহ ব্যক্তির সততার গুণেই সুরক্ষিত হয়। তাঁর প্রতি কেউ দুর্ব্যবহার কিংবা ক্ষতি করলে বাতাসের বিপরীত দিকে বিচ্ছুরিত ধুলোর মতো সেই পাপবিষ নিজেকেই গ্রাস করে ; প্রতিহত হয়ে প্রত্যাগাত করে। বুদ্ধ বলেছেন :

তং চ কম্মং কতং সাধু যং কত্বা নানুতপ্পতি,

যস্স পতিতো সুমনো বিপাকং পটিসেবতি।[১৪৩]

অর্থাৎ, যে কর্ম করলে অনুতাপ করতে হয় না, যার ফল সানন্দে ও প্রফুল্ল মনে ভোগ করা যায় তেমন কর্ম করাই উত্তম।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে অবশ্যই সকল পাপ ও অপকার থেকে বিরত থাকতে হবে। মাদকাসক্ত ব্যক্তির হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। তাই পঞ্চশীল পালন করলে সকল প্রকার পাপাচার থেকে মুক্ত থাকা যায়। ফলে সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

স্বচ্ছ সমাজ গঠনে

পঞ্চশীল মানুষের চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি, প্রজ্ঞার দ্বারা কেন্দ্রীভূত হয়ে তার ব্যক্তিত্বের গতিধারাকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। আর স্বচ্ছ সমাজ গঠনে পঞ্চশীলের ইতিবাচক মনোভাব সমাজের দৃশ্যপট পাল্টে দেয় এবং মানুষের মনে যে কলুষতা থাকে তা দূর করে স্বচ্ছ, পরিশুদ্ধ ও নির্মল করে দেয়। পরের দুঃখ দেখে বিগলিত হওয়া, পরের দুঃখ অপনোদনে তৎপর হওয়া। পরিচ্ছন্ন অন্তরে পর দুর্দশা নিবারণে ভূমিকা নেয়। হিংসা, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে পরের দুঃখ-কষ্টকে আপনাররূপে গ্রহণ করাই করুণা। করুণার দুটি দিক। একটি অনুভূতি প্রবণতা বা আন্তরিকতাবোধ, অন্যটি হল দুর্দশা মোচনে ব্যবস্থা করা। একটি চেতনাভিত্তিক অন্যটি কর্ম ভিত্তিক। মানুষ মানুষকে শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখায় তাঁর নীতির জন্যে। মহান আদর্শে নিবেদিত হয়ে সকলের শ্রদ্ধা আর্কষণ করার বহু দৃষ্টান্ত বৌদ্ধধর্মে রয়েছে। শীলবান ব্যক্তিকে এখানে আদর্শবান বলা যায়। চারিত্রিক শীল প্রতিপালিত হলে ব্যক্তি চরিত্র সুষমামণ্ডিত হয়। ধর্মপদে মানুষকে শীল পালন করে উন্নত চরিত্রের অধিকারী হতে উপদেশ দেয়। তাতে দেখা যায় :

সীলদস্‌সন সম্পন্নং ধম্মট্ঠং সচ্চবেদিনং,
অত্তনো কম্মকুব্বনং তং জনো কুরুতে পিয়ং।[১৪৪]

অর্থাৎ, শীলবান, জ্ঞানী, ধার্মিক, সত্যবাদী ও আত্মকর্ম পরায়ণ ব্যক্তি সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়ে থাকে।

এখানে ধম্মপদ মানুষকে চরিত্রবান হতে, তত্ত্বানুসন্ধানে ব্রতী হতে, ধার্মিক হওয়ার আদর্শে, সত্যবাদী হওয়ার অনুপ্রেরণায় এবং স্বীয় কর্তব্যে অটল থাকার লক্ষ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

সামাজিক দায়িত্ব

মানুষ সামাজিক জীব। আত্মীয়-অনাত্মীয়, পাড়া-প্রতিবেশী নিয়ে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে তাকে সামাজিক জীবন নির্বাহ করতে হয়। হত্যা, চুরি, ব্যভিচার ও নানারকম খারাপ আচরণ সামাজিক জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। এ অব্যবস্থা প্রতিরোধে পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে মানুষের মানষিক পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। বুদ্ধের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষরই সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তৃব্য রয়েছে। বুদ্ধ নিজে আপন কর্ম ও কর্মফলের প্রতি অটল বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর দর্শন মতে প্রতিটি মানুষের ক্ষেত্রেই আজকের কর্ম আগামী দিনের পাথেয় স্বরূপ।[১৪৫] সুতরাং এমন কোন কর্ম করবে না যা আগামীতে পীড়াদায়ক হয়। আবার কর্মহীন থাকা বা অলস জীবনকে বুদ্ধ ধিক্কার দিয়েছেন। ধম্মপদে বলা হয়েছে :

যো চ বস্‌সসতং জীবে কুসীতো হীনবীয়ো।
একাহং জীবিতং সেয্যো বিরিযমারভতো দল্‌হং।[১৪৬]

অর্থাৎ, যে অলস ও হীনবীর্য হয়ে শতবর্ষ জীবন ধারণ করে, তার চেয়ে দৃঢ় ও আরদ্ধবীর্যবানের একদিনের জীবন ধারণও শ্রেয়।

বুদ্ধ বলেছেন কর্মে উদ্যোগী হয়ে জীবনকে সুচারুরূপে গড়ে তুলতে। এতে প্রত্যেক মানুষের যথেষ্ট করণীয় কর্ম রয়েছে।

সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ

সমাজে ঐক্য ও সংহতি রক্ষার জন্য পঞ্চশীল এর গুরুত্ব সমাধিক। ভ্রাতৃত্ববোধ মানুষকে ব্যক্তিগত স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে সমষ্টির স্বার্থ বা বৃহত্তর কল্যাণে নিজেকে নিবেদিত করার শিক্ষা প্রদান করে থাকে। আর লোভ, প্রতিহিংসা ও ভ্রান্ত ধারণা হলো মানসিক অকুশল সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখতে হলে এগুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। যিনি ন্যায়, ধর্ম ও সাম্যের সাথে সকলকে পরিচালিত করেন তিনিই ধর্মের অভিভাবক, পণ্ডিত এবং সুবিচারক বলে অভিহিত হন।[১৪৭] এছাড়া

সামাজিক সংহতি, ঐক্য, অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য গৌতম বুদ্ধ কৌসাম্বী সূত্রে[১৪৮] ছয়টি বিষয়ে সকলকে সর্বদা মনোযোগী থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এই ছয়টি বিষয় হলো :

১. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে ও গোপনে মৈত্রী সূচক আচরণ করা,

২. প্রকাশ্যে ও গোপনে পরস্পরের মধ্যে মৈত্রীসূলভ বাক্যালাপ করা ,

৩. প্রকাশ্যে বা গোপনে সকলের (আত্মীয় বা অনাত্মীয়) প্রতি সমভাবে আন্তরিকতা পোষণ করা,

৪. প্রকাশ্যে বা গোপনে সমবণ্টন নীতি অনুসরণ করা,

৫. পরস্পরের মধ্যে প্রকাশ্যে বা গোপনে সৎ বুদ্ধি ও পরামর্শ প্রদান করা,

৬. প্রকাশ্যে ও গোপনে একে অন্যকে নির্দোষ ও গৌরবকর জীবনাচারে উদ্বুদ্ধ করা।

এগুলো হলো, প্রতিটি ব্যক্তির আপন ইচ্ছাবশে বা ব্যক্তিগত ভাবে অনুসরণীয় নীতি বা কর্তব্য। যে গুলো প্রভাবে সমাজ সংসার শান্তি ও সম্প্রীতিভাব বিরাজিত থাকে।

সমাজে দুর্নীতি ও অরাজকতা হ্রাস

অপ্রীতিকর বা প্রতারণামূলক আচরণে ক্ষমতার ব্যবহারই দুর্নীতি। দুর্নীতির ইংরেজি শব্দ হলো (corruption)। দার্শনিক, ধর্মতাত্ত্বিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো নৈতিক বা আধ্যাত্মিক অসাধুতা বা বিচ্যুতিকে নির্দেশ করে। বৃহৎ পরিসরে ঘুষ প্রদান, সম্পত্তির আত্মসাৎ এবং সরকারী ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বার্থ চরিতার্থ করাও দুর্নীতির অন্তর্ভুক্ত। অরাজকতা হলো বিশৃঙ্খলা, রাজার শূন্যতা, নিয়মশৃঙ্খলাবিহীন অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়। ক্ষমতার অপব্যবহার, বিশৃঙ্খলা, দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে পঞ্চশীলের ভূমিকা অপরিসীম। নেশাদ্রব্য সেবনের ফলে নেশাগ্রস্থ ব্যক্তির চক্ষুদ্বয় অসূরের মত রক্তিম বর্ণ ধারণ করে। নিষ্ঠুর কর্কশ ও বদ মেজাজ স্বভাব তাদেরকে উত্তেজিত করে অঘটন ঘটায়। এছাড়া সমাজে দেখা দেয় নানা ধরনের অরাজকতা। যখন সমাজে অরাজকতা বৃদ্ধি পায় তখন মানুষের মধ্যে অন্যায়ভাবে নানাবিষয়ে প্রাপ্তির আকাঙ্খা বেড়ে যায়। তখন মানুষ হিংসা পরায়ণ হয়ে ওঠে। মানুষ হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে। যা কখনই কাম্য হতে পারে না। বুদ্ধবাণীর অহিংসামন্ত্র আজ বিশ্বসভার উদার আহ্বান। শুধু মানুষ নয়, যে কোনো প্রানির প্রতি হিংসা করা পাপ।[১৪৯] অহিংসার বাণীই সবচেয়ে

প্রাচীন এবং অর্থবহ। হিংসার চরমরূপ হত্যা। হত্যা জীবন থেকে প্রাণকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এরূপ গর্হিত কাজ বোধ হয় আর নেই। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পায় পঞ্চশীল একটি আরেকটির সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। হয়তো কেউ মাদক দ্রব্য গ্রহণ করে স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে কাম-ব্যভিচার জাতীয় পাপাচারে লিপ্ত হলো। তখন তাকে এই পাপাচার ঢাকার জন্য মিথ্যা বলতে হচ্ছে। হয়তো স্বাক্ষী গোপন রাখতে কোনো নিরপরাধ প্রাণকে হত্যা করতে হচ্ছে। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটি শীলভঙ্গ বা পাপ কিভাবে আরেকটি পাপ বা অন্যায়ের দিকে নিয়ে যায়। তাই দেখা যায়, পঞ্চশীল অবলম্বনে যদি কেউ তার জীবনকে যথাযথভাবে পরিচালিত করে তবে সেখানে দুর্নীতি ও অরাজকতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। সুতরাং সমাজে দুর্নীতি ও অরাজকতা হ্রাস করতে হলে পঞ্চশীলের চর্চা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

মানুষের ন্যায়বোধ বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে যা সমাজের ও রাষ্ট্রের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতর অবস্থানে নিয়ে যেতে বিশেষভাবে সহযোগিতা করে। আর সামাজিক ন্যায়বিচার হলো ন্যায় পরায়ণতা, নিরপেক্ষতা এবং সমতার মূর্ত প্রতীক। ধর্মপদে উক্ত রয়েছে, বৈরিতা দিয়ে কখনো বৈরিতার উপশম করা যায় না। বৈরী ভাবকে অপনোদন করতে হলে দরকার মৈত্রীর। প্রেম ও ভালবাসা দিয়ে শত্রুতা প্রশমিত করা যায়।[১৫০] বুদ্ধ ব্যষ্টিক উন্নতির চেয়ে সমষ্টির উন্নতি নিয়েই চিন্তা করেছেন বেশি। সমষ্টির উন্নয়ন ও সংহতির জন্য তিনি সাতটি বিশেষ উপদেশ দিয়েছেন।[১৫১] এগুলোকে ত্রিপিটকে "সপ্ত অপরিহানি ধর্ম"[১৫২] নামে অভিহিত করা হয়। সমাজ ও রাষ্টের ঐক্য এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে সজীব রাখার ক্ষেত্রে এই সাতটি উপদেশের গুরুত্ব অপরসীম। পঞ্চশীলে যেসকল নীতি ও নৈতিকতার কথা উল্লেখ রয়েছে যা মেনে চললে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনাচারে পরিবর্তন ঘটে ঠিক একইভাবে 'সপ্ত অপরিহানীয় ধর্ম' মানব সমাজকে একটি সুনির্দিষ্ট ও নিয়ম-নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যাতে সমাজে একটি শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হয়। এই সাতটি অপরিহানিয় ধর্ম বা সাতটি অপরিহার্য কর্তব্য কর্ম হলো :

১. সভা-সমিতির মাধ্যমে সর্বদা পারস্পারিক ভাব বিনিময় করা। কারণ যারা সভা-সমিতির মাধ্যমে নিয়মিতভাবে একত্রিত হয়, ভাবের আদান-প্রদান করে, ভবিষ্যতে তাদের সমৃদ্ধির পরিহানী হয় না।

২. সকলের উপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা, একতাবদ্ধভাবে সভায় আসা, সভা শেষ না হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করা, নতুন করণীয় বিষয় সম্পর্কে খোলামেলা আলাপ করে-এরূপ আচরণকারীদের অবনতির পথ রুদ্ধ হয়। সর্বদাই তাদের উন্নতি হয়।

৩. সামাজিক কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যেমূলকভাবে নতুন কোন নীতি বা দুর্নীতি চালু না করা, পূর্ব হতে প্রচলিত কোন সুনীতির উচ্ছেদ না করা এবং প্রাচীন নীতি-আর্দশকে অবহেলা না করা-এইরূপ চেতনাসম্পন্ন নাগরিকদের দ্বারা এবং প্রশাসকদের দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি ছাড়া অবনতি হয় না।

৪. যে সমাজে বয়োবৃদ্ধদের শ্রদ্ধা করা হয়, তাদের প্রতি যথাযথ সম্মান, গৌরব প্রদর্শন করা হয় এবং তাঁদের আদেশ-উপদেশ অনুসরণ করা হয়-সে সমাজের শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

৫. যে সমাজ জোরপূর্বক নারী বলাৎকার, অপহরণ ও নির্যাতনের মতো গর্হিত কর্ম হতে বিরত থাকবে এবং নারী জাতির প্রতি যথাযথ সম্মানসুলভ আচরণ করবে-সেই সমাজে কখনও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে না। তাদের উন্নতি অপরিহার্য।

৬. যাঁরা পূর্ব পুরুষদের নির্মিত বিধি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার, পূজা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে-তাদের পরিবারে ও সমাজে কখনও অবনতি হয়।

৭. যাঁরা সাধু-সৎ পুরুষদের (অরহতদের) সেবা করে, তাঁদের আহব্বান করে, আপ্যায়ন করে, তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করে, তাঁদের উন্নতি ছাড়া অবনতি কখনও হয় না।

সমাজে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্তস্বরূপ বজ্জিদের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে সুত্তপিটকের অর্ন্তগত দীর্ঘনিকায়ের টীকা গ্রন্থ সুমঙ্গল বিলাসীনিতে পুরাণো বজ্জিধর্ম নামক উদ্ধৃতাংশে বজ্জিগণের তৎকালীন বিচার বিভাগীয় সংবিধানের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। সেই সংবিধানে দেখা যায়-কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের জন্য প্রথমে মন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করা হত। তিনি অর্থাৎ ঐ

Dhaka University Institutional Repository

বিচার বিভাগীয় মন্ত্রি সে ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার পূর্বে তার দোষসমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে দেখতেন। যাতে নির্দোষ ব্যক্তি দণ্ডের শিকার না হয়। তিনি সেই ব্যক্তিকে নিরপরাধী মনে করলে মুক্তি দিতে পারতেন, আর যদি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে তাকে আইন বিষয়ে পরবর্তী উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন বিচার বোহারিকদের কাছে পাঠাতেন মোকদ্দমা পুনঃবিচারের জন্য।

মহামার্ত্য কিংবা বোহারিকেরা মামলার সাথে জড়িত বাদী-বিবাদী নন এবং তাঁরা নিরপেক্ষ ব্যক্তি অর্থাৎ তাঁরা রাজার কর্মচারী বা রাজার বাধ্যগত নন যদি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হয়, তাঁরা আবার বিষয়টি আইন তত্ত্বাবধায়ক সূত্রধরদের কাছে পাঠাতেন সূত্রধরেরা বিচারের সময় স্বাধীনভাবে আইনগত ব্যবস্থা নিতে পারতেন। তাঁরা যদি পূর্ববর্তী বিচারকদের বিরুদ্ধমত পোষণ করতেন তা হলে সে মোকদ্দমা পুনঃবিচারের জন্য অষ্টকূল কারকদের কাছে পাঠানোর নির্দেশ দিতেন। অষ্ঠকূল কারক হচ্ছে আটজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত আইন পরিষদ। অষ্টকূল প্রতিনিধিরা অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চিত হলে তাঁরা আবার বিচার বিভাগীয় বিধান সভার প্রধান সেনাপতির কাছে পাঠাতেন। এভাবে সেনাপতি উপরাজার কাছে, উপরাজা রাজার কাছে পাঠিয়ে আইন বিধি অনুসারে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদান করতেন।[১৫৩]

সামাজিক কল্যাণ

সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য পঞ্চশীলের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা মানুষ যদি মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকে তাহলে পরিবার সমাজ সব জায়গাতে শান্তি বিরাজ করে। সর্বাধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণ বৌদ্ধ ধর্মে মহাযানীদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। মহাযানীরা কেবল গুটিকয়েক ব্যক্তির কল্যাণে বিশ্বাস করে না। পালি সাহিত্যে ধম্মপদ গ্রন্থে বলা হয়েছে, অতি সত্বর কল্যাণ কর্ম সম্পাদন কর, পাপ থেকে চিত্তকে নিবৃত্ত রাখ, আলস্যে পুণ্য সম্পাদনকারীর মন পাপে রমিত হয়ে পড়ে।[১৫৪] পঞ্চশীলে যে কথাগুলো বলা হয়েছে তাতে স্পষ্ট হয় যে, মানবের কল্যাণের জন্য তথা মানবসমাজের কল্যাণের জন্য এ নীতিগুলো প্রণয়ন হয়েছিল। আর মানবের কল্যাণ অর্থই হলো সামাজিক কল্যাণ তা অস্বীকার করা বা উপেক্ষা করা

যায় না। যা সমাজবদ্ধ মানুষকে পাপ থেকে বিরত হয়ে কল্যাণকর কাজের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করে। এছাড়া করণীয় সুত্রে বুদ্ধ বলেছেন : পরস্পরকে বঞ্চনা করো না, কোথাও কোনভাবে কাউকে অবজ্ঞা করো না, হিংসা বা আক্রোশের বশবর্তী হয়ে পরস্পরের মধ্যে দুঃখোৎপাদন বীজ বপন করো না।[১৫৫] এভাবে বুদ্ধের প্রচেষ্টা ছিল প্রতিটি মানুষকে সৎ-সুন্দর ও নৈতিকতায় সচেতন করে গড়ে তোলা। যার প্রভাব সমাজ ও রাষ্ট্রে এবং সর্বোপরি বিশ্বে শান্তি প্রবাহিত হবে। সুতরাং বৃহত্তর মানুষের কল্যাণের জন্য সমাজের ধর্ম, বর্ণ, গোষ্ঠী, নির্বিশেষে পঞ্চশীল ব্যাপক মঙ্গল অবস্থা বিবেচ্য হয়।

সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ

বৈষম্য একটি বিশেষ্য পদ। এর অর্থ হলো অসমতা, প্রভেদ, পার্থক্য। অর্থাৎ একই প্রকৃ তিবা একই সংজ্ঞার পর্যায়ে পড়ে এমন সকল বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও একটির সাথে অন্যটির যে পার্থক্য করা হয় বা পার্থক্যের ধারণা সৃষ্টি করা করা হয়-সৈটিই হলো বৈষম্য। একইভাবে সমাজে বসবাসরত মানুষের মধ্যে নানান দিক তুলে ধরে যে পার্থক্য নির্ণয় করা হয় তাই সামাজিক বৈষম্য। আর এসকল সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে পঞ্চশীলের গুরুত্ব অপরসীম। কেননা পঞ্চশীল সমাজে বসবাসরত মানুষকে সুনির্দিষ্ট নীতির মাধ্যমে পরিচালিত হবার শিক্ষা দিয়ে থাকে। যা মানুষকে সামাজিক বৈষম্য ভুলে গিয়ে আরো বেশি মানবিক হতে শিক্ষা দেয়। পঞ্চশীলহীন সমাজ কল্পনা করা যায় না। যে কোনো ক্ষেত্রে মিথ্যাকথা বলতে গেলে সমাজে নানা রকম বিশৃঙ্খলা এবং অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্ম দেয়। ব্যভিচারও সমাজে অশান্তি ডেকে নিয়ে আসে। যার ফলশ্রুতিতে সমাজে নানা রকম বিভাজনের জন্ম দিয়ে থাকে। একইভাবে দেখা যায় সমাজের প্রতিটি শাখায় একজনের সম্পদ অন্যজন তার নিজের করে নেবার জন্য যেভাবে চেষ্টা করে তার মধ্য দিয়ে সমাজে নানা রকম বৈষম্য তৈরী হয়। অর্থাৎ, দুষ্কর্ম পরিণামে অনুতপ্ত করে। তাই অপকর্ম না করাই উত্তম। যে কাজ করলে পরিশেষে অনুতাপ করতে হয় না সেরূপ কাজ করাই উত্তম। লোভ দ্বেষ, মোহে আসক্ত হলে অনুরাগ, প্রেম, প্রীতি ও ভালোবাসার সঞ্চার হয়। আর তার থেকেই প্রিয়-অপ্রিয়ের উদ্ভব হয়। এই প্রিয়-অপ্রিয়ের ভাব থেকেই শোক, দুঃখ, বিরহ, বেদনা ও অনুতাপের সৃষ্টি হয়। এ যন্ত্রণার আগুনে তাকে দগ্ধ-বিদগ্ধ হতে হয়। কাজেই যেখানে প্রিয়ভাব

Dhaka University Institutional Repository

আছে সেখানে শোক ও ভয় বিহবলতা বর্তমান। ক্রোধ ভয়ানক। ক্রোধকে দমন করতে হবে। ক্রোধ দমনের মহত্তম উপায় হলো অক্রোধ-পরায়ণতা। সেজন্য চাই দয়া, দান, দাক্ষিণ্য, ন্যায়নিষ্ঠ, সাধুতা এবং সত্যবাদীতা।[১৫৬] অহিংসা, প্রেম ও মৈত্রী দ্বারা কায় সংযত, বাক্য সংযত এবং চিত্ত সংযত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। কায়িক দুষ্কর্ম ত্যাগ করা হয় সংযতকায়ে, আর সংযতকায়েই কুশলকর্ম সম্পাদন করতে হবে সর্বক্ষণ। তেমনি বাচনিক দুষ্কর্ম পরিহার করে সংযতবাক হতে হবে। সংযত বাক্যে মধুর ভাষণে আত্মপরহিত সাধন করতে হবে। অনুরূপভাবে সকল মানসিক দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা ত্যাগ করে চিত্তকে সমহিত করতে হবে সর্বক্ষণ। এ ত্রিদ্বারে 'যে সকল বিজ্ঞজন সংযতকায়, সংযত বাক ও সংযত মন তাঁরা সত্যি সুসংযত।'[১৫৭] সুতরাং সমাজে বৈষম্য দূরীকরণে মানুষকে সকল দিক বিবেচনা করে সঠিক কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

শোষণহীন সমাজ গঠনে

শোষণহীন সমাজ গঠনে পঞ্চশীল প্রয়োগের অত্যন্ত গুরুত্ব রয়েছে। যে কোন সমাজে শোষক ও শাষিত শ্রেনী থাকতে পারে। তবে এ শাসন যদি অতিরিক্ত শোষনে পরিণত হয় তাহলে সমাজে নানা রকম সমস্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। একটা সময় পর সেখানে বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং হিংসা-বিদ্বেষ, অন্যায়, অবিচার, ব্যভিচার, পরনিন্দা, মিথ্যাচার ইত্যাদি দ্বারা সমাজের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যায়। বুদ্ধ বিচার ও দণ্ডদানে নিরপেক্ষতার কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধ বলেছেন :

সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন ন হিংসতি।
অত্তনো সুখমেসনো পেচ্চ সো লভতে সুখং,
সুখকামানি ভূতানি যো দণ্ডেন বিহিংসতি।
অত্তনো সুখ মেসনো পেচ্চ সো ন লভতে সুখং।।[১৫৮]

অর্থাৎ, নিজের সুখের জন্য যে সুখাকাঙ্খী অন্য জীবকে দণ্ড দিয়ে হিংষা করে, পরকালে সে কখনও সুখ পায় না। নিজের সুখপ্রাপ্তির আশায় যে সুখান্বেষী অন্য জীবকে দণ্ড দিয়ে হিংসা করে, পরলোকে তার সুখ লাভ হয় না।

বুদ্ধ আরো বলেছেন :

যো দণ্ডেন অদন্তেসু অপ্পদুট্ঠেসু দুস্‌সতি।
দসন্নমঞ্ঞতরং ঠানং খিপ্পমেব নিগচ্ছতি।।
বেদনং ফরুসং জানিং সরীরস্‌স চ ভেদনং।
গরুকং বা'পি আবাধং চিত্তক্‌খপং'ব পাপুণে।।
রাজতো বা উপস্‌সগ্‌গং অব্‌ভক্‌খানং'ব দারুণং।
পরিক্‌খয়ং'ব ঞ্ঞাতীনং ভোগানং'ব পভঙ্গুরং।।
অথব'স্‌স অগারানি অগ্‌গি ডহতি পাবকো।
কায়স্‌স ভেদা দুপ্পঞ্ঞ্ঞো নিরযং সো' উপ্পজ্জতি।।[১৫৯]

অর্থাৎ, নিরস্ত্র এবং নির্দোষ ব্যক্তির উপর যে দণ্ড প্রয়োগ করে সে শীঘ্রই দশরকম প্রতিকূল অবস্থার কোন একটিতে পতিত হয়। সে তীব্র যন্ত্রণা, ক্ষয়-ক্ষতি, অঙ্গচ্ছেদ, কঠিন ব্যাধি বা চিত্ত বিক্ষেপ ঘটে, সে রাজদণ্ড, যশোহানি, নিদারুণ অপবাদ, জ্ঞাতি ও সম্পদনাশ হেতু দুঃখ পায় অথবা তার গৃহ অগ্নিদগ্ধ হয়। মৃত্যুর পর তার গতি হয় নরকে।

সুতরাং বিচারক অভিযোক্তা সকলেরই নৈতিক আচারসম্পন্ন হওয়া উচিত। এতে নিজেরই মঙ্গল হয়। ভবিষ্যৎ সুন্দর হয়। বিশেষ করে বিচারক খুবই সূক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন ও মেধাবী এবং নিরপেক্ষ চিত্তের অধিকারী হতে হবে। নতুবা বিচারকের আসনে বসে অনৈতিকভাবে কাউকে দণ্ড দিলে পরবর্তীতে তাকেই সেই সম দণ্ড ভোগ করতে হবে। অতএব শোণহীন সমাজ গঠনে পঞ্চশীলের গুরুত্ব অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, পঞ্চশীলের নৈতিক মূল্যবোধ ও পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্বের নানা দিক বিশ্লেষণ করে এই মর্মে উপনীত হওয়া যায় যে, আদর্শ ও উন্নত জীবন তথা আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় পঞ্চশীল পালন করা সকল মানুষের একান্ত কর্তব্য। এতে ব্যক্তিজীবন, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও বিকশিত হয়। মূলত ধর্মময় উৎকৃষ্ট জীবন যাপনের জন্য এই শীল পালন করা হয়। আর উচ্চতর শীলের শিক্ষা, উচ্চতর চিত্তের শিক্ষা, উচ্চতর প্রজ্ঞার শিক্ষা

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণে আমাদের ইচ্ছাশক্তিও প্রবল হয়ে থাকে। গৃহী বৌদ্ধরা সচরাচর পঞ্চশীল পালনে সচেষ্ট থাকেন। এ কারণে পঞ্চশীলকে গৃহী শীলও বলা হয়। পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে মানব জীবন সফল ও সার্থক করে তোলা সম্ভব। এই শীলসমূহ শুধু বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের জন্য পালনীয় বিষয় নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর পালনীয়। তথা আদর্শ মানব সমাজ গড়ার অন্যতম হাতিয়ার এবং মানুষে-মানুষে, সমাজ ও রাষ্ট্রে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. শান্তরক্ষিত মহাথের সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : ২০০৮, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ৯২৪

২. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *যার যা ধর্ম* (ঢাকা : ২০০৯, ঐতিহ্য প্রকাশনী), পৃ. ৪৫৮

৩. ভদন্ত ধর্মতিলক থেরো ও বীরেন্দ্র মুৎসুদ্দি অনূদিত, সদ্ধর্ম রত্নাকর (রেঙ্গুন : ১৯৩৬, বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত), পৃ. ৯৯-১০১

৪. উদ্ধৃত, ড. নীরু বড়ুয়ার অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি থিসিস, পৃ. ১৩০, দীপঙ্কর, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন-এর মুখপত্র (ঢাকা : ২০০০), পৃ. ২৯

৫. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, ড. সুমঙ্গল বড়ুয়া ও ড. বেলু রানী বড়ুয়া, বুদ্ধবাণীর মূলতত্ত্ব (ঢাকা : ২০১০, পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ, ঢা.বি.), পৃ. ১১৭

৬. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, বাদল বরণ বড়ুয়া প্রফেসর সুমঙ্গল বড়ুয়া ও প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু, সম্পাদিত, *পারিবারিক সম্প্রীতি* (থাইল্যাণ্ড : ২০০৭, ধম্মকায় ফাউণ্ডেশন), পৃ. ১৯৯

৭. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, জ্যোতিপাল স্থবির সম্পাদিত, আচার্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার (ঢাকা : ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি), পৃ. ২৫

৮. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১, Roberth Smitheram Translated, *The Five Precepts* (USA : 2011), p. 1

৯. উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০, http://www.web.singnet.com.sg/~alankhoo/precepts.html

১০.উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩১,

http://www.angelfire.com/indie/ann_ionesl/sila.html

১১. পণোভবে পাণসঞ্ঞঞ বধকচিত্তমুপক্কমো, তেন জীবিতনসো চ অঙ্গাপঞ্চ বধস্মিমে, ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্মরত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ৮৯

১২.সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সূত্তনিপাত* (রাঙ্গামাটি : ১৯৮৭), পৃ. ১০১

১৩.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী* (কলিকাতা : ১৮৯৪), পৃ. ১১৭

১৪.ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া, *খুদ্দকপাঠো* (কলিকাতা : ১৯৫৫), পৃ. ৪৫ ও ৪৬

১৫.সাধনানন্দ মহাস্থবির, *সুত্তনিপাত* (ঢাকা : ১৯৮৭), পৃ. ৩০

১৬.প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

১৭.সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক জীবিকা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

১৮. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : ১৯৮০, বাংলা একাডেমী), পৃ. ৩০১

১৯.প্রাগুক্ত, *সুত্তনিপাত*, পৃ. ১০২

২০. বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যমনিকায়*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৪০), পৃ. ৩১৩

২১.নিরয় বর্গ, গাথা ৩০৯

২২. মহম্মদ কাওছার উদ্দিন, *ধর্মীয় জীবন ও যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী* (ঢাকা : ২০০১), পৃ. ৫২

২৩. শ্রীমৎ ধর্মদীপ্তি স্থবির সংকলিত '*বুদ্ধের জীবন ও বাণী*' (চট্টগ্রাম : ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ), পৃ. ৮৬

২৪. শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৪০০), পৃ. ০৯

২৫. ভদন্ত ধর্মতিলক থেরো ও রীরেন্দ্র মুৎসুদ্দি, *সদ্ধর্ম-রত্নাকর* (তাইওয়ান : ১৯৩৬), পৃ. ১১৪

২৬. প্রাগুক্ত, *সুত্তনিপাত*, পৃ. ২৭

২৭. নীতির কাছে পরাজয়, আপন সংযম ও ধীরতার কাছে পরাজয়, সর্বোপরি নিত্য প্রতিপাল্য বিনয় বিধানের কাছে পরাজয়

Dhaka University Institutional Repository

২৮. সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : ২০০০, বাংলা একাডেমী), পৃ. ৫০

২৯. সহস্র বর্গ, পৃ.৪৭, গাথা-১০০

৩০. দণ্ডবর্গ, গাথা-১৩০, পৃ. ৫৬

৩১.প্রাগুক্ত, *সুত্তনিপাত*, পৃ. ১০২

৩২. প্রাগুক্ত, *সুত্তনিপাত*, পৃ. ৩১

৩৩. শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির ও ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু অনূদিত, *পবিত্র ত্রিপিটক* (দ্বিতীয় খন্ড) *বিনয়পিটকে পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ* (ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, বাংলাদেশ : ২০১৭), পৃ. ৫৯

৩৪. *সুত্তনিপাত*, পৃ. ২৭

৩৫. ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্মরত্নাকর*, মহামঙ্গল সূত্র (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ১৪৭

৩৬. প্রাগুক্ত

৩৭. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ, *জাতক*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৮৪ বাংলা), সংখ্যা নং ৮১

৩৮. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘনিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৬১), পৃ. ১৫০

৩৯. প্রাগুক্ত, ১৫৯

৪০. প্রাগুক্ত, *সুত্তনিপাত*, পৃ. ১০২

৪১.প্রাগুক্ত

৪২. প্রাগুক্ত

৪৩. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), মল বর্গ, গাথা নং, ১২, ১৩, ১৪

৪৪. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ ভাষান্তর ও সম্পাদিত, জাতক সমগ্র (কলকাতা : ২০১৭, কামিনী প্রকাশালয়, শ্রীশ্যামাপদ সরকার প্রকাশিত, ষষ্ঠ প্রকাশ), শীলমীমাংসা জাতক, পৃ. ২৯৫-২৯৬

৪৫. প্রাগুক্ত, মহিষ জাতক, পৃ. ২১৪-২১৫

Dhaka University Institutional Repository

৪৬. প্রাগুক্ত, শীলসুফল জাতক, পৃ. ১১৩

৪৭. প্রাগুক্ত, শীলসুফল জাতক, পৃ. ১১৪

৪৮. প্রাগুক্ত, মাতৃপোষক জাতক, পৃ. ৪৬৭-৪৬৯

৪৯. প্রাগুক্ত, রুরুমৃগ জাতক, পৃ. ৪৯৭-৪৯৯

৫০. প্রাগুক্ত, জয়দ্দিস জাতক, পৃ. ৫৪৮-৫৫১

৫১.প্রাগুক্ত, চাম্পেয় জাতক, পৃ. ৫২৭-৫৩২

৫২. প্রাগুক্ত, মাতঙ্গ জাতক, পৃ. ৫১৭-৫২৩

৫৩. প্রাগুক্ত, দশব্রাহ্মণ জাতক, পৃ. ৫১৭

৫৪. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয়, পালি সাহিত্যে ধম্মপদ (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৫৪

৫৫. শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, পালি-বাংলা অভিধান (ঢাকা : ২০০১, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), প্রথম খণ্ড, পৃ. ৭৩৬

৫৬. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয়, পালি সাহিত্যে ধম্মপদ (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৫৪

৫৭. বরীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, কথায় ধম্মপদ (ঢাকা : ১৯৬৮, অভয়তিষ্য প্রকাশনী), পৃ. ৩৪

৫৮. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয়, পালি সাহিত্যে ধম্মপদ (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৫৫

৫৯. প্রাগুক্ত, গাথা নং ১৩৪, পৃ. ৫৫

৬০. উপসম্পদা হলো পাতিমোক্ষে বর্ণিত ২২৭টি শীল পালনের ব্রতে ভিক্ষুত্ব লাভ করা।

৬১.মোহাম্মদ হারুণ-উর-রশিদ সম্পাদিত, *সহজ বাংলা অভিধান* (ঢাকা : ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১১১

৬২. সাধনানন্দ মহাস্থবির, *সুত্ত নিপাত* (রাঙ্গামাটি : ১৯৮৭), পৃ. ৪৯

৬৩. বাদল বরণ বড়ুয়া প্রফেসর সুমঙ্গল বড়ুয়া ও প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু, সম্পাদিত, *পারিবারিক সম্প্রীতি* (থাইল্যাণ্ড : ২০০৭, ধম্মকায় ফাউণ্ডেশন), পৃ. ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

৬৪. মহাস্থবির বিমলানন্দ, *সদ্ধর্মদীপিকা* (কলিকাতা : ১৯৩৬), পৃ. ১২৮-১৩৩

৬৫. সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৪, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী), পৃ. ২০-২১

৬৬. জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম্ম-রত্ন-চৈত্য* (তাইওয়ান : ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৬৪

৬৭. প্রাগুক্ত

৬৮. দণ্ড বর্গ, পৃ. ৫৬

৬৯. ধর্মাধার মহাস্থবির, *ধম্মপদ* (কলিকাতা : ১৯৫৪, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা), পৃ. ১৪৬

৭০. *পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ৬৩৫

৭১.প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪, ২৬৫

৭২. ধর্মাধার মহাস্থবির, *ধম্মপদ* (কলিকাতা : ১৯৫৪, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা), পৃ. ১৫২

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৫

৭৪. প্রাগুক্ত

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

৭৬. *মহামঙ্গল সুত্র*, পৃ. ৪১

৭৭. প্রাগুক্ত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ২, ৪, পৃ. ১-২

৭৮. *পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ১৯১

৭৯. জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম্ম-রত্ন-চৈত্য* (তাইওয়ান : ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), পৃ. ২৬৬

৮০. প্রাগুক্ত

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬, ২৬৭

৮২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

৮৩. প্রাগুক্ত

৮৪. ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্মরত্নাকর*, মহামঙ্গল সূত্র (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ১৯০

Dhaka University Institutional Repository

৮৫. প্রাগুক্ত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ৫ম খণ্ড, অট্‌ঠনিপাত, ব্যগ্‌ঘপজ্জ সূত্র।

৮৬. প্রাগুক্ত, *সদ্ধর্ম্ম-রত্ন-চৈত্য*, পৃ. ১৭৩

৮৭. ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধম্ম-রত্নাকর*, ব্যগ্‌ঘপজ্জ সূত্র (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ১৫৮

৮৮. *পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ.৬২৯-৬৩০

৮৯. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক*, মহামঙ্গল জাতক, চতুর্থ খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৮৫), পৃ.৫৩-৫৭

৯০. প্রাগুক্ত

৯১.*পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ৬৩৬

৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২০

৯৩. ক্রোধবগগো, পৃ. ১১৯

৯৪. ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬), পৃ. ১৫৮

৯৫. শ্রী বঙ্কীম চন্দ্র চাক্‌মা প্রনীত, *সদ্ধর্ম নীতি মঞ্জুরী* (চট্টগ্রাম : ১৯৭৫), পৃ. ১৫৩

৯৬. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : ১৯৮৮, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১২৫

৯৭. প্রাগুক্ত, *সদ্ধম্ম-রত্ন-চৈত্য*, পৃ. ১৭৪

৯৮. প্রাগুক্ত

৯৯. প্রাগুক্ত, *সদ্ধর্ম্ম রত্নমালা*, পৃ. ৫১

১০০.প্রাগুক্ত, *সদ্ধর্ম নীতি মঞ্জুরী*, পৃ. ১৫০

১০১. জ্যোতি পাল স্থবির অনূদিত, *আচার্য্য শান্তিদেব বোধিচর্যাবতার*, (ঢাকা : ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি), ৩-১১

১০২. শান্তরক্ষিত মহাথের সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : ২০০৭, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ৯২৬

১০৩. জ্যোতি পাল স্থবির অনূদিত, *আচার্য্য শান্তিদেব বোধিচর্যাবতার*, (ঢাকা : ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি) অষ্টম পরিচ্ছেদ, পৃ. ১২৫

১০৪. মথুরা-সুরসেনের রাজধানী মথুরা উত্তর ভারতের মথুরায় অবস্থিত ছিল। অনেকে যমুনার তীরবর্তী মূতত্র নগরের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ করে মহোলি নামক স্থানকে মথুরা রূপে চিহ্নিত করেন।

১০৫. বৈরঞ্জ-বৈরঞ্জ বা বেরঞ্জ্ মথুরার অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধের সময়ে নগরটি ছিল জনবহুল। ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত ছিল। করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন* (ঢাকা : ১৯৯৪, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৫৬-১৫৭

১০৬. *পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায় (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ৪৩১

১০৭. প্রাগুক্ত

১০৮. প্রাগুক্ত

১০৯. প্রাগুক্ত

১১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩২

১১১. *পবিত্র ত্রিপিটক* (দশম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ৩২৩

১১২. *পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ, ৩২১

১১৩. প্রাগুক্ত, *ত্রিরত্ন মঞ্জুরী*, পৃ. ১৮৬

১১৪. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত, *জাতক*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪১

১১৫. দান, প্রিয়বাক্য, হিতচর্য্যা ও সমসুখ-দুঃখতা।

১১৬. ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত, *জাতক*, ষষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ১৪১

১১৭. প্রাগুক্ত

১১৮. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১১৯. প্রাগুক্ত

১২০. প্রাগুক্ত

১২১. প্রাগুক্ত

১২২. প্রাগুক্ত

১২৩. প্রাগুক্ত

১২৪. প্রাগুক্ত

১২৫. *সহজ বাংলা অভিধান* (ঢাকা : ১৯৯৯, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৩২৩

১২৬. আর্চায্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধদর্শনে সত্য-দর্শন* (কোলকাতা : ১৯৫৩), পৃ. ১১৭

১২৭. ড. এম মতিউর রহমান, *বৌদ্ধ দর্শন : তত্ত্ব ও যুক্তি* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩), পৃ. ১৮২

১২৮. রণব্রত সেন সম্পাদিত, *ধম্মপদ* (কলিকাতা : ১৯৮৮), পৃ. ২১

১২৯. প্রিয়বর্গ, গাথা ২১৭

১৩০. আত্মবর্গ, গাথা ১৬৫

১৩১. লোকবর্গ, গাথা ২

১৩২. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যে ধম্মপদ (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৪৯

১৩৩. *ধর্মপদ*, বুদ্ধবর্গ, গাথা ১৮৩

১৩৪. ড. মো. নুরুল ইসলাম, *সমাজকর্মের ধারণা ও তত্ত্ব* (ঢাকা : ২০১৩, তাসমিয়া পাবলিকেশন), পৃ. ১৫৭

১৩৫. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), পৃ. ১৯

১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

১৩৭. প্রাগুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

১৩৮. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), পৃ. ২৫

১৩৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

১৪১. প্রাগুক্ত

১৪২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

১৪৩. প্রাগুক্ত

১৪৪. *ধম্মপদ*, গাথা নং ২১৭

১৪৫. কম্মস্‌সকোহ্মি, কম্মদাযাদো, কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণো

যং কম্মং করিস্পামি কল্যাণং বা পাপকং বা তস্‌স দাযাদো ভবিস্‌সামীতি।

দসধম্মক সূত্র, সুত্রপিটক।

১৪৬. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), গাথা, ১১২, পৃ. ৪৯

১৪৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

১৪৮. কৌসাম্বী সূত্র, মজ্‌ঝিম নিকায়, সূত্র পিটক।

১৪৯. যমক বর্গ, পৃ. ১৭ ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যে ধম্মপদ (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৬

১৫০. যমক বর্গ, পৃ. ১৭

১৫১. মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত, দীর্ঘনিকায়, সূত্রপিটক।

১৫২. সত্ত অপরিহানিযো ধম্মো-পালিতে এরূপ উচ্চারণ হয়।

১৫৩. সুত্তপিটক, দীর্ঘনিকায়, টীকা গ্রন্থ সুমঙ্গল বিলাসিনী, পুরাণো বজ্জিধর্ম দ্রস্টব্য।

১৫৪. ধম্মপদ, গাথা ১১৬, পৃ. ৫১

১৫৫. ন পরো পরং নিকুব্বেথ, নাতিমঞ্‌ঞস্‌স কত্থচি নং কঞ্চি,

ব্যারোসনা পটিঘসঞ্‌ঞা নাঞ্‌ঞমঞ্‌ঞস্‌স দুক্‌খমিচ্ছেয্য। ক্ষুদ্দক নিকায়, সুত্র পিটক।

১৫৬. সচ্চং ভণে, ন কুজ্ঝেয্য দজ্জাপ্পস্মিম্পি যাচিতো,

এতেহি তাহি ঠানেহি গচ্ছে দেবান সন্তিকে। *ধম্মপদ*, গাথা নং, ২২৪

১৫৭. কায়েন সংবুতো ধীরা অথো বাচায় সংবুতা,

মনসা সংবুতা ধীরা তে বে সুপরিসংবুতা। ধম্মপদ ; গাথা নং, ২৩৪

১৫৮. *ধম্মপদ*, ১৩১-১৩২, ক্ষুদ্দক নিকায়, সূত্র পিটক।

১৫৯. প্রাগুক্ত, ১৩৭-১৪০

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

শীলচর্চা ও সুফল

ভূমিকা

'শীল' মন ও চরিত্রের উন্নত পর্যায়ের নাম। চারিত্রিক শুদ্ধতাই ধর্ম চর্চার ভিত্তি। চরিত্র শুদ্ধ সুন্দর না হলে আধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ হয় না। পতিত জমি আবাদ করে সোনার ফসল ফলাতে হলে যেমন প্রথমেই আগাছা তুলে ফেলতে হয়, তেমনি আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ লাভের জন্য সর্বাগ্রে দুঃশীলতা বিদুরিত করে চরিত্র শোধন আবশ্যক। শীলপালনের ক্ষেত্রে প্রথমে 'পঞ্চশীল'[১], 'অষ্টশীল'[২] ও পরে 'দশশীল'[৩] পালন করতে হয়। এছাড়াও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ২২৭ শীল পালন করতে হয়। শীলবান বা শীলানুসরণকারীর চরিত্রের নির্মলতা তাঁর মনের মধ্যে বয়ে আনে আনন্দ, মনের গতি হয় সহজ সরল। এ রকম মন আধ্যাত্ম সাধনার উপযোগী হয়। যে ব্যক্তি শুধু শীলে তুষ্ট না হয়ে সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হবার জন্য সতত উদ্যমশীল হন, সেই ব্যক্তি শীল হয় নির্বাণ প্রবণ। যদি সাধক শীলানুশীলন করেন, সেই শীলের কারণে তিনি নির্ভীক হন, তাঁর বন্ধুদেরকে উন্নত করেন এবং পবিত্র পুরুষের প্রিয় হন। প্রকৃতপক্ষে, চরিত্রগঠনের নিয়মাবলিই শীল। ব্যবহারিক যে নিয়ম পালনের মাধ্যমে মানুষ উন্নত থেকে উন্নততর জীবন লাভ করতে পারে, সমাজ জীবন সুন্দর হয় এবং পরিবেশ শান্ত থাকে তা শীলের মাধ্যমে হয়ে থাকে। শীলের বহুমাত্রিক গুণাবলী মানবজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চশীলের যেসকল সামাজিক গুরুত্বের আলোচনা করা হয়েছে সেই আলোচনাকে আরো গ্রহণযোগ্য ও ব্যবহারিক জ্ঞানসমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে মানবজীবনে শীলেরচর্চা এবং পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল ও ধুতাঙ্গশীল পালনের সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী পর্যালোচনা নিম্নে তুলে হলো।

মানবজীবনে শীলের চর্চা

'শীল' শব্দের অর্থ হলো স্বাভাবিক অবস্থা, স্বভাব, অভ্যাস, নৈতিক চরিত্রের অভ্যস্ত কর্ম, সচ্চরিত্র-অভ্যাস, সদাচার, নৈতিক অনুশীলন ইত্যাদি।[৪] আর 'চর্চা' শব্দের অর্থ হলো অভ্যাস, অনুশীলন, শিক্ষা সাধনা। সুতরাং মানবজীবনে শীলের চর্চা বলতে বোঝায় শীলের অভ্যাস, শীলের অনুশীলন,

শীলের শিক্ষার সাধনা।[৫] প্রব্রজিত (Buddhist monk and Sramaṇera) হোক অথবা গৃহী (Laymen-women) হোক প্রত্যেকের শীলপালন করা একান্ত কর্তব্য। যেহেতু প্রাণীমাত্রেই সুখ আকাঙ্ক্ষা করে। শীল রক্ষা ব্যতীত ইহ-পরলোক উভয়কালে সুখ লাভের আর অন্য কোনো পথ নেই। শীল রক্ষা জনিত পুণ্য প্রভাবে দেবলোক প্রাপ্তি ঘটে, যে কোনো জন্মে বহুলভাবে ভোগসম্পদ লাভ হয় এবং অনাবিল পরম শান্তি নির্বাণও লাভ হয়। সে কারণে বিশুদ্ধভাবে যত্নের সাথে শীল রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য। শীল-রত্ন ইহ-পরলোকে সর্বশ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করে পরে নির্বাণ প্রাপ্ত করায়।

সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য শীলের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিরতি ইত্যাদি হিসেবে শীল বিভিন্নভাবে প্রদর্শিত হলেও এই বৈশিষ্ট্য কিন্তু সর্বত্র বিরাজমান। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, রূপ বহু প্রকার : নীল, হলুদ, হ্রস্ব, দীর্ঘ ইত্যাদি আকার এবং বর্ণরূপে বহু প্রকার হলেও একটি বৈশিষ্ট্য তাতে বিদ্যমান অর্থাৎ পরিদৃশ্যমানতা সর্বদা বর্তমান। শীলও তেমনি বহু প্রকার হলেও শৃঙ্খলার বৈশিষ্ট্য এবং শীলন সর্বক্ষেত্রে সমানভাবে বিদ্যমান। কায়, বাক্য এবং কর্মের মাধ্যমে এটি প্রতিপালন করা হয়। ব্যক্তিগত এবং সমাজজীবনকে এই কর্মপ্রভাব নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। শীলের কাজ দুই প্রকার-এটি দুঃশীলতাকে বিনষ্ট করে এবং ব্যক্তিকে নিরীহ করে রাখে। শীল-এর আকৃতি, প্রকৃতি বা উপস্থাপন হচ্ছে শুচিতা। আকৃতি-প্রকৃতি দেখেই কোন ব্যক্তি সমন্ধে জানা যায়। এরূপে বিশুদ্ধির প্রকৃতি দেখে শীল সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়। এই বিশুদ্ধির তিনটি বিভাগ হলো : কায়কর্ম বিশুদ্ধি, বাচনিক কর্ম বিশুদ্ধি এবং মনোকর্ম বিশুদ্ধি।[৬]

শীল অনুশীলনের প্রধান উপায় এর প্রত্যক্ষ কারণ। এটি দুই প্রকার, লজ্জা এবং বিবেক। স্বীয় বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়ে কিংবা জনমতকে বিবেচনা করে কোনো ব্যক্তি দুষ্কর্ম করতে পারে না। যদি কোনো কারণে দুষ্কর্ম সম্পাদিত হয় তবে তিনি বিবেক-দংশিত হয়ে থাকেন অথবা জনগণ কর্তৃক নিন্দিত হয়ে থাকেন। এমনকি কর্মের তারতম্য অনুসারে তাকে দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে চাই। এই কারণেই আতপ্প বা উদ্দীপনা এবং হিরি বা লজ্জা-এই দুইটি প্রাথমিক শর্তানুসারে বৈশিষ্ট্য নিরূপিত হয়েছে। এই দুইটি প্রাথমিক শর্তই বিশ্বে আইন-শৃঙ্খলা বিধান করে আসছে।

এটিই লোকপালক ধর্ম। যদি তা না হয়, তবে শুধু ব্যক্তির মধ্যে নয়, সমগ্র সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে।[৭]

বস্তুতপক্ষে, বৌদ্ধধর্মে শীলকে অতি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। নৈতিক চরিত্র এতে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এ প্রসঙ্গে দীপক কুমার বড়ুয়া বলেন,…showing moral law not merely as a veto for the immoral doer, but also as a guide for the person desiring to do well.[৮]

অর্থাৎ, এটি শুধু নৈতিক চরিত্র বর্জিতদের উদ্দেশ্যে ভেটো প্রয়োগ নয়, বরং সৎকর্ম সম্পাদনে এটি সহায়করূপে কাজ করে।

নৈতিক চরিত্র মানব জীবনের মুখ্য প্রয়োজন বলে বর্ণনা করেছেন। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য এবং কর্ম থেকে মুক্ত হবার জন্য তাঁর শিষ্যগণকে পবিত্র ও সুশীল জীবনযাপনের জন্য বলেছেন। নিম্ন স্রোতস্বিনী গঙ্গা, যমুনা, সরভূ, সরস্বতী, অচিরাবতী ও মহী প্রভৃতি মহানদীসমূহের জল দিয়ে সত্ত্বগণের পাপরূপ ময়লা ধুয়ে পরিষ্কার করতে পারে না। অথচ শীল রূপ বারি দিয়ে তা নিঃশেষে বিশোধন করা যায়। জলসিক্ত বায়ু, রক্তচন্দন, মণিহার ও স্নিগ্ধ চন্দ্রালোক জীবের অন্তর্নিহিত প্রদাহ ও জ্বালা উপশম করতে পারে না। কিন্তু উত্তমরূপে আর্যশীল প্রতিপালিত হলে সমস্ত অন্তর্দাহ উপশান্ত হয়। শীল সুভাসই উত্তম সুভাস এবং তা বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে সর্বত্রে প্রবাহিত হয়। শীল ভূষণই উত্তম ভূষণ। তাতে যে শোভা ধারণ করে সেরূপ মণিমুক্তা প্রভৃতি আভরণে ভূষিত রাজাগণের মধ্যে বিরল। শীল শীলবানের অপবাদ বিনষ্ট করে, কীর্তি ও শোভা মোহিনী আনন্দ বর্ধিত করে।[৯]

প্রাণি-হিংসা হতে বিরতি অদত্তবস্তু হতে বিরতি, ব্যভিচার হতে বিরতি, মিথ্যা কথন হতে বিরতি এবং মাদক দ্রব্য সেবন হতে বিরতি বৌদ্ধ শাস্ত্রে এগুলো পঞ্চশীল নামে অভিহিত। সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও অশান্তি উপদ্রব্যের মূল কারণ উক্ত পঞ্চবিধ পাপ কর্ম। এই সমস্ত কর্ম হতে বিরত না হলে মানবতার বিকাশ আদৌ সম্ভবপর নয়। শীল বা সদাচারকে উপেক্ষা করে কোন ব্যক্তি বা সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। চিত্ত হতেই পাপ বা পূণ্য কর্মের উদ্ভব হয়। চিত্ত বিশোধিত না হলে পাপকর্ম হতে যথার্থ বিরতি সম্ভবপর নহে। হিংসা, চৌর্য, ব্যভিচারাদি বাহ্যকর্ম

হতে বিরত হয়েও লোকে মনে মনে এই সমস্ত পাপকর্মের চিন্তা করতে পারে এবং এদের প্রতি অনুরাগ পোষণ করতে পারে। এরূপ অবস্থায় সাধনা ব্যর্থ হয়ে যায়। প্রাণি-হিংসাদি নিষিদ্ধ কর্ম হতে চিত্তবিরতি লাভ করলেই শীল সাধনা সার্থক হয়। শীল সাধনা দ্বারা যখন চিত্ত পরিশোধিত হয়ে যায়, তখনই সর্ব জীবের প্রতি যথার্থ মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবের জন্য যা সুখকর তাই সম্পাদন করবে। এর অন্যথা করবে না। জীবের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সমস্ত কুশলমূলকে বোধিতে পরিণত করা উচিত।

মানবজীবনে চিত্তের অভীপ্সা পূরণের ভিত্তি হলো শীল। পরকালের সুখ শান্তি ও উন্নত জীবনাচার লাভ করা ছাড়াও ইহ জীবনেও শীলপালনের প্রতিফল কম নয়। শীল পালনে চিত্তের চঞ্চলতা তিরোহিত হয়। চরিত্র সংযমতা বর্ধিত হয় এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দূরীভূত হয়। মানুষের সামগ্রিক চরিত্র সত্ত্বা এক মহৎ ও পরিশুদ্ধ গুণাবলীতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। সুতরাং শীল চর্চায় ইহকালিক ও পরকালিক উভয় কালেই কল্যাণময় ও মঙ্গলময় জীবন লাভ হয়ে থাকে।

মানুষের জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তরে স্তরেই রয়েছে নানা ধারার বিধিবদ্ধ নিয়ম নীতি। এই অজস্র নীতির মধ্যে কিছু সার্বজনীন ও চিরন্তনী নীতি রয়েছে যা মানুষকে করণীয়-অকরণীয় সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। চিত্ত হতেই পাপ বা পূণ্য কর্মের চেতনার উদ্ভব হয়ে থাকে। চিত্ত বিশোধিত না হলে পাপ কর্ম হতে যথার্থ বিরতি সম্ভবপর নয়। হিংসা, চৌর্যবৃত্তি, ব্যভিচার ইত্যাদি বাহ্যকর্ম হতে বিরত হয়েও লোকে মনে মনে এ সমস্ত পাপ কর্মের চিন্তা করতে পারে এবং এগুলোর প্রতি অনুরাগ পোষণ করতে পারে। সুতরাং শীল পরিশুদ্ধির জন্য ‘চিত্ত পরকর্ম বা চিত্ত শোধন একান্ত আবশ্যক। জীব হিংসা ও নিষিদ্ধ কর্মাদি হতে চিত্ত বিরতি লাভ করতে পারলেই শীলের সাধন পূর্ণতা লাভ করে। তাই চিত্ত শোধনকেই ‘শ্রেষ্ঠ শীল’ বলে বিবেচিত করা হয়। যে সকল আচারের মাধ্যমে চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে তা অবশ্যই পালন করা উচিত। নিজেকে সংযত, সুরক্ষিত নিয়ন্ত্রিত রাখাই হলো শীল এবং এটি স্ব-চিত্তের আবেগ, অনুভূতি ও আচারের মাধ্যমেই সম্ভব। চিত্তের আকুলতা ও আকাঙ্খা ছাড়া এটি কখনই সম্ভব নয়।

অকুশলের শাখা-প্রশাখা তুল্য পাপে নির্লজ্জতা, নির্ভরতা, উগ্রতা, অভিমান, ভ্রান্ত ধারণা, ঈর্ষা, কৃপণতা, অনুতাপ ও তন্দ্রালস্যতা প্রভৃতিও অকুশল ধর্মের জনক। এতে হৃদয়াশ্রিত শোণিত

কৃষ্ণবর্ণ হয়ে শরীর ও মন দূষিত করে। সুতরাং দূষিত মনে যে কোনো কর্মই করুক না কেন, সেই কর্মের বিপাক হবে দুঃখপূর্ণ। পঞ্চশীল গৃহীদের নিত্য প্রতিপালনীয় শীল। মানব জীবনে শীলের অন্যতম চর্চা হলো মহত্ব দ্বারা হীনতার অপসারণ। যখন সাধারণ মানব সারা জীবন স্বীয় দেহ সুশোভনে লিপ্ত থাকেন, তিনি তৃপ্তি লাভ করতে পারেন না।

শীল হলো নৈতিক জীবন গঠনের মূল ভিত্তি যেটি অতি সহজে বা হঠাৎ করেই অর্জন করা যায় না। নৈতিক বা ধার্মিক জীবন গঠনের জন্যে ব্যক্তিকে মহৎ ও সমৃদ্ধ চরিত্র গঠন করতে হয় যার ফলে ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন হবে সমৃদ্ধ-সমন্বয়পূর্ণ ও শান্তিময়।

তথাগত বুদ্ধ বলেছেন-যখন জ্ঞানী ব্যক্তি শীলে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তখন তিনি সকল খারাপ বা অকুশলকে অতিক্রম করেন, অকুশলবৃত্তি তার অন্তরজগত হতে বিদূরিত হয়; তিনি সতত কুশলে নিয়োজিত হন, তিনি তার মনে শান্ত-সাম্যাবস্থা আনয়ন করতে সমর্থ হন এবং তিনিই অপরিমেয়-অনিঃশেষ দুঃখের শৃঙ্খল হতে নিজেকে মুক্ত করতে সফল হন।[১০]

শীলের গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুদ্ধ বলেছেন : প্রজ্ঞা দ্বারা শীল পরিশোধিত হয়, শীল দ্বারা প্রজ্ঞা পরিশোধিত হয়। যেখানে প্রজ্ঞা সেখানেই শীল, যেখানেই শীল সেখানেই প্রজ্ঞা। শীলবান প্রজ্ঞা সম্পন্ন, প্রজ্ঞা শীল সম্পন্ন। শীল ও প্রজ্ঞা জগতে সর্বোকৃষ্ট,[১১] শারীরিক, বাচনিক ও মানসিক শুদ্ধতার সহযোগী হিসেবে শীল কাজ করে। শীলানুশীলনের মাধ্যমে আচরণকারী ব্যক্তি ক্রমাগতভাবে প্রজ্ঞা অধিগত করার স্তরে উপনীত হয়। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি তিনি সর্বপ্রকার অকুশল কাজ হতে নিজেকে বিরত রাখেন, সর্বদা খারাপ কাজ হতে সতর্ক থাকেন এবং সৎ বা কুশল কাজে নিজেকে নিয়োজিত করতে সচেষ্ট হন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, শীল প্রতিপালন ব্যতিরেখে নৈতিক আচরণ ছাড়া মনের উন্নতি কখনোই সম্ভব নয়। শীলগুলো আচরণ করতে অতি অবশ্যই জ্ঞানযুক্ত চিন্তাধারা থাকা চাই এবং জ্ঞানই নৈতিক আচরণ করতে মূল প্রেরণাশক্তি। সুতরাং যেখানে শীল বিদ্যমান সেখানে প্রজ্ঞাও বিদ্যমান। অসৎ কাজ কখনোই প্রজ্ঞা উৎপন্ন করতে পারেন না। অনৈতিকতা, দুঃশীলতাই হল অজ্ঞতা, অনুশোচনা, চঞ্চলতা, শারীরিক ও মানসিক দুঃখ-কষ্টের মূল কারণ। যার অন্তরে এগুলো বিদ্যমান তার অন্তরে কদাচিতই শান্তি সৌম্যতা বিরাজিত হয় না। অনৈতিক ও দুঃশীল জীবনাচার শান্তিপূর্ণ জীবন যাত্রার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। দুঃশীলতা

কখনোই সমন্বয়, আনন্দ, প্রীতি ও শান্তি আনয়ন করতে পারে না। বুদ্ধের শিক্ষাপোদেশে শীলের ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব বিদ্যমান। শীল বুদ্ধের শিক্ষার সর্বপ্রকার দিকে আবেষ্টন করে, এটি মুক্তি অর্জনের জন্য প্রবেশদ্বার। শীলহীনতায় মুক্তি অর্জনের পথে কোনও বাধা অতিক্রম করা যায় না। যদি শীল পরিপূর্ণ থাকে তবে সকল প্রকার কুশল উৎপন্ন হয়, কুশলের উপস্থিতিতে নিরুদ্বেগতা উৎপন্ন হয়, নিরুদ্বেগ মন সমাধি বা অন্তর্নিহিত একাগ্রতা উৎপন্ন করে। শীলের দ্বারা দুশ্চরিত্রতা বিদূরিত হয়। যত প্রকার গুণাবলী আছে তা শীলেই নিহিত। যত প্রকার কুশল গুণাবলী আছে তা শীল হতেই প্রারম্ভ হয়। সুভ সূত্রে উল্লেখ আছে- তোদেয়্য ব্রাহ্মণপুত্র সুভ মানব বুদ্ধসেবক স্থবির আনন্দকে প্রশ্ন করলেন, 'মহামানব গৌতম বুদ্ধ যে ধর্ম সমূহের প্রশংসা করতেন, যা আশ্রয় করে তিনি জনগণকে সমুত্তেজিত করতেন, যাতে তিনি তাদেরকে প্রবিষ্ট করাতেন, প্রতিষ্ঠিত করাতেন, মহানুভব আনন্দ অবশ্যই তা জানেন। বন্ধু আনন্দ, সেই মহানুভব গৌতম বুদ্ধ কোন ধর্মসমূহের প্রশংসা করতেন? তিনি জনগণকে কিসে নিযুক্তি করতেন, প্রবিষ্ট করাতেন, প্রতিষ্ঠিত করাতেন? তখন স্থবির আনন্দ বললেন, 'হে যুবক সেই ভগবান তিনটি ধর্মস্কন্ধের প্রশংসা করতেন তা হলো-আর্য শীলস্কন্ধ, আর্য সমাধিস্কন্ধ ও আর্য প্রজ্ঞাস্কন্ধ।[১২] সুভ সূত্র অধ্যায়ন করলে বুঝা যায় যে, যেই ধর্ম বুদ্ধ কর্তৃক চিন্তা করা হয়েছে ও উপদেশিত হয়েছে তা হল যাবতীয় অনিশ্চয়তা ও মানসিক-শারীরিক কষ্ট হতে মুক্তি লাভের সর্বোত্তম উপায় এবং এই মুক্তি লাভের ক্ষেত্রে শীল হল মূল ভিত্তি। সুতরাং বুদ্ধের শিক্ষার মাহাত্ম্য অধিগত করার জন্য মানবজীবনে শীল অনুশীল করা একান্ত কর্তব্য।

শীলের তাৎপর্য

পঞ্চশীল গৃহীদের নিত্য পালনীয় শীল। ততোধিক পুণ্যকামী শ্রদ্ধাবান কেউ যদি ইচ্ছা করেন, "মিথ্যাজীব সমথ অষ্টশীল"[১৩] অথবা "দশ সুচরিত শীল"[১৪] পালন করতে পারেন। অবশ্য এখানে উপোসথশীল পালনে অক্ষম ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই বলা হয়েছে। ব্রত গ্রহণে অন্তরে স্বতই একটা পবিত্রতা এসে পড়ে। সে কারণে মনীষীরা এই উভয়বিধ শীলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন।

বুদ্ধের প্রদর্শিত নীতি পালনে মঙ্গল, লঙ্ঘনে অমঙ্গল স্বতঃসিদ্ধ। সত্য-ব্রতের মাধ্যমে বিকাশ প্রাপ্ত হয় ভদ্রতা-সভ্রতা, আরও বহুবিধ সৎগুণাবলী। তৎসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে রক্ষিত হয় পঞ্চশীল।

'প্রাচীনকালে কৌশাম্বী নামক নগরে একজন ধার্মিক রাজা বাস করতেন। বিশ্বমিত্রা নামে তাঁর এক মহিষী ছিলেন। বিশ্বমিত্রা রাজার অতি প্রিয়পাত্রী ছিলেন। রানি ত্রিরত্নে প্রসন্না ও শ্রদ্ধাবতী ছিলেন এবং সর্বদা ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল পালন করতেন। একদা কোন বহিশত্রু দেশ আক্রমণ করলে রাজা চতুরঙ্গিনী সেনা নিয়ে যুদ্ধ যাত্রা করলেন। বিশ্বমিত্রাও রাজার সঙ্গে যেতে চাইলেন। তখন তিনি গর্ভবতী ছিলেন বলে রাজা যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু মহিষী কিছুতেই নিরস্ত না হওয়ায় রাজা তাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন। যেতে যেতে সংগ্রাম ভূমির নিকটস্থ যেয়ে আর অধিক দূর মহিষীর যাওয়া উচিত নহে বিবেচনা করে মহিষীকে এক নিরাপদ স্থানে রেখে রাজা যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হলেন এবং যাওয়ার সময় বলে গেলেন যে, যদি আমি পরাজিত হই তবে লালবর্ণের পতাকা উঠাবো। তুমি তা দেখতে পেলে পালিয়ে যাবে। অনেকক্ষণ যুদ্ধের পর রাজা পরাজিত হয়ে রক্তবর্ণের ধবজা উঠালেন এবং শত্রুহস্তে নিহত হলেন। তদ্দর্শনে মহিষী বিলাপ করতে করতে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু শত্রু-রাজার চরের হাতে ধরা পড়লেন। চর রানিকে নিয়ে গিয়ে রাজার হাতে সমর্পণ করলো। সে রাজা বিশ্বমিত্রা রাণীর রূপলাবণ্য দর্শনে মুগ্ধ হয়ে রাণীকে বিবাহ করার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু রানি তাতে সম্মত হলেন না। রাজা প্রথমে নানা প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু সতী সাধ্বী বিশ্বমিত্রা তাতে ভুললেন না। তারপর রাজা নানা ভয় দেখালেন। তাতেও তিনি সম্মত হলেন না দেখে রাজা তাঁকে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ফেলতে হুকুম দিলেন।'[১৫] তা শুনে বিশ্বমিত্রা নিম্নলিখিত গাথা বলে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন।

"পুরাতনেহি ভূপাল সমণে ব্রাহ্মণেপি চ
মাতাপিতুসু বালে চ রোগেনাতুর ইত্থিসু
নপ্পসত্থো বধো দেব তস্মাহং ন বধারহমি"।[১৬]

অর্থাৎ, হে রাজন ! শ্রবণ, ব্রাহ্মণ, মাতাপিতা, বালকরা, রোগীরা ও স্ত্রীদেরকে বধ করা উচিত নহে। কারণ প্রাচীন পণ্ডিতেরা এদের বধ অনুমোদন করেন নাই। এই কারণে আমিও বধ যোগ্যা নহি।" 'এ কথা শুনে রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁকে আগুনে ফেলে দিতে আদেশ

করলেন। রাজার আদেশও তৎক্ষণাৎ প্রতিপালিত হলো। মহিষী অন্য উপায় না দেখে শত্রুর প্রতিহিংসা বা বিদ্বেষভাব পোষণ না করে একান্ত মনে, একান্ত চিত্তে ত্রিশরণের গুণ স্মরণ ও শীলানুস্মৃতি ভাবনা করতে করতে আগুনে পড়ে রইলেন। ত্রিশরণের গুণের প্রভাবে ও রানির শীল-তেজে হুহু শব্দে জ্বলন্ত আগুন রানির নিকট সুশীতল জলপূর্ণ পুকুরের মত বোধ হলো। রানি যেন দারুণ গ্রীষ্মের ভয়ঙ্কর উত্তাপের সময় বরফজলপূর্ণ পুকুরে অবগাহন করে অতুল প্রীতি ও সুখ অনুভব করছিলেন। তা দেখে রাজা অত্যন্ত অনুতপ্ত হলেন এবং রানিকে অগ্নি হতে তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন কোন্ গুণে আগুনে আপনার শরীর দগ্ধ হলো না?'[১৭] তখন তিনি গুণ বর্ণনা করতে করতে নিম্নোক্ত গাথা বললেন :

"অগাহং বুদ্ধং সরণং বুদ্ধো মে সরণং ইতি
তেন তেজেন মং রাজ জলন্তো অগ্‌গি নো দহি।"[১৮]

অর্থাৎ, "হে রাজন! আমি বুদ্ধের শরণ নিয়েছিলাম। এখনও বুদ্ধই আমার শরণ। সেই শরণের তেজে জলন্ত অগ্নি আমাকে দগ্ধ করে নাই।"

'অতপর রানি সেই রাজাকে শীল মহাত্ম বর্ণনা করলেন এবং বললেন ত্রিশরণসহ শীল প্রতিপালনের ফলে আমি জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ও অতল প্রীতি ও সুখ অনুভব করছিলাম। আর কোনো মন্ত্র আমার কাছে ছিলনা। এই কথা শুনে রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন এবং এইরূপ মহাফলদায়ক পঞ্চশীল ত্রিশরণসহ প্রার্থনা করলেন। রানি ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল প্রদান করে রাজাকে শরণে ও শীলে প্রতিষ্ঠিত করলেন। রাজা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে রানির কাছে সকল দোষের ক্ষমা প্রার্থনা করলেন এবং রানির স্বামীর রাজ্য রানিকে ফিরিয়ে দিলেন।'[১৯] এমনকি বৌদ্ধদের যে চরম ধ্যেয়[২০] নির্বাণ তাও শীল পালনের দ্বারা সম্ভব হয়। তাই বলা হয়েছে :

সীলেন সুগতিং যন্তি সীলেন ভোগ সম্পদা,
সীলেন নিব্বুতিং যন্তি তস্মা সীলং বিসোধযে।[২১]

অর্থাৎ, শীল প্রতিপালন করলে লোক স্বর্গলাভ করে, নানাপ্রকার ধন সম্পত্তি লাভ করে এবং এর ফলে নির্বাণও প্রাপ্ত হয়। এই জন্য শীল বা চরিত্রকে বিশুদ্ধ করবে। কারণ শীল বিশুদ্ধির দ্বারা

শীলবানগণের নিন্দা অপবাদ আদির ভয় বিদূরীত হয় এবং সর্বদা তাদের আনন্দ ও সুকীর্তি বর্দ্ধিত হয়। আরো বলা হয়েছে :

সীল-গন্ধোসমো গন্ধে কুতো নাম ভবিস্‌সতি,

যো সমং অনুবাতে চ পটিবাতে চ বাযতি।[২২]

অর্থাৎ, শীলের গন্ধের সমান মনোময় গন্ধ নাই। এ স্বয়ং বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়, অর্থাৎ পুষ্পাদির গন্ধ বায়ুর অনুকূলে মাত্র প্রবাহিত হয়; কিন্তু শীলবানের সুখ্যাতি রূপকীর্তি গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকেও প্রবাহিত হয়।

শীল সুভাসই উত্তম সুভাস এবং তা বায়ুর অনুকূলে ও প্রতিকূলে প্রবাহিত হয়। শুধু তাই নয়, নির্বাণে উপনীত হবার প্রথম দ্বার ও স্বর্গারোহণের সোপান হলো শীল। শীল ভূষণই উত্তম ভূষণ। তাতে যে শোভা ধারণ করে সেরূপ মণিমুক্তা প্রভৃতি আবরণে ভূষিত রাজাগণের মধ্যেও বিরল। শীলই শীলবানের অপবাদ বিনষ্ট করে, কীর্তি ও শোভন মোহিনী আনন্দ বর্ধিত করে।[২৩] আর যদি কোন ভিক্ষু সহগামী ব্রহ্মচারীদের প্রিয়ভাজন, সন্তোষ, উৎপাদক, শ্রদ্ধার্জন ও সম্মানিত হতে অভিলাষী হয়ে থাকেন, তবে তাঁকে অবশ্যই সুশীল হতে হবে।[২৪]

উপরোক্ত পাঁচটি সুফল ছাড়াও বিশুদ্ধিমার্গে বুদ্ধঘোষ স্থবির শীলের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। শীলের গুনাবলী সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি গাথা উদ্ধৃত করা হলো :

আদি সীলং পতিট্‌ঠা চ কল্যাণাঞ্চা-মাতুকং,

পমুখং সব্ব-ধম্মানং তস্‌সা সীলং বিসোধয়ে।[২৫]

অর্থাৎ, আদি প্রতিষ্ঠা শীল পালন, যাবতীয় কুশলের দৃঢ় ভিত্তি, কল্যাণ কর্মের জননী, সর্ব ধর্মের শ্রেষ্ঠ এই শীল। তাই শীল বিশুদ্ধ রাখবে।

সগ্‌গারোহণ সোপানং অঞ্‌ঞ সীলসমং কুতো ?

দ্বারং খো পন নিব্বান-নগরস্‌স পবেসনে।[২৬]

অর্থাৎ, শীল স্বর্গে আরোহণ করার সিঁড়ি। স্বর্গে পৌঁছার জন্য উত্তম অন্য কোন সিঁড়ি নেই। নির্বাণরূপ নগরে প্রবেশ করার এই শীল দরজাও বটে।

সোভন্তেবং ন রাজানো মুত্তামণি বিভূসিতা,

Dhaka University Institutional Repository

যথা সোভন্তি যতিনো সীলভূসনভূসিতা।[২৭]

অর্থাৎ, শীলভূষণে ভূষিত হয়ে ভিক্ষুগণ যেরূপ শোভা পেয়ে থাকেন, মণিমুক্তা বিভূষিত হয়ে রাজারাও সেরূপ শোভা পায় না।

অত্তানুবাদাদিভযং বিদ্ধংসযতি সব্বসো,

জনেতি কিত্তিং হাসঞ্চ সীলং সীলবতং সদা।[২৮]

অর্থাৎ, শীল শীলবানদের নিন্দাদি ভয় একেবারে দূর করে এবং সর্বদা তাদের আনন্দ ও কীর্তি বৃদ্ধি করে।

গুণানং মূলভূতস্স দোসানং বল ঘাতিনো

ইতি সীলস্স বিঞ্ঞেয্যং আনিসংস কথামুখন্তি।[২৯]

অর্থাৎ, বলপূর্বক দোষসমূহের বিনাশকারী এবং গুণসমূহের মূলীভূত শীলের ফল বা পুরস্কারের প্রধান প্রধান বিষয়গুলি এখানে বলা হল। এতদ্ব্যতীত শীলপালনের আরও অনেক প্রকার আনিশংস বর্ণিত আছে।

সীলবাহি বহুমিত্তো সঞ্ঞমেনাদি গচ্ছতি,

দুস্সীলো পন মিত্তেহি ধ্বংসতে পাপমাচরং।[৩০]

অর্থাৎ, শীলবানের বহু মিত্র। দুঃশীলের পাপাচার হেতু মিত্রতা নাশ হয়। নিজে পাপে ধ্বংস হয়।

ন তং সজলদা বাতা, ন চাপি হরিচন্দনং,

নেব হারা, ন মণযো, ন চন্দকিরণঙ্কুরা,

সমযন্তীধ সত্তানং পরিলাহং সুরক্খিতং

যং সমেতিদং অরিযং সীলং অচ্চন্তসীতলং।[৩১]

অর্থাৎ, মেঘপূর্ণ শীতল বাতাস, রক্তচন্দন, নানা প্রকারের রত্নহার, মণি মাণিক্যাদি কিংবা চন্দ্রের সুশীতল কিরণ প্রাণীদের যে জ্বালা জুড়াতে পারে না এই অত্যন্ত শীতল শ্রেষ্ঠ শীল ভালরূপে প্রতিপালিত হলে সে জ্বালা জুড়িয়ে যায়।

সাসনে কুলপুত্তানং পতিট্ঠা নত্থি যং বিনা,

আনিসংস পরিচ্ছেদং তস্স সীলস্স কো বদে?[৩২]

অর্থাৎ, যেই শীল পালন ব্যতীত গৃহস্থ পুত্ররা বুদ্ধশাসনে অটলভাবে স্থিত হয়ে বৌদ্ধ নামের উপযুক্ত হতে পারেনা সেই শীলের আনিসংস বা ফল যে কত বা কি পরিমাণ তাহা নির্দিষ্ট করে কেহ বলতে পারে না।

যদি কোনো ভিক্ষু সহগামী ব্রহ্মচারীদের প্রিয়ভাজন সন্তোষ উৎপাদক শ্রদ্ধা অর্জন ও সম্মানিত হতে অভিলাষী হয়ে থাকেন তবে তাঁকে অবশ্যই সুশীল হতে হবে। শীল মীমাংসা জাতকে দেখা যায়, শীল পালনে চিত্তের সর্ববিধ ভেদ দূরীভূত হয়। অহংকার ও লোভ তিরোহিত হয় এবং পরকালের সুখ নিশ্চিত হয়।[৩৩]

শীলের সুফল

পালিতে পুণ্যের 'আনিসংস' কথা সর্বত্র দেখা যায়। 'আনিসংস' শব্দের অর্থ পুরস্কার, সুফল, কুশলফল ইত্যাদি। "সীলানিসংস" শব্দের অর্থ শীলের পুরস্কার বা শীলের সুফল; আরও সহজ কথায় শীল প্রতিপালনের সুফল। পরিশুদ্ধ শীলই কুশল ধর্মের মূল স্তম্ভ। নীতি-সম্বন্ধীয় জীবনযাপন করাই বৌদ্ধধর্মের মূল স্তম্ভ। বুদ্ধ নিজেই শীলকে বেশি মূল্যায়ন করেছেন। আর ধ্যান সাধনার প্রথম সোপান হচ্ছে শীল। শীল পালনের সুফল ইহলোকেই লাভ করা যায়। অনুতপ্ততা বা অনুশোচনাবিহীন প্রভৃতি গুণ শীল পালনে প্রতিলাভ হয়ে থাকে। সুতরাং অবিপ্পতিসার ইত্যাদি অর্থই শীলের সুফল।[৩৪] "এক সময় বুদ্ধ ধর্ম প্রচার মানসে বহুসংখ্যক ভিক্ষুসহ দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণের পর ক্রমান্বয়ে নালন্দা হতে পাটলি গ্রামে এসে উপস্থি হলেন। তথায় গ্রামবাসী, উপাসক-উপাসিকাগণ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে উত্তম খাদ্য ভোজ্য দ্বারা পূজা করলেন। বুদ্ধ আহারাদি সমাপন করে উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাগণকে ধর্মোপদেশ করার সময় শীলের ফল বর্ণনা করলেন"।[৩৫] শীল পালনে পাঁচ প্রকার সুফল লাভ হয়ে থাকে। এই পাঁচটি সুফল হলো :

ধন-সম্পত্তির অধিকারী

প্রতিটি কর্মেরই ফল রয়েছে। ঠিক একই ভাবে শীল পালনের মাধ্যমে ধন-সম্পত্তির অধিকারী হবার প্রমাণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে পালি সাহিত্যে উল্লেখ রয়েছে : 'ইধ গহপতযো সীলবা

সীলসম্পন্নো অপ্পমাদাধিকরণং মহন্তং ভোগক্খন্দং অধিগচ্ছতি, অযং পঠমো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায' ।[৩৬]

অর্থাৎ, হে গৃহপতিগণ, কোন পাপ বিষয়ে লিপ্ত না থেকে শীল রক্ষা করে স্বীয় কাজকর্মে রত থেকে শীলবান প্রচুর ধন-সম্পত্তির অধিকারী হয়ে থাকেন। এটি শীলবানের শীল পালনের প্রথম সুফল।

শীলবানের সুখ্যাতি

খ্যাতি বা সুখ্যাতি সকলেই প্রত্যাশা করে থাকেন। আর খ্যাতি বা সুখ্যাতির ধরণও ভিন্ন ভিন্ন। তবে পালি সাহিত্যে শীলবানের খ্যাতি বা সুখ্যাতি সম্পর্কে উক্ত হয়েছে যে : 'পুন চ পরং গহপতযো সীলবতো সীলসম্পন্নস্স কল্যাণো কিত্তিসদ্দো অব্ভুগ্গচ্ছতি। অযং দুতিযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায' ।[৩৭] অর্থাৎ, হে গৃহপতিগণ, পুনঃ শীলবানের সুকীর্তি সর্বত্র সুঘোষিত হয়। এটি শীলবানের শীল পালনের দ্বিতীয় সুফল। ধম্মপদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে : 'চন্দন, টগর, উৎপল কিংবা চামেলী প্রভৃতি সুগন্ধরাশি অপেক্ষা শীলবান ব্যক্তির শীলসৌরভ উৎকৃষ্টতম' ।[৩৮]

নির্ভয়ে গমন

শীলবান ব্যক্তির নির্ভয়ে গমন সম্পর্কে মহাপরিনির্বাণ সূত্রে উল্লেখ পাওয়া যায় : 'পুন চ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো যঞ্ঞদেব পরিসং উপসঙ্কমতি, যদি খত্তিয-পরিসং যদি ব্রাহ্মণ-পরিসং যদি গহপতি-পরিসং যদি সমণ-পরিসং বিসারদো উপসঙ্কমতি অমঙ্কুভূতো। অযং ততিযো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায' ।[৩৯] অর্থাৎ, হে গৃহপতিগণ, পুনঃ শীলবান ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি ও শ্রমণ এই চার প্রকারের যে কোনো সভায় যান না কেন নির্ভয়ে ও নিঃসংকোচে গমন করেন। কারণ তাঁর কোন ভয় নেই। এটি শীলবানের শীল পালনের তৃতীয় সুফল। আর যে ব্যক্তির শীল পরিপূর্ণ যারা শান্ত, স্থির ও অক্ষুব্ধ এবং সর্বদিকে সত্য জ্ঞাত হয়ে প্রশংসিত হয়েছেন কেউ তাদের পথ রুদ্ধ করতে পারে না তারা নির্ভয়ে গমন করেন। তারা কোন কিছুতেই সংকোচিত হন না।

Dhaka University Institutional Repository

সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ

এ পৃথিবীতে যার জন্ম হয়েছে তাঁর মৃত্যুবরণ করতে হবে এটা চিরন্তন সত্য। এ সত্যকে উপেক্ষা করার কারো কোন সুযোগ নেই। তবে কে কেমনভাবে বা কেমন করে দেহত্যাগ করছেন তা অত্যন্ত জরুরী। শীলবানের সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করার বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে : ‘পুন চ পরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো অসংমুল্হো কালং করোতি। অযং চতুথো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায’।[৪০]

অর্থাৎ, হে গৃহপতিগণ, পুনঃ শীলবান মৃত্যুকালে মূর্চ্ছা প্রাপ্ত না হয়ে সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করেন। এটি শীলবানের শীল পালনের চতুর্থ সুফল।

মৈত্রী সূত্রে বলা হয়েছে : ‘মৈত্রী ভাবনাকারী সুখে নিদ্রিত হয়, সুখে জাগ্রত হয়, দুঃস্বপ্ন দেখে না, মানুষদের প্রিয় হয়, অমানুষদেরও প্রিয় হয়, দেবতারা তাহাকে রক্ষা করেন, অগ্নি, বিষ কিংবা অস্ত্র তাহার কোন অনিষ্ট করে না, সহসা তাহার চিত্ত সমাধিস্থ হয়, তাহার মুখের চেহারা সতত সুপ্রসন্ন থাকে, মূর্ছিত না হয়ে তাহার দেহত্যাগ হয় এবং অর্হত্ত্বপদ প্রাপ্ত না হলেও তিনি ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন’।[৪১]

স্বর্গলোকে গমন

স্বর্গলোকে গমন ও প্রাপ্তি সম্পর্কে ত্রিপিটকের মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বলা হয়েছে : ‘পুন চ পুরং গহপতযো সীলবা সীলসম্পন্নো কাযস্স ভেদা পরম্মরণা সুগতিং সগ্গং লোকং উপ্পজ্জতি। অযং পঞ্চমো আনিসংসো সীলবতো সীলসম্পদায’।[৪২] অর্থাৎ, হে গৃহপতিগণ, পুনঃ শীলবান ব্যক্তি এই দেহ ত্যাগ করে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করে থাকেন। এটি শীলবানগণের শীলপালনের পঞ্চম সুফল। সুভূতি সূত্রে বলা হয়েছে, যেসকল ব্যক্তি কায়-বাক্য ও মন সুচরিত সমন্বিত, আর্যগণের অনিন্দুক, সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন, সম্যকদৃষ্টিজাত কর্ম করার ফলে দেহান্তে সুগতি-স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছে।[৪৩] সম্যক দৃষ্টি সূত্রে উল্লেখ আছে : ‘যারা কায়, বাক্য ও মনঃসুচরিত দ্বারা সমন্বাগত, যারা আর্যদের দুর্বাক্য বলেন না, সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন, সম্যক দৃষ্টি দ্বারা কর্ম সম্পাদনকারী তারা দেহান্তে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হন’।[৪৪]

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিবিধ সুখ প্রার্থনা করে পণ্ডিত ব্যক্তি শীল রক্ষা করেন। বুদ্ধ এটির মর্মার্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে যা বলেছিলেন তার অনুদিত অর্থ হলো :

“শীল রক্ষা করেন সদা মেধাবী নরে,
প্রার্থনা করেন ত্রিবিধ সুখের তরে;
প্রশংসা আর বিত্তলাভ যেন মোর হয়,
স্বর্গে গিয়ে অপার আনন্দ সমুদয়।
কোন কোন পাপ নাহি করে যেইজনে,
অথচ করে সেবা তারা পাপকর্মীগণে;
সংক্রমিত হন তিনি পাপকর্মে অতি,
কলঙ্কিত হবে পাপে এই তার ভীতি।
কেমন ব্যক্তির সাথে মিত্রতা করিবে,
সংসর্গ করিবে কার সাথে তাও জানিবে;
গুণবান হবে সদা এই ভব সংসারে,
আত্মবৎ বন্ধুর সঙ্গে সদা বিচরিবে;
পরিণাম দেখে জ্ঞানী সদা ভয় করে,
উচিত বলিয়া ত্যাগ করে প্রমাদেরে।
পচা মৎস্যে বাঁধে যদি তৃণ-লতা দিয়ে,
তৃণ-লতা গন্ধ হয় দেখরে চাহিয়ে;
অসৎ সংসর্গ দোষেও এমনই হয়,
গুণবানও গুনহীনে হয় গন্ধময়।
পলাশ পত্রেতে কেহ বাঁধিলে তগর,
সে পত্রে সুগন্ধ বহে মনোমুগ্ধকর;
সেরূপ পণ্ডিতের সনে যার বসতি,
তাহাতেও হয় তাঁর সুযশ সুখ্যাতি।

তেমনি আচ্ছাদিত পত্র পল্লবে মত,
জানিয়া পরিণাম নিজের যথাযথ;
পাপমিত্রের সঙ্গ ত্যাগ কর সাবধানে,
সাধুর সংসর্গ কর আনন্দিত মনে;
অশান্ত অমিত্রের হয় নিরয়ে গমন,
স্বর্গে যায় শান্ত-দান্ত পণ্ডিত সুজন।”[৪৫]

হে গৃহপতিগণ, শীলসম্পদযুক্ত শীলবানের এই পাঁচ প্রকার ফল লাভ হয়ে থাকে। শীলের দ্বিতীয় সুফল নিম্নরূপ :

১. বুদ্ধশাসনে যেই শীল ব্যতীত কুলপুত্রগণের প্রতিষ্ঠা নাই, কার সাধ্য সেই শীলের সুফল বর্ণনা করে।
২. ইহলোকে প্রাণিদের যে পাপ ময়লা গঙ্গা, যমুনা, সরযূ, সরস্বতী, নিম্নগা অচিরবতী, মহী অথবা মহানদী বিশুদ্ধ করতে অক্ষম। কিন্তু সত্ত্বদিগের সেই পাপমল একমাত্র শীলজলই পবিত্র করতে পারে।
৩. ইহলোকে মেঘপটল পূর্ণসুশীতল বায়ু, হরিদ্বর্ণ চন্দন, নানাবিধ মণিমুক্তাহারসমূহ অথবা শীতল চন্দ্রকিরণ প্রাণিদের যে দাহ উপসম করতে পারে না, তা অত্যন্ত শীতল সুরক্ষিত এই আর্য্য শীল শান্ত করতে পারে।
৪. শীলগন্ধের সমান এরূপ সুগন্ধ আর কোথায়? যা অনুকুল ও প্রতিকুল বায়ুতে সমানভাবে প্রবাহিত হয়।
৫. এই শীল স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ অথবা নির্বাণ নগরে প্রবেশের দ্বার স্বরূপ। শীলের সমান আর কি আছে?
৬. শীলরূপ অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হয়ে যতিগণ (ভিক্ষুগণ) যেরূপ শোভা পেয়ে থাকেন, মণিমুক্তাবিভূষতি রাজাগণও সেরূপ শোভা পান না।

Dhaka University Institutional Repository

৭. শীলবানদের আত্মনিন্দাদিভয় সর্ব প্রকারে বিধবংশ করে এবং শীলবানের সর্ব কীর্তি ও হর্ষ (সন্তোষ) উৎপাদন করে।

৮. এরূপে এই শীলগুণ সমূহের মূলস্বরূপ দোষসমূহের শক্তিহননকারী শীলের আনিসংশ জ্ঞাত হবে।

৯. শীল প্রতিপালন করলে স্বর্গলাভ হয়, নানা প্রকার ভোগসম্পত্তি লাভ হয় এবং নির্বাণও প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্য শীলকে বিশুদ্ধরূপে রক্ষা করবে।[৪৬]

পঞ্চশীল পালনের সুফল

সুফল হলো সুপরিণাম, ভালো ফল, কার্যসিদ্ধি। কল্যাণকর বা শুভ ফল দান করে এমন।[৪৭] পঞ্চকর্ম নিজে করা বা অন্যকে দিয়ে করানো যা-ই হোক তা দূষনীয়। এগুলি থেকে বিরত থাকার মধ্যেই পঞ্চশীলের মর্মার্থ নিহিত। পঞ্চশীল পরস্পর ভিন্ন। প্রতিপালনের ক্ষেত্রে কোনো শীলের ভঙ্গ হলেও অপরগুলি নিষ্ফল হয় না এবং একটি অপরটির প্রতিপালনে সদিচ্ছা জাগায়। বিধানানুযায়ী পঞ্চশীলের কোনোটি ভঙ্গ হলেও শীলপালনকারীর পাপফল এবং পুন্যফল কর্মানুসারে গুরু ও লঘু হয়। কুমার যশের পিতা বারাণসীর শ্রেষ্ঠীকে বুদ্ধ সর্বপ্রথম পঞ্চশীল দান করেন। তাই উক্ত শ্রেষ্ঠী ছিলেন বুদ্ধমুখনিঃসৃত পঞ্চশীলের প্রথম গ্রহীতা। বৌদ্ধমাত্রই পঞ্চশীল গ্রহণ এবং দৈনন্দিন জীবনে শ্রদ্ধা সহকারে তা পালন করা বিধেয়। এগুলি বৌদ্ধ জীবনের মূলমন্ত্র। বুদ্ধ পঞ্চশীল প্রজ্ঞাপ্ত করলেও তিনি তা পালনে বাধ্যবাধকতা আরোপ করেননি; পালন না করলে ধর্ম লুপ্ত হবে এমনও বলেননি। তবে তিনি পালনে সুফল লাভ এবং পালনে অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রতিফল ভোগের উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধ বিশ্বাস অনুসারে পঞ্চশীল অনুশীলনে নৈতিক চরিত্র গঠন ছাড়াও ভবিষ্যৎ কুশল-সম্ভাবনা বর্ধিত হয়। নিম্নে পঞ্চশীল পালনের সুফল বর্ণনা করা হলো :

১. প্রাণিহত্যা হতে বিরত নর-নারীগণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পন্ন ও দীর্ঘায়ুলাভী হয়, তাঁরা বীর্য পরাক্রম, বেগবান, দেহ সুন্দর, কোমল, পবিত্র ও মহাশক্তিশালী হয়। বাক্যালাপ কর্ণ সুখকর ও জড়তাশুন্য হয়। তাঁদের পরিষদবর্গ কেউ বিভেদ করতে পারেনা। তাঁরা নির্ভীক ও রক্ষণীয় হন। পরের আঘাতজনিত অকালমৃত্যু তাঁদের হয় না। অর্হৎগণ সমগ্র জীবন

প্রাণিহত্যা পরিত্যাগ করেন এবং প্রাণিহত্যা প্রতিবিরত হন; তাঁরা দণ্ড এবং অস্ত্র পরিহার করে সর্বজীবের প্রতি বিনীত এবং দয়ার্দ্র হয়ে অবস্থান করেন। আমিও এখন এই দিবারাত্রি প্রাণিহত্যা পরিহার করে প্রাণিহত্যা প্রতি বিরত হব, দণ্ড ও অস্ত্র পরিত্যাগ করে সর্বপ্রাণির প্রতি বিনীত ও দয়ার্দ্র হয়ে বাস করব।[৪৮] তাঁরা জনবহুল পরিবারসম্পন্ন হন। দেহ রূপলাবণ্যময়, চিরসুস্থ, শোকবিচ্ছেদ ও বেদনা বিহীন হয়ে সুখে জীবনযাপন করেন। মৃত্যুর পর আনন্দময় স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটে। "প্রাণীহত্যা পরিহার করে ইহা হতে বিরত হয়ে শ্রমণ গৌতম দণ্ড ও শস্ত্র পরিত্যাগ করেছেন, তিনি বিনয় ও দয়াশীলতার সাথে সর্বপ্রাণির প্রতি মৈত্রী ও করুণা প্রণোদিত হয়ে বিচরণ করেন।"[৪৯]

২. চুরি হতে বিরত নর-নারীগণ জন্ম-জন্মান্তরে ধন-ধান্য ও মনোজ্ঞ ভোগ-সম্পদ লাভ করে থাকেন। কষ্ট করে অর্জন করা ভোগ-সম্পদ চিরকাল নিখুঁতভাবে স্থায়ী হয়। আন্তরিকভাবে কামনা করা বস্তু অনায়সেই লাভ করেন। তারা অপরকে কখনও চৌর্যচিত্তে উৎসাহিত করেন না এবং অপরের ক্ষতি কামনাও অন্তরে পোষণ করেন না। তাদের সম্পত্তি রাজা, চোর, ডাকাত, অগ্নি-জল-যক্ষ ও শত্রু কর্তৃক কিছুতেই নষ্ট হয় না। এই সৎপুরুষগণ অতীব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাত্র নির্বাহ করে মৃত্যুর পর দিব্য আনন্দময় স্বর্গে জন্মধারণ করেন। কর্মপথ বর্গে উল্লেখ আছে যে, "চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি স্বর্গে গমন করে। যেমন নিজে অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হয়, অপরকেও অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত থাকার জন্য সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরত হওয়ার গুণ ভাষণ করে। নিঃসন্দেহে তারা স্বর্গে গমন করেন"।[৫০]

৩. ব্যভিচার হতে বিরত স্ত্রী পুরুষের মধ্যে পরস্পরের প্রিয়ভাব বর্ধিত হয়। ইন্দ্রিয় লক্ষণ সমূহ পরিপূর্ণ হয়, ভয় ও প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখহীন হয়ে সুখে দিন যাপন করেন। তারা উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য-অন্ন-পানীয়, মনোজ্ঞ পোষাক পরিচ্ছেদ প্রচুর পরিমাণে লাভ হয়, সুখে নিদ্রা যান, সুখে জাগ্রত হন এবং চর্তুবিধ অপায়ে জন্মগ্রহণ করেন না। পুরুষ স্ত্রীত্ব বা নপুংসকত্ব আর নারীগণ নপুংসকত্ব ও বন্ধ্যাত্ব হতে মুক্ত হন। সতী সাধ্বী নারীগণ ক্রমান্বয়ে পুরুষত্ব

প্রাপ্ত হন। উৎস লাগবে। "তিনি কামসুখে রঞ্জিত হন না, তাঁর মন পবিত্র, তিনি সকল অজ্ঞানতা অতিক্রান্ত হয়েছেন এবং সংস্কারধর্মসমূহে তিনি চক্ষুষ্মান বুদ্ধ"।[৫১] তারা সভা-সমিতিতে নির্ভীক ও নিঃসঙ্কোচ চিত্তে গমন ও উপবেশন করেন। কামাচার হতে বিরত নর-নারীগণ শত্রুহীন হন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ পরায়ণ হন। মিথ্যাচারী সূত্রে উল্লেখ আছে, "যে নিজে মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হয়, অপরকেও মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, মিথ্যা কামাচার হতে বিরত হওয়ার জন্য সম্মতি প্রদানকারী হয় এবং মিথ্যা কামাচার হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে এই চার প্রকার ধর্মে সমন্বিত ব্যক্তি নিঃসন্দেহে স্বর্গে গমন করেন"।[৫২]

৪. মিথ্যাভাষণ হতে বিরত সত্যবাদী নর-নারীর জন্ম-জন্মান্তরে ইন্দ্রিয় সমূহ সুপ্রসন্ন হয়, মধুর ও অনর্গল বাক্যভাষী হোন। এই মহৎ গুণাবলীর মানুষকে সবাই বিশ্বাস করে ও ভালবাসে। তাদের দন্তরাজী সমান সুশ্রী শুভ ও বিশুদ্ধ হয় এবং দেহ নাতীদীর্ঘ, নাতি-হ্রস্ব, নাতিকৃশ, নাতিস্থূল, মধ্যমাকার ও কমনীয় হয়। মুখ হতে সর্বদা পদ্ম গন্ধ নিঃসৃত হয়। পরিবারবর্গ প্রাণপণে তাদের সেবাযত্ন ও আদেশ পালন করেন। তাদের জিহ্বা পদ্মদলের ন্যায় কোমল, রক্তিম বর্ণ ও পাতলা হয়। তারা ঔদ্ধত্য ও চঞ্চলতা বর্জিত হোন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। হেমবত সুত্রে বলা হয়েছে, তিনি মিথ্যাভাষণ করেন না, তিনি কর্তব্যমুক্ত, পরনিন্দাবিরত, তিনি অর্থহীন বাক্য উচ্চারণ করেন না, তিনি বিচারের সাথে অর্থগর্ভ বাক্য উচ্চারণ করেন।[৫৩] বাস্তব ও প্রকৃত ঘটনা মিথ্যাভাষণ হতে বিরত ব্যক্তিরাই জনসম্মুখে প্রকাশ করতে পারে। সুত্তনিপাত গ্রন্থে বলা হয়েছে - যে বাক্য আত্মপীড়া দায়ক নয়, যা অপরকে আঘাত করে না, সেরূপ বাক্য বলবে ; ইহাই সুভাষিত বাক্য।[৫৪] ব্রহ্মজাল সূত্রে বলা হয়েছে, "মৃষাবাদ পরিহার করে শ্রমণ গৌতম মিথ্যাভাষণ হতে বিরত ; তিনি সত্যবাদী, তিনি সত্য হতে কখনো ভ্রষ্ট হন না ; তিনি দৃঢ়চিত্ত ও বিশ্বাসযোগ্য ; তিনি প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে বিরত।"[৫৫] মিথ্যাবাদী সূত্রে উল্লেখ আছে, নিজে মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত হয়, অপরকেও মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত থাকার জন্য উৎসাহিত করে, মিথ্যা ভাষণ হতে

বিরত থাকার সম্মতি দানকারী হয় এবং মিথ্যা ভাষণ হতে বিরত থাকার গুণ ভাষণ করে।[৫৬]

৫. মাদকদ্রব্য সেবন হতে বিরত নর-নারীগণ জন্ম-জন্মান্তরে অতীত-ভবিষৎ-বর্তমান করণীয় কর্মে সুদক্ষ ও স্মৃতিবান হন। প্রজ্ঞা, উদ্যোগ, অজড়তা, নির্ভীকতা ও অপ্রমত্ততা প্রভৃতি গুণ তাঁদের নিকট বিদ্যমান থাকে। তাদের পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। নেশাপান হতে বিরত হয়ে তারা মহাফল লাভ করে থাকেন। তারা মৃত্যুর পর অনন্ত দিব্য-সুখ-সম্পদে পরিপূর্ণ স্বর্গলোকেই উৎপন্ন হোন। সুত্তনিপাত গ্রন্থে বলা হয়েছে-পাপে অরতি এবং বিরতি, মদ্যপানে অনাসক্তি এবং কর্তব্যে তৎপরতা ইহাই সর্বোত্তম মঙ্গল।[৫৭]

সুতরাং কাউকে বঞ্চনা না করে, ক্রোধ ও বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কারও অনিষ্ট কামনা করা উচিত নয়। কেউ যদি নিজের ভূল বুঝতে পেরে শীলবান ও সম্যকদর্শী হয়ে ভোগ বাসনা দমন করে সে ব্যক্তি সব কিছুর উর্ধে অবস্থান করবে। সর্বদা শীলসম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান, সুসমাহিত, অধ্যাত্মচিন্তাকারী, স্মৃতিমান, দুস্তর প্লাবন অতিক্রম করেন।[৫৮]

অষ্টাঙ্গ উপোসথ শীল প্রতিপালনের সুফল

অষ্টশীল হলো বৌদ্ধ গৃহিভক্ত এবং উপাসক-উপাসিকাদের পূর্ণিমা, অমাবস্যা ইত্যাদি পূর্বদিনে পালনীয় আটটি শীল। সেগুলি হলো প্রাণিহত্যা, চৌর্য, ব্যভিচার, মিথ্যাভাষণ, সুরা ও মাদকদ্রব্য সেবন, বৈকালিক ভোজন, নৃত্যগীত উৎসবাদি দর্শন ও মাল্য সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা অঙ্গলেপন এবং উচ্চ শয্যা বা মহাশয্যায় শয়ন থেকে বিরত থাকা। যেহেতু ১-৫ পর্যন্ত শীলকে পঞ্চশীল বলা হয়। পঞ্চশীলকে গৃহীশীলও বলা হয়। সুতরাং ৬-৮ পর্যন্ত মোট তিনটি শীল যোগ করলে এক সঙ্গে অষ্টশীল বলে গণ্য করা হয়। প্রথম পাঁচটি শীলের পুনরাবৃত্তি না করে পরবর্তী তিনটি শীলের সুফল বর্ণনা করা হলো :

৬. নির্দিষ্টকাল অতিক্রম করে ভোজন করলে তা বিকাল ভোজন বলে গণ্য হয়। বিকাল ভোজন দ্বারা নানা প্রকার ক্লেশ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এজন্য তা নির্দিষ্ট। তাছাড়া এতে আলস্য বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ সাধনায়ও বিঘ্ন ঘটে।

৭. কুশল উৎপাদনের হেতু ভেদ করে বলে নাচ-গান বিসুখ বা বিপরীত দর্শন কথিত হয়েছে। তা দর্শন করলে কুশলোৎপত্তির হেতু নষ্ট হয়ে থাকে। নাচ-গান দর্শন ও শ্রবণের জন্য উৎসাহিত হয়ে তথায় গেলে শীল লঙ্ঘন করা হয়। ধর্মীয় গানাদি শুনলে অকুশল হয় না। দুঃশীল চেতনায় পুষ্পমাল্য সুগন্ধি চূর্ণিত পেষিত লেপন ও নানা প্রকার অলঙ্কার ধারণ উচিত নয়। অপরের সাজ-সজ্জা দেখলে শীল ভঙ্গ হয় না। সুগন্ধি প্রসাদন দ্রব্য ব্যবহার করলে কামরাগ উৎপন্ন হয়।

৮. প্রমাণ অতিক্রান্ত আসন ও অযোগ্য আস্তরনাদি বিছানো আসনে শয়ন করা উচিত নয়। তাছাড়া উচ্চাসন এবং মহাসন সাধনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেই কারণে শীলবান নর-নারীমাত্রেই সুখফলদায়ক অষ্টাঙ্গ উপোসথ-শীলপালনরূপ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সপ্রশংসাভাবে স্বর্গলাভ করে থাকেন।

অর্ধ-উপোসথ শীল পালনের সুফল বর্ণনা

নিম্নে অনাথ পিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর চাকরের জীবনের গল্পের (গঙ্গামাল জাতক) আলোকে অর্ধ-উপোসথ শীল পালনের সুফল তুলে ধরা হলো। "হিমবন্দ প্রদেশ হতে পাঁচশত তাপস কৌশাম্বিত গমণ করছিলেন। পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়ে তাঁরা বনের মধ্যে এক অতি বড় বট গাছের নিচে বসে বিশ্রাম করতে করতে দলপতি বললেন : 'এই বৃক্ষের অধিপতি দেবতা খুব বড় দেবতা এবং ক্ষমতাশালী হতে পারেন। যদি তিনি ঋষিগণকে জল পান করতে দেন তবে বড় উপকার হয়'। দেবতা জল দিলেন। তাঁরা খুব পিপাসিত ছিল। জল পান করে বড় সুখী হলো। জেষ্ঠ্য তাপস আবার ভাবল 'যদি স্নানের জল দিতেন তবে সকলে স্নান করতাম'। দেবতা অনেক জল দিলেন। তাঁরা সকলে ইচ্ছামত স্নান করলো। তারপর জেষ্ঠ্য তাপস আহারের কথা চিন্তা করলেন। দেবতা নানা প্রকার সুস্বাদু অন্ন ব্যঞ্জন দিয়ে পাঁচশত তাপসকে উদর পূর্ণ করে আহার করালেন। তারপর তপসেরা ভাবলো 'ইনি আমাদের ইচ্ছামত সবই দিচ্ছেন। কিন্তু দর্শন দিলেন না। যদি দর্শন দিতেন তাহলে দেখে নয়ণ সার্থক করতাম'। দেবতা গাছ দোফাঁক করে দর্শন দিলেন। তাপসগণ দেবতাকে দেখে বললেন : 'হে দেব আপনার ঐশ্বর্যের সীমা নাই। কিরূপে আপনি এই সম্পত্তি প্রাপ্ত হলেন'।

দেবতা নিজের অতি অল্প পুণ্যের ফল স্বরূপ এই সম্পত্তি পেয়েছি বলে লজ্জায় বলতে অনিচ্ছুক হয়ে বললেন : 'আর্য্যগণ, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করবেন না'। বার বার অনুরোধ করায় বললেন: 'আমি অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর ঘরে চাকর ছিলাম'। প্রাতে কাজে চলে যেতাম, সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে আসতাম। একদিন উপোসথের দিনে ঘরে ফিরে দেখি আমার জন্য খালি ভাত বেড়ে রাখা হয়েছে। আর কেউ ক্ষেতে আসেনি। অন্য দিন এমন সময়ে খাওয়ার জন্য হুরাহুরি পড়ে যায়। আজ একেবারে নিঃশব্দ। জিজ্ঞাসা করে জানলাম সকলে অষ্টশীল নিয়েছে। প্রাতে একবার মাত্র ভোজন করে উপোসথধারীগণ বিকালে কিছু খায় না। শ্রেষ্ঠীর বাড়ীর দাস-দাসী, চাকর-চাকরানী, এমন কি দুধের ছেলেও উপোসথ পালন করে, বিকালে কিছু খায় না। তা শুনে মনে বড় দুঃখ হলো। আমার ন্যায় দরিদ্রের আর মুক্তি কোথায়?

এই শ্রেষ্ঠীর বাড়িতেও যদি একটু পূণ্যের সুয়োগ না পাই তবে আর কোথায় যাব? আমি তাড়াতাড়ি শ্রেষ্ঠীর নিকট উপস্থিত হয়ে রাত্রে উপোসথ গ্রহণ করার সময় আছে কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। শ্রেষ্ঠী বললেন :'প্রাতে উপোসথ গ্রহণ করলে পূর্ণ উপোসথ হত, এখন গ্রহণ করলে অর্থ-উপোসথ হবে। 'ততটুকু আমার পক্ষে যথেষ্ট ভেবে' আমি উপোসথ গ্রহণ করে অনাহারে অবস্থান করেছি এবং শীল বিষয়ে ভাবনা করতে করতে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সমস্ত দিন অনাহারে থাকায় ভয়ানক পেট কামরী হলো এবং প্রাতঃকালে প্রাণ ত্যাগ করলাম। শ্রেষ্ঠীর অনুরোধ সত্ত্বেও আমি ঔষুধ মাত্রও সেবন না করে শীল রক্ষা করলাম। এই সামান্য পূণ্যের ফলে আমি এই সম্পত্তি লাভ করেছি, যা আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন। যদি একদিন উপোসথ করতাম তবে কত সুখ ও ঐশ্বর্যের অধিকারী হতাম জানি না। আর যারা সর্বদা উপোসথ রক্ষা করে তাদের সুখ ও ঐশ্বর্যের সীমা নাই।"[৫৯]

মানবগণকে শীলরূপ ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চিত্তকে সমাধি এবং প্রজ্ঞায় ভাবিত করতে হয়। যে সাধক সেভাবে প্রচেষ্টা করেন তিনিই লোভ-দ্বেষ-মোহের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করেন। অতএব, যাঁর শীল নেই, তাঁর সমাধি আসে না এবং যার সমাধি নেই তাঁর প্রজ্ঞা উৎপন্ন হয় না। এজন্য জাগতিক, আধ্যাত্মিক প্রকৃত সুখ শান্তির মার্গ আরোহণের প্রথম সোপান হলো শীল।[৬০]

দশশীল পালনের সুফল

ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত শ্রামণ বা প্রব্রজিতদের প্রত্যহ প্রতিপাল্য দশটি নিয়ম বা নীতিকে 'দশশীল' বলা হয়। গৃহীরা সংসার ত্যাগ করে প্রব্রজিত হওয়ার সময় দশশীলে দীক্ষা নেন। ভিক্ষু বা উপসম্পদা লাভের পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা দশশীল নিয়মিত পালন করেন। প্রব্রজিত শ্রামণগণ সেখিয়া ধর্মও শিক্ষা গ্রহণ করেন। শিক্ষা নীতি বলেই এগুলোকে সেখিয়া বলে। দশশীল প্রার্থনার জন্য শ্রামণকে ভিক্ষুর সামনে সুন্দরভাবে উপবেশন করে দুহাত জোড় করে সংক্ষেপে ত্রিরত্ন বন্দনা, ভিক্ষু বন্দনা করার পর দশশীল প্রার্থনা করতে হয়। অতঃপর ভিক্ষু শ্রামণকে দশশীল প্রদান করেন। দশশীল প্রার্থনাও পালি ভাষায় করতে হয়। পূর্বে যেহেতু পঞ্চশীল ও অষ্টশীলের সুফল বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং পুনরাবৃত্তি না করে শুধুমাত্র ৯-১০ এ দুটি শীলের সুফল তুলে ধরা হলো :

৯. যেহেতু উচ্চাসন ও মহাসন সাধনায় অন্তরায় সৃষ্টি করে তা পরিহার করা উত্তম। একনিষ্ঠ সাধনার যেন বিঘ্ন না ঘটে সেকারণে তা পরিহার করা বাঞ্ছনীয়।

১০. সোনা-রূপা ইত্যাদি (অর্থাৎ যেই দেশে যেই প্রকারের টাকা-পয়সার নোট প্রভৃতি প্রচলিত আছে তা) গ্রহণ হতে বিরত থাকার শিক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এগুলোর ব্যক্তিগত ভোগের মনোবাসনা থেকে গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে লোভের জন্ম হতে পারে এমনকি একনিষ্ট সাধানার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। তবে ধর্মীয় উন্নয়ন ও সংস্কার করার প্রয়োজনে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোনো বাঁধা-বিপত্তি থাকার কথা নয়।

বিভিন্ন প্রকার ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল

'সীল' বিসুদ্ধি অর্থাৎ শীল বিশুদ্ধির কর্মানুশীলন হলো ধুতাঙ্গ বা দুতাঙ্গ। ধুতাঙ্গসমূহ প্রতিপালিত হলেই জীবনের প্রকৃত বিশুদ্ধিতা বা পবিত্রতা আসে, বিশুদ্ধিতায় পূর্ণতা লাভ হয়। এতদ্‌সত্ত্বেও ধুতাঙ্গ শীল নয়। এটি শীলবানের ব্রত বা প্রাত্যহিক জীবনের করণীয় কর্মপদ্ধতি মাত্র। ধর্মীয় তথা আধ্যাত্মিক জীবনে এটি প্রত্যহ সম্পাদন করতে হয়। ধুতাঙ্গ[৬১] শীল না হলেও শীলের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল সমূহ আলোচনা করা হলো :

পাংশুকূলিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : ‘পাংশুকূলিক চীবরই তোমার প্রব্রজ্যা জীবনের আশ্রয়’ বুদ্ধের এই বাক্য পালনে নিশ্রয়ানুরূপ প্রতিপত্তি লাভ হয়। ব্রতটি দ্বারা অর্হতাদি আর্যবংশে স্থান লাভ হয়। প্রব্রজিতের উপযুক্ত পরিষ্কারই (অষ্ট পরিষ্কার) ব্যবহার হয়। অল্পমূল্যে, সুলভ এবং অনবদ্য বলে বুদ্ধকর্তৃক প্রশংসিত, প্রত্যয়, চিরপ্রসাদ উৎপাদনকারী, সম্যক প্রতিপত্তি বর্ধনকারী এবং অনাগত প্রব্রজ্যার্থীদেরকে এ আদর্শ ব্রত পালনে প্রেরণাদাতা হিসেবে অনুগ্রহকারী হয়ে থাকেন।[৬২]

ত্রিচীবরিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : এটি ভিক্ষুর আচরণীয় ব্রত। যা দ্বারা ভিক্ষু দেহ আচ্ছাদনার্থ চীবর ব্যবহার সংজ্ঞায় নিয়ত প্রত্যবেক্ষণ-বিশুদ্ধিতা লাভ করেন। তিনি অনাবশ্যকীয় বস্তু সঞ্চয় পরিহার করে বস্তু সঞ্চয়ের উপদ্রব হ্রাস করেন। তিনি বিনীত স্বভাব অর্জনে সক্ষম হন। উড্ডীয়মান পাখিতুল্য পশ্চাতে পরিত্যক্ত বস্তুর জন্যে ব্যাকুলতা পরিহার হয়। তিনি পুণ্যবান শিষ্য পরিষদ লাভ করেন। প্রাতিমোক্ষে উক্ত চীবর-সংক্রান্ত যাবতীয় দোষমুক্ত থেকে তিনি সর্বদা সংশয়বিমুক্ত চিত্তে অবস্থানে সক্ষম হন।[৬৩]

পিণ্ডপাতিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : তথাগত প্রজ্ঞাপিত ‘ভিক্ষান্নে জীবনধারণের নিমিত্তেই তোমার প্রব্রজ্যা’ নিশ্রয়ানুরূপ প্রতিপত্তি লাভ ও অর্হতাদি আর্যবংশে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। নিমন্ত্রণাদি অতিরিক্ত লাভ পরিভোগজনিত উপদ্রবমুক্ত জীবন লাভ হয়। কারো দায়বদ্ধতা স্বীকার করতে হয় না। ভিক্ষু স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে স্বাধীনভাবে যথায় ইচ্ছা গমন ও অবস্থান করতে পারেন। তাঁর আহারের জন্যে অন্যকে উৎকণ্ঠিত হতে হয় না। সুস্বাদু খাদ্যের প্রতি কোনো আকর্ষণ থাকে না। অন্যের দোষারোপের সম্ভাবনা থাকে না। আলস্যপরায়ণতা আক্রমণ করতে পারে না। জীবিকা অত্যন্ত পরিশুদ্ধ হয়। প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল পূর্ণতা লাভ করে। বিশুদ্ধ পরোপকার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। খাদ্যে সম্পর্কীয় যাবতীয় সংযমতা রক্ষিত হয়। দৈনিক একাহার এবং পিণ্ডচারণে ভ্রমণগুণে শরীর সুস্থ, জড়তা ও অলসতাহীন এবং দীর্ঘায়ু সম্পন্ন হয়। কর্কশ স্বভাব বর্জিত ও মৃদু স্বভাব লাভ হয়। মান ধ্বংস হয়, বিনয়শীলের লজ্ঘনে ভয়দর্শী হন, অল্পেচ্ছুতা মনোবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ এবং সম্যক মার্গের অনুকূল হয়।[৬৪]

সপদানচারিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : তিনি গৃহীকুলের শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, দাতা, অদাতা, ধনী, দরিদ্র, উত্তম, হীন এ সকল কোনো বিষয়ের প্রতি আসক্তি-বিরক্তি বর্জিত হয়ে সম্পূর্ণ অনাসক্ত

চিত্তে ভিক্ষান্ন সংগ্রহে সুখ উপভোগ করেন। সপদানচরিক গৃহকুলে নিত্য অপরিচিত অতিথি ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় আর্বিভূত হন। তাঁর জীবন নিশ্চিতরূপে অল্পেচ্ছু ও অল্পে তুষ্টিতা মনোবৃত্তির উপর দৃঢ় ভিত লাভে সক্ষম হয়।[৬৫]

একসনিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : তিনি নিরোগী হন। তাঁর মানসিক দুঃখ ভার লাঘব হয়, শরীর হালকা ও স্বচ্ছন্দ হয়, শারীরিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি হয়। মানসিক প্রশান্তি বর্ধিত হয়। অপর্যাপ্ত আহারেও কোনো ক্ষোভ বা অসন্তুষ্টি ভাব জাগে না। খাদ্যের রসাস্বাদন লোলুপতা ত্যাগ হয়। অল্পে তুষ্টি ও অল্পেচ্ছুতা ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এভাবে বহু প্রকারে তিনি সুখী জীবনের অধিকারী হন।[৬৬]

পাত্রপিণ্ডিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : পাত্রপিণ্ডিকের পক্ষে খাদ্য বস্তুর নানা রসাস্বাদন-তৃষ্ণা উচ্ছেদ সম্ভব হয়। অতি ইচ্ছা পরিত্যাগ হয়। আহারের প্রয়োজন কেন, সেই সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। থালা-বাটি বা নানা পাত্রের প্রতি আসক্তি ও উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে থাকেন। অল্পেচ্ছুতা তাঁর চিত্তে দৃঢ় ভিত লাভ করে।[৬৭]

খলুপশ্চাৎভক্তিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : এই ব্রতী অতিভোজনজনিত শারীরিক ও মানসিক দুঃখ উপদ্রবমুক্ত থাকেন। লোভ মাৎসর্যবশে খাদ্য সঞ্চয়জনিত অপরাধমুক্ত থাকেন। নতুনভাবে খাদ্য অন্বেষণ প্রবৃত্তি তাঁর মধ্যে জাগে না। তিনি সর্বদা অল্পেচ্ছুতা ও যথালাভে সন্তুষ্ট চিত্তের প্রশান্তিতে অবস্থান করেন।[৬৮]

আরণ্যিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : বিরূপ নিমিত্তাদি যা বৈরাগ্য চেতনার বিপরীত সেসবের অভাবে চিত্তের চাঞ্চল্যতা হ্রাস পায়, নির্জনতার ভীতি ত্রাস দূর হয়, প্রাণের মায়া দূর হয়, বিবেক প্রশান্তি লাভ হয়, পাংশুকূলিক ব্রত সম্পাদনের প্রীতিও লাভ হয়, আরণ্যিক ভিক্ষু অরণ্য-সংজ্ঞায় অলব্ধ সমাধি লাভ করেন এবং লব্ধ সমাধি সুরক্ষিত ও পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, তিনি বুদ্ধ প্রশংসিত গ্রামে বিহারে ধ্যান করার চেয়ে অরণ্যে নিদ্রা যাওয়ার শ্রেয় এ বাক্যের সম্যক উপলব্ধিতে সক্ষম হন।[৬৯]

বৃক্ষমূলিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : তিনি স্বীয় রুচিকর স্থানে শয়নাসন গ্রহণ করতেন, সংসারের যাবতীয় বিষয়ে সংস্রব ত্যাগ করেন, সকল কর্ম ও দায়িত্ব বিমুক্ত হয়ে তিনি পরিতৃপ্ত হন,

তিনি দেবসংসর্গ উপভোগ করেন, বাসস্থানের জন্যে লালায়িত হন না, অসন্তোষ প্রকাশ করেন না এবং সকলের আসক্তিও থাকে না। বৃক্ষমূলে শয়নাসন মূল্যহীন, সুলভ ও অনবদ্য সুখের কারণ হয় বলে তথাগত বুদ্ধকর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। বৃক্ষমূলে শয়নাসনে সর্বদা বৃক্ষের পত্র-পল্লবের বর্ণ পরিবর্তন ও ঝড়ে পড়ার দৃশ্যে চিত্তে অনিত্য-সংজ্ঞা প্রবল হয়। বাসস্থানের প্রতি অত্যাসক্তি এবং দালানের পর দালান তৈরির নেশা পরিত্যক্ত হয়। এ ধুতাঙ্গে চিত্তের অল্পেচ্ছুতা ভাব বৃদ্ধি করে।[৭০]

অব্‌ভোকাশিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : তিনি আবাসজনিত যাবতীয় প্রতিবন্ধকতার অবসান ঘটাতে সক্ষম হন, তন্দ্রালস্য পরিহারে সক্ষম হন, মৃগের ন্যায় অসঙ্গচারী (একক বিহারী) ও আলয়হীন ভিক্ষুজীবন বুদ্ধের উক্ত প্রশংসাবাক্যের যথার্থতা উপলব্ধিতে সক্ষম হন, সর্ববিষয়ে নির্লিপ্ততা-সুখ তাঁর অধিগত হয়, মুক্ত পাখির ন্যায় তিনি চতুর্দিকে অবাধ বিচরণশীল হতে পারেন এবং চিত্তে অল্পেচ্ছুতা ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।[৭১]

শ্মশানিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : ধুতাঙ্গ পালনকারীর নিকট মরণানুস্মৃতি সর্বদা জাগ্রত থাকে। সর্বত্র অপ্রমত্তভাব বজায় থাকে। দেহের অশুভ ভাব প্রকট হয়। কামরাগ অপনোদিত হয়। দেহের প্রকৃত স্বরূপ, স্বভাব অবলোকনের সুযোগ হয়। চিত্তে অনিত্যাদি সংবেগ প্রবল থাকে। দেহের পুষ্টতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা, শক্তিমত্তা ইত্যাদি প্রমাদবহুলতার অবসান হয়। ভয়-ভীতি সংস্কার দূরীভূত হয়। তিনি অমনুষ্যদের প্রিয় হন এবং তাদের সম্মান-গারবতা লাভ করেন। শ্মশানিকের অল্পেচ্ছুতা এবং অল্প আকাঙ্খা ভাব বৃদ্ধি পায়।[৭২]

যথাসন্থতিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : ধুতাঙ্গ পালনকারী বুদ্ধকর্তৃক উপদিষ্ট 'যথালাভে সন্তুষ্ট হওয়া কর্তব্য' এ বাক্যের সম্যক অনুশীলনে সক্ষম হন, সব্রহ্মচারীদের প্রতি সর্বদা অনুকম্পাকারী হন, 'এটা হীন, ওটা উত্তম, দ্রব্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এরূপ বাচবিচার প্রবৃত্তি পরিত্যক্ত হয়, অতিরিক্ত পাওয়ার ইচ্ছা বন্ধ হয়, অল্পে তুষ্টি ও অল্পেচ্ছুতা এই সুপ্রবৃত্তি তাঁর নিকট স্থায়ী আসন লাভ করে।[৭৩]

নৈশজ্জিক ধুতাঙ্গ শীল পালনের সুফল : নৈশজ্জিক ধুতাঙ্গ অনুশীলনকারী শয্যাসুখ, স্পর্শসুখ, মিদ্ধসুদ্ধ সুখ, এ সকল ইন্দ্রিয় কলুষতা-সংযুক্ত ভোগাকাঙ্ক্ষার মূল উচ্ছেদ করেন, যোগীর সকল প্রকার কর্মস্থান ভাবনায় আনুকূল্যতা লাভ হয়, প্রতিটি ঈর্যাপথে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয় এবং চিত্ত

Dhaka University Institutional Repository

অধিসমাধি লাভে উপযুক্ত হয়, উদ্যম-উৎসাহাদির শ্রীবৃদ্ধিতে বীর্যপরাক্রমতা লাভ হয়, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সম্যক প্রচেষ্টা এর উৎকর্ষতা সাধিত হয়।[৭৪]

ধুতাঙ্গের অষ্ট বিংশতি গুণ

ধুতাঙ্গের প্রকৃতপক্ষে অষ্ট বিংশতি গুণ[৭৫] আছে যে সকল গুণের দ্বারা ধুতাঙ্গ ব্রত সমূহ সকল বুদ্ধের প্রশংসিত ও প্রত্যাশিত হয়। অষ্ট বিংশতি গুণগুলো হলো :

১. ধুতাঙ্গ পালনকারীর জীবিকা পরিশুদ্ধ হয়;

২. ফল সুখপ্রদ হয়;

৩. জীবন নির্দোষ হয়;

৪. পরকে কোন কষ্ট দেয় না;

৫. তিনি নির্ভয়ে থাকেন;

৬. কাহাকেও পীড়ন করেন না;

৭. একান্তভাবে বর্ধিত হয়;

৮. তার পরিহানি হয় না;

৯. অমায়িক হন;

১০. ধুতাঙ্গ তাঁর পালনকারীকে রক্ষা করে;

১১. ধুতাঙ্গ পালনকারী যা ইচ্ছা করেন তা লাভ করেন;

১২. ধুতাঙ্গব্রতী সকল প্রাণীকে দমন করেন;

১৩. ধুতাঙ্গ সংযমের সহায়ক;

১৪. ধুতাঙ্গ ভিক্ষু জীবনের অনুকূল;

১৫. ধুতাঙ্গব্রতী কারও উপর আশ্রিত থাকেন না;

১৬. ধুতাঙ্গব্রতী মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ মনে থাকেন;

১৭. ধুতাঙ্গব্রতী সাংসারিক রাগ ক্ষয় করে;

১৮. দ্বেষ বা হিংসা ক্ষয় করে;

Dhaka University Institutional Repository

১৯.মোহ ক্ষয় করে;

২০. ধুতাঙ্গ পালনকারীর অভিমান থাকে না;

২১.কুচিন্তা সমুচ্ছেদ হয়;

২২. সংশয় বিদুরিত হয়;

২৩. অকর্মণ্যতা ধবংস হয়;

২৪. অসন্তোষ পরিত্যক্ত হয়;

২৫. সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি পায়;

২৬. এর পূণ্য অতুলনীয় হয়;

২৭. এর পূণ্য অনন্ত হয় এবং

২৮. ধুতাঙ্গ সর্ববিধ দুঃখকে ক্ষয় করে নির্বাণে উপনীত করে।

ধুতাঙ্গ ব্রতগুলি সম্যকরূপে যারা পালন করেন তাঁরা অষ্টদশ গুণে সমন্বিত হন।[৭৬] সেই অষ্টাদশ গুণগুলো হলো :

১. তার আচার উত্তম ও পরিশুদ্ধ হয়;

২. আচারণ পরিপূর্ণ হয়;

৩. তার কায়িক ও বাচনিক ব্যবহার সুরক্ষিত থাকে;

৪. মানসিক ব্যবহার বিশুদ্ধ হয়;

৫. তার উৎসাহ বিরাজমান থাকে;

৬. তার ভয় উপসম হয়;

৭. তার আত্ম-দৃষ্টি বিদূরিত হয়;

৮. তার প্রতিহিংসা নিবৃত্ত হয়;

৯. তার মধ্যে মৈত্রীভাব সর্বদা উপস্থিত থাকে;

১০.তার আহার সম্বন্ধে সচেতন থাকে;

১১.সমস্ত প্রাণীর মধ্যে সম্মানিত হোন;

১২.ভোজনে মাত্রাজ্ঞ হোন;

Dhaka University Institutional Repository

১৩.তার সতর্কতায় নিবিষ্ট থাকেন;

১৪.গৃহত্যাগী হোন;

১৫.যেস্থানে স্বচ্ছন্দ সেখানে বাস করেন;

১৬.পাপকে ঘৃণা করেন;

১৭.বিবেকপ্রিয় হোন এবং

১৮. সর্বদা অপ্রমত্ত বা সাবধান থাকেন।

মিলিন্দ-প্রশ্ন গ্রন্থে ধুতাঙ্গ পালনের সুফল সংক্রান্ত মতবাদ[৭৭]

ধুতাঙ্গ পালনের মহা সুফল, সুখ ও পুণ্য সম্পর্কে মহাগ্রন্থ 'মিলিন্দ-প্রশ্নে' আরও উক্ত হয়েছে : ধুতাঙ্গ-ব্রত শ্রামাণ্য বীজ বৃদ্ধি প্রাপ্তির জন্যে, ক্লেশমল দগ্ধ করার জন্যে, ঋদ্ধিবল আহরণের জন্যে, স্মৃতিসংযম রক্ষার জন্যে, বিমতি-সংশয় সমুচ্ছেদের জন্যে, তৃষ্ণা-পিপাসা নিবারণের জন্যে, ধর্মজ্ঞান সাক্ষাৎকার জন্যে, চার প্রকার স্রোত উত্তরণের জন্যে, ক্লেশরূপ ব্যাধি উপশমের জন্যে, নির্বাণ সুখ লাভের জন্যে জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, শোক, রোদন, দুঃখ, দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও ভয় নিবারণের জন্যে, শ্রামণ্য-গুণসমূহ রক্ষার নিমিত্ত, অসন্তোষ ও কুচিন্তা রোধ করার জন্যে, শ্রামণজীবনের সকল বিষয় শিক্ষার জন্যে, সর্ববিধ শ্রামণ্যগুণ প্রতিপালনের জন্যে, শমথ, বিদর্শন, মার্গ, ফল ও নির্বাণ দর্শনের জন্যে, সংসারে স্তুতি, প্রশংসায় উত্তমরূপে শোভিত হওয়ার জন্যে, সমস্ত অপায়দ্বার রুদ্ধ করার জন্যে, শ্রামণ্যফলরূপ পর্বত শিখরে আরোহণের জন্যে, বক্রকুটিল বিষয় চিত্তকে নিক্ষেপ করার জন্যে, সেবনীয় ও অসেবনীয় বিষয় উত্তমরূপে অধ্যায়ন করার জন্যে, ক্লেশরূপী শত্রুকে দূর করার জন্যে, অবিদ্যার অন্ধকার অপসারণের জন্যে, লোভ-দ্বেষ-মোহ এ ত্রিবিধ অগ্নির সন্তাপ নির্বাপণের জন্যে, অতিশয় স্বচ্ছ সূক্ষ্ম শান্ত সমাপত্তি উৎপাদনের জন্যে, শ্রেষ্ঠ বোধ্যঙ্গ রত্ন উৎপাদনের নিমিত্তে, যোগীজনের অলংকারের জন্যে, সর্ববিধ শ্রামণ্য আর্যধর্মসমূহ বশীভূত করার জন্যে। মহারাজ, এ প্রকারে এক এক ধুতাঙ্গ এ সকল গুণরাজির অধিগমে সাহায্য করে। মহারাজ, এ জন্যেই ধুতাঙ্গের গুণ অতুল্য, অনন্ত, অসীম, অপ্রতিরূপ, অপ্রতিভাগ, অত্যুত্তম, শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য, অধিক, আয়ত, বিপুল, নির্মল, বিস্তৃত, গুরু, ভারী ও মহৎ হয়।

মিলিন্দ-প্রশ্ন গ্রন্থে পাপচিত্তে ধুতাঙ্গ পালনের কুফল সংক্রান্ত মতবাদ

যে সকল ব্যক্তি হীন চেতনায় ধুতাঙ্গ-শীল পালন করেন তার পরিণাম হয় ভয়াবহ। এ প্রসঙ্গে মহাপ্রাজ্ঞ অর্হৎ ভদন্ত নাগসেন রাজা মিলিন্দকে বলেন : ‘মহারাজ, যে ব্যক্তি পাপেচ্ছু, আপন ইচ্ছার বশবর্তী, প্রতারণাকারী, লোভী, পেটুক, লাভের প্রত্যাশী, খ্যাতির প্রত্যাশী, অযোগ্য, কোনো ভাল ফল প্রাপ্ত হয়নি, অন্যায় কার্যে নিরত, অনুপযুক্ত ও অক্ষম ব্যক্তি ধুতাঙ্গ গ্রহণ করে, সে দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করে এবং পূর্বসঞ্চিত সদ্‌গুণাবলি নষ্ট করে এবং বর্তমান জন্মে সে লোকের অবহেলা, বিদ্রুপ, নিন্দা প্রতিরোধ ও বহিষ্কার, সংস্রব ত্যাগ, অপসারণ, নিগ্রহ, বিতাড়ন ও বিসর্জন লাভ করে। পরজন্মে শত যোজন বিস্তৃত অবীচি মহানরকের উষ্ণ কঠোর তপ্ত-সন্তপ্ত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত শিখামালায় অনেক লক্ষ কোটি বর্ষব্যাপী উপরে-নিচে চতুষ্পার্শ্বে ফেনপুঞ্জের ন্যায় উঠা-নামা করে পক্ব হতে থাকে। যখন তথা হতে মুক্ত হয় তখন এক বড় তৃষ্ণাদগ্ধ শ্রাবণ প্রেতরূপে বাইরে দেখতে ভিক্ষুর ন্যায় শরীর কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কালো, কৃশ এবং বধ্যভূমিতে স্ফীত ও ছিদ্রযুক্ত শির নিয়ে উপন্ন হয়। সে নিত্য ক্ষুধা ও পিপাসায় ব্যাকুল থাকে। সে দেখতে অতি কুৎসিত ও কদাকার হয়, কর্ণ ফাটা হয়, চক্ষুযুগল সারাক্ষণ উন্মীলন-নির্মীলন করতে থাকে, সর্বদেহ পূঁজে পূর্ণ ও পক্ব হতে থাকে। দেহ কীটপূর্ণ হয় আর বায়ুমুখে প্রজ্জ্বলিত মশালের ন্যায় পেট জ্বলতে থাকে। যার কারণে তার পিপাসার কখনো নিবৃত্তি হয় না। সে কোনো নিরাপদ স্থানে যেতে পারে না। তাকে বাঁচানোর জন্যে কোনো সহায়কও থাকে না। সে কাতর স্বরে রোদন করতে থাকে। এরূপ শ্রমণ মহাপ্রেত ক্ষুধা-পিপাসায় জ্বলতে জ্বলতে সংসারে ভ্রমণ করে ও উচ্চ চিৎকার করতে থাকে।

যদি কোনো অযোগ্য অপাত্র, অনুপযুক্ত, অনার্য অসদৃশ, হীন, ছোটলোক রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হয় তবে সে দণ্ড ভোগ করবে, তার হস্তাচ্ছেদ, কর্ণচ্ছেদ, পাদচ্ছেদ, নাসাচ্ছেদ হয়,... জীবিত অবস্থায় শূলে চড়ানো হয়, শিরচ্ছেদ হয়...। এটির কারণ কী ?... যেহেতু সে নিজের সীমা লঙ্ঘন করেছে। মহারাজ, এ প্রকারে যে ব্যক্তি পাপেচ্ছু...অনুপযুক্ত ও অক্ষম হয়ে ধুতাঙ্গ-ব্রত গ্রহণ করে সে উচ্চস্বরে চিৎকার করতে থাকে।’[৭৮]

পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তিতে ধুতাঙ্গ পালনে সুফল ও আশ্বাস সংক্রান্ত মতবাদ[৭৯]

ব্যক্তি চরিত্রের স্বভাব প্রবণতাকে লক্ষ করে অভিধর্মপিটকের অন্তর্গত 'পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তি' নামক গ্রন্থে ধ্বনিত হয়েছে এক পরম আশ্বাসবাণী। তা এভাবে উক্ত হয়েছে :

'যে ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত নীতি লঙ্ঘনকারী ও অনুশোচনাকারী, তিনি চিত্তবিমুক্ত ও প্রজ্ঞাবিমুক্ত উপলব্ধি করতে পারেন না। অথচ এ দুটি উপলব্ধি করতে পারলে তাঁর উৎপন্ন পাপ অকুশল ধর্মসমূহ নিঃশেষে নিরুদ্ধ হতো। তাই এ ধরনের ব্যক্তির জন্যে এমনভাবে উপদেশই প্রদানযোগ্য : 'আয়ুষ্মানের নীতি লঙ্ঘনজনিত উৎপন্ন আসক্তি পরিত্যাগ করে এবং অনুশোচনাজনিত আসক্তি বিনোদন করে চিত্ত (শমথ ভাবনা) ও প্রজ্ঞা (বিদর্শন) ভাবনায় আত্মনিয়োগ করুন; তাহলে আয়ুষ্মান অমুক পঞ্চম পুরুষ (অর্হৎ) তুল্য হতে পারবেন।' অতএব, প্রয়াস ও প্রযত্ন, উৎসাহ ও উদ্যম আমাদের জীবনের জন্যে এক পরম আশ্বাস। যার জীবনে ভ্রান্তি, অজ্ঞানতাজনিত মিথ্যা আর পাপের অন্ধকার যতই ঘনীভূত হোক না কেন, শোক, অনুশোচনায় বর্তমানে মুহূর্তকে নষ্ট না করে আমাদের কর্তব্য এই মুহূর্তেই প্রবল উৎসাহ-উদ্যম নিয়ে সম্যক প্রচেষ্টায় আত্মসমর্পিত হওয়া। এমন ব্যক্তির জীবনে অমানিশার ঘোর অন্ধকার টুটবেই, ঊষার আকাশে উজ্জ্বল সোনালি সূর্য উঠবেই তাই ধর্মপদ গ্রন্থে বুদ্ধ কর্তৃক উচ্চারিত হয়েছেঃ

'যো চ পুব্বে পমজ্জিত্বা পচ্ছা সো ন পমজ্জতি,
সো ইমং লোকং পভাসেতি অব্‌ভোমুত্তোব চন্দিমা।'[৮০]

অর্থাৎ, যে পূর্বে অজ্ঞানবশত প্রমত্ত জীবনযাপন করে পরে তা বুঝে অপ্রমত্ত জীবন যাপন করে থাকে, সে আকাশের মেঘমুক্ত চন্দ্রতুল্য স্বীয় পুণ্যালোকে উদ্ভাসিত হতে থাকে।

ধুতাঙ্গ পালনে দশ প্রকার[৮১] যোগ্য ব্যক্তি

১. ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি;
২. পাপধর্মে লজ্জাশীল ব্যক্তি;
৩. ধৈর্যশীল ব্যক্তি;
৪. অপ্রবঞ্চক ব্যক্তি;

Dhaka University Institutional Repository

৫. আত্মসংযমী ব্যক্তি;

৬. নির্লোভ ব্যক্তি;

৭. শিক্ষাকামী ব্যক্তি;

৮. দৃঢ় সংকল্পবান ব্যক্তি;

৯. কলহপরায়ণ নহেন এমন ব্যক্তি ও

১০.মৈত্রী ভাবনা অনুশীলনকারী ব্যক্তি।

ধুতাঙ্গ পালনকারীদের বৈশিষ্ট্য

ধুতাঙ্গ-শীল পালনকারী হতে হলে কায় জীবনের মমতা ত্যাগকারী এবং অল্পেচ্ছুতা সম্পন্ন হতে হয়। তাঁদেরকে টাকা-পয়সা স্পর্শক্রয়-বিক্রয় হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হয়। ব্যক্তিগত ভোগের উদ্দেশ্যে অর্থ ও দ্রব্য সঞ্চয়য়ের প্রতি আসক্তি বর্জন করতে হয়। নিজের সুখ-দুঃখকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে পরনির্ভর তথা সংঘনির্ভর হতে হয়। সংঘই তার আশ্রয় এবং সংঘই তার জীবন এমনি মানসিকতা আত্ম-পর ভেদরহিত চিত্তে ধুতাঙ্গ-শীল পালনে সমর্পিত ভিক্ষু দুর্লভ মানবজীবন লাভ করেন এবং সুদুর্লভ প্রব্রজ্যা জীবনের সদর্থ অর্জনের সৌভাগ্য অধিগত করেন।

উক্ত মহাসৌভাগ্যকামী ধুতাঙ্গ শীলপালনকারীদের রক্ষার জন্যে অতীত বুদ্ধের সময়কালে রাজা-মহারাজা ও ধনী-শ্রেষ্ঠীরা সবিশেষ তৎপর থাকতেন। বর্তমানে রাজা-মহারাজাদের সেই পৃষ্ঠপোষকতা আর নেই। তাই সম্বুদ্ধ শাসন এবং নির্বাণ শান্তিধর্মের শ্রীবৃদ্ধি ও দীর্ঘস্থায়ীত্বকামী হিতৈষীদের উচিত ধুতাঙ্গ-শীল-পালনকারী ভিক্ষু-শ্রামণদের সুখ-সুবিধা, চার প্রত্যয়, যাতায়াত ও চিকিৎসাদি সেবাকর্ম যথাসময়ে সম্পাদনের ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। তহবিল গঠনে শ্রদ্ধাবান পুণ্যার্থী দায়ক-দায়িকাদের নিকট হতে বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান ও ধর্মসভা হতে সংগৃহীত শ্রদ্ধাবান ছাড়াও ধুতাঙ্গ-শীল পালনকারী ভিক্ষুদেরকে প্রদত্ত অব্যবহার্য দানীয় সামগ্রীর মূল্য হতেও যথেষ্ট সহায়তা পাওয়া যায়।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, শীল হলো নৈতিক জীবন গঠনের মূলভিত্তি যা অতি সহজে কিংবা হঠাৎ করেই অর্জন করা যায় না। নৈতিক বা ধার্মিক জীবনগঠনের জন্যে ব্যক্তিকে মহৎ ও সমৃদ্ধ চরিত্র গঠন করতে হয় যার ফলে ব্যক্তির দৈনন্দিন, সামাজিক ও মানব জীবন হবে সমৃদ্ধ-সমন্বয়পূর্ণ ও শান্তিময়। শীল জানতে হলে শীল রক্ষা করতে হয়। শীল রক্ষিত না হলে সংসার জীবনে যেমন সুখী হওয়া যায় না, তেমনি আধ্যাত্মিক মার্গেও অগ্রসর হওয়া যায় না। শীল পালনজনিত পুরস্কার ইহজীবনেই লাভ করা যায়। বৌদ্ধধর্মে শীল অতি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়। শীল মানবজীবনকে যেমন পরিশীলিত করে তেমনি সমাজজীবনকে সুন্দর করে যা অতি সহজেই অনুমেয়। পঞ্চশীল পর্যালোচনা করলেও এটাই প্রমাণিত হয় যে, শীল হচ্ছে পরিপূর্ণ একটি সুন্দর সমাজব্যবস্থা। শীলবান ব্যক্তি ইহ জীবনে সুখে জীবনযাপন এবং কৃত পুণ্যের ফলে পরবর্তী জন্মে সুখ ও আনন্দময় জীবনযাপন করেন। উপরিউক্ত কারণে মানবজীবনে শীলের শ্রবণমুখী না হয়ে চর্চামুখী হওয়া বেশ জরুরী অধ্যায় শেষে এ কথা বলা যেতেই পারে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. পঞ্চশীল-১. পানাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ২. আদিন্নাদানা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিযামি। ৩. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৪. মুসাবাদা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিযামি। ৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি এবং অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : ২০০০, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৭০

২. অষ্টশীল-১. পানাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ২. আদিন্নাদানা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিযামি। ৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৪. মুসাবাদা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিযামি। ৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৬. বিকাল ভোজন বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৭. নচ্চ-গীত-বাদিত-বিসুকদস্সন-মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন বিভুসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৮. উচ্চা সযনা-মহাসযনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২

৩. দশশীল-১. পানাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ২. আদিন্নাদানা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিযামি। ৩. অব্রহ্মচরিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৪. মুসাবাদা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিযামি। ৫. সুরামেরয-মজ্জ-পমাদট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৬. বিকাল ভোজন বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৭. নচ্চ-গীতবাদিত বিসূকদস্সনা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৮. মালা-গন্ধ-বিলেপন-ধারণ-মণ্ডন বিভুসনট্ঠানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৯. উচ্চা সযনা-মহাসযনা বেরমণী শিক্খাপদং সমাদিযামি। ১০. জাতরূপ-রজত-পটিগ্গহণা বেরমণী সিক্খাপদং। প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩

৪. শীলরত্ন ভিক্ষু সম্পাদিত, পালি-বাংলা অভিধান (ঢাকা : ২০০২, বাংলা একাডেমি), পৃ. ২৬৫

৫. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ (ঢাকা : ২০১৫, বাংলা একাডেমি), পৃ. ৪০২

৬. সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড* (কলিকাতা : ১৯৯৪, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী), পৃ. ২৭১

৭. উ, ধম্মরতন, *গাইড থ্রু দি বিসুদ্ধিমগ্গ* (সারনাথ : ১৯৬৪), পৃ. ১

৮. Dipak Kumar Barua, *(An) Analytical Study of the Four Nikayas* (Calcutta : 1971, Rabindra Bharati University), p. 127

৯. শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত, সাধক প্রভাত চন্দ্র কর্তৃক অনুবাদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধসাধনা* (তাইওয়ান : ১৯৩৬), পৃ. ১৫

১০.শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনুদিত, *সংযুক্ত নিকায় (১ম ও ২য় খণ্ড)* (কলিকাতা : ১৯৯৬, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী), দেবতা সংযুক্ত, জটাসূত্র, পৃ. ৩০

১১.'সী পরিধোতা হি পঞ্ঞা, পঞ্ঞা পরিধোতম্ সীলম। যত্থ সীলম্ তত্থ পঞ্ঞা, যত্থ পঞ্ঞা তত্থ সীলম। সীলবতো পঞ্ঞা, পঞ্ঞাবতো সীলম্। সীলপঞ্ঞাণঞ্চ পন লোকসমিম্ অগ্গমক্খাযতি'। ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনুদিত, *পবিত্র ত্রিপিটক, (চতুর্থ খণ্ড)*

সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড) (রাঙামাটি : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ), শীলস্কন্ধ বর্গ, সোণদ সূত্র, পৃ. ১৩১

১২.ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনুদিত, *পবিত্র ত্রিপিটক, (চতুর্থ খণ্ড) সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)* (রাঙামাটি : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ), শীলস্কন্ধ বর্গ, দশম সূত্র, শুভ সূত্র, পৃ. ১৮৯-১৯০

১৩.১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ২. আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৩. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৫. পিসুনবাচা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৬. ফরুসাবাচা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৭. সম্ফপ্পলাপা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৮. মিচ্ছাজীবাবেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। শ্রীমৎ বিমলানন্দ স্থবির সঙ্কলিত, *সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা* (চট্টগ্রাম : ১৩৪৩ বাংলা), পৃ. ১৭২-১৭৩

১৪.১. পাণাতিপাতা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ২. আদিন্নাদানা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৩. কামেসু মিচ্ছাচারা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৪. মুসাবাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৫. পিসুনবাচা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৬. ফরুসাবাচা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৭. সম্ফপ্পলাপা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৮. অভিজ্ঝা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ৯. ব্যাপাদা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। ১০. মিচ্ছাট্ঠিযা বেরমণী সিক্খাপদং সমাদিযামি। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

১৫.ভদন্ত জ্ঞানালঙ্কার মহাথের, *ত্রিশরণ* (রাঙামাটি : ২০১০ মেয়েরেগা ফগদাঙি), পৃ. ৯৬-৯৮

১৬.ড. ধর্মকীর্তি ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্ন সম্ভার* (চট্টগ্রাম : ২০০৩), পৃ. ৯৪

১৭.ভদন্ত জ্ঞানালঙ্কার মহাথের, *ত্রিশরণ* (রাঙামাটি : ২০১০ মেয়েরেগা ফগদাঙি), পৃ. ৯৬-৯৮

১৮. ড. ধর্মকীর্তি ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্ন সম্ভার* (চট্টগ্রাম : ২০০৩), পৃ. ৯৪

১৯.ভদন্ত জ্ঞানালঙ্কার মহাথের, *ত্রিশরণ* (রাঙামাটি : ২০১০ মেয়েরেগা ফগদাঙি), পৃ. ৯৬-৯৮

২০. ধ্যানের যোগ্য, ধ্যানের বিষয়ীভূত, চিন্তনীয়

২১.ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া অনু. *বিশুদ্ধিমার্গ ভদন্তাচারিয় বুদ্ধঘোষ* (চট্টগ্রাম : ২০১৫), পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

২২. প্রাগুক্ত

২৩. গোপালদাস চৌধুরী ও শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী অনুদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ* (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ১০

২৪. ধর্মাধার মহাস্থবির, *মধ্যম নিকায়, ১ম খণ্ড* (কলিকাতা : ১৯৪৮, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী), পৃ. ৩৩

২৫. ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া অনু. *বিশুদ্ধিমার্গ ভদন্তাচারিয় বুদ্ধঘোষ* (চট্টগ্রাম : ২০১৫), পৃ. ১৪

২৬. প্রাগুক্ত

২৭. প্রাগুক্ত

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

২৯. প্রাগুক্ত

৩০. প্রাগুক্ত

৩১. প্রাগুক্ত

৩২. প্রাগুক্ত

৩৩. শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনুদিত, *জাতক*, তৃতীয় খণ্ড, শীলমীমাংসা জাতক (কলকাতা : সপ্তম মুদ্রণ, চৈত্র ১৪২২, করুণা প্রকাশনী), পৃ. ১১৫

৩৪. ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনুদিত, *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়, দশক ও একাদশ নিপাত*, আনিশংস বর্গ (রাঙ্গামাটি, রাজবন বিহার : ২০১১ খিস্টাব্দ), পৃ. ২-৩

৩৫. ভদন্ত ধর্মতিলক থেরো ও বীরেন্দ্র মুৎসুদ্দি অনূদিত, সদ্ধর্ম রত্নাকর (রেঙ্গুন : ১৯৩৬, বৌদ্ধ-মিশন প্রেসে মুদ্রিত), পৃ. ৯৭

৩৬. রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, সঙ্কলিত ও অনূদিত, *মহাপরিনিব্বান সুত্তং* (তাইওয়ান : ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ), পৃ. ২৯

৩৭. প্রাগুক্ত

৩৮. শ্রীশান্তরক্ষিত স্থবির, *ধম্মপদ*, ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট (কলিকাতা : ১৯৫৪, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী), পুপফবগগো, পৃ. ২২

Dhaka University Institutional Repository

৩৯. রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, সঙ্কলিত ও অনূদিত, *মহাপরিনিব্বান সুত্তং* (তাইওয়ান : ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ), পৃ. ২৯

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১.ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনুদিত, সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়, দশক ও একাদশ নিপাত, অনুস্মৃতি বর্গ, পঞ্চম সূত্র, মৈত্রী সূত্র (রাঙামাটি, রাজবন বিহার : ২০১১), পৃ. ৪৪৭

৪২. রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, সঙ্কলিত ও অনূদিত, *মহাপরিনিব্বান সুত্তং* (তাইওয়ান : ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ), পৃ. ২৯

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪১

৪৪. পবিত্র ত্রিপিটক, (একাদশ খণ্ড) *খুদ্দকনিকায়ে ইতিবুত্তক* (রাঙ্গামাটি : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ), পৃ. ৩৬৬

৪৫. ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির অনুদিত, *ইতিবুত্তক* (রাজবন বিহার, রাঙামাটি : ২০১২ খ্রিস্টাব্দ, সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ), পৃ. ৬৪-৬৫

৪৬. Buddha The Attabinsoti, https://m.facebook.com>photos

৪৭. ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, ব্যবহারিক বাংলা অভিধান (ঢাকা : ২০১৫, বাংলা একাডেমি, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ), পৃ. ১১৬১

৪৮. পবিত্র ত্রিপিটক (দশম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ২৯৮

৪৯. *পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ৬৩৩

৫০. ভিক্ষু শীলভদ্র, *দীর্ঘ নিকায়*, ১ম-৩য় খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৫৩-১৩৬১ বঙ্গাব্দ, মহাবোধি সোসাইটি), পৃ. ৩

৫১.প্রাগুক্ত, সুত্তনিপাত, পৃ. ৪১

৫২. *পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ৬৩৩-৬৩৪

Dhaka University Institutional Repository

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭

৫৫. প্রাগুক্ত, *দীর্ঘ নিকায়*, পৃ. ৪

৫৬. *পবিত্র ত্রিপিটক* (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ২০১৭, ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি), পৃ. ৬৩৪

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

৫৯. রত্ন মালা (তাইওয়ান : দি করপর‍্যাট বডি অব দি বুদ্ধ এডুকেশনাল ফাউন্ডেশন), পৃ. ৭৪-৭৬।

৬০. https://nirvanapeace.com>vinaya-pitaka

৬১.ভিক্ষুর অতিরিক্ত আচার বা নিয়মনিষ্ঠতা, নিয়মের অতিরিক্ত কঠোর ব্রত। ধুতঙ্গ ১৩ প্রকার। এই ১৩টি ধুতঙ্গ বিনয় পিটকের সাথে সংযুক্ত নয়, বিশেষভাবে বিশুদ্ধিমার্গেই এর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বিনয়ের প্রতি গৌরব করে এবং উৎসাহিত হয়ে বিনয়ের অতিরিক্ত স্বতন্ত্রভাবে কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠতা রক্ষার জন্য বুদ্ধের সময়কালে শ্রদ্ধাবান ভিক্ষুদের মধ্যে কেহ কেহ একটি ধুতঙ্গ ব্রত, কেহ কেহ দুইটি ধুতঙ্গ ব্রত কেহ কেহ সম্পূর্ণ ১৩টি ধুতঙ্গ ব্রত সারাজীবনের জন্য গ্রহণ করে পালন করেছিলেন। এদের মধ্যে একমাত্র মহাকশ্যপ স্থবির জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একসঙ্গে ১৩টি ধুতাঙ্গব্রত পালন করেছিলেন। শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, পালি-বাংলা অভিধান (ঢাকা : ২০০১, বৌদ্ধধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট), পৃ. ৮১৫

৬২. ভিক্‌খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (কল্পতরু, রাঙামাটি : বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ২৯

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩১

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

৬৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮

৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০

৬৮. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (কল্পতরু, রাঙামাটি : বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৪২

৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭

৭১.ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (কল্পতরু, রাঙামাটি : বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৪৯-৫০

৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪

৭৫. পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক অনুদিত, *মিলিন্দ-প্রশ্ন*, পুণঃমুদ্রণঃ (কোলকাতা ২০০৫ : খ্রী., মহাবোধি বুক এজেন্সী), পৃ. ৩৪১-৩৪২

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮

৭৯. ভদন্ত জ্যোতিপাল মহাথের অনুদিত, *পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, পুদগল প্রজ্ঞপ্তি (মানব চরিত্রের স্বরূপ*), (লাকসাম, কুমিল্লা : ১৯৬৩), পৃ. ২৭

৮০. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), লোক বর্গ, গাথা নং ১৭২, পৃ. ৬৮

৮১. ভিক্খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (কল্পতরু, রাঙামাটি : বাংলাদেশ, ১৯৯৮), পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

মানবতার বিকাশে শীল প্রয়োগ

ভূমিকা

পূর্বোক্ত চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ে পঞ্চশীল, অষ্টশীল, দশশীল, পাতিমোক্ষ সংবর, ইন্দ্রিয় সংবর, আজীব পারিসুদ্ধি এবং পচ্চয় সন্নিস্‌সিত শীল সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। একই সাথে শীলচর্চা ও শীলের সুফল নিয়ে আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উক্ত আলোচনা হতে কীভাবে মানবতার বিকাশে শীল প্রয়োগ করে বা ব্যবহার করে জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের কল্যাণ সাধন করা যায় তা পর্যালোচনা করতে চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে বাস্তব জীবনে ও সমাজজীবনে কীভাবে শীল দ্বারা আমরা প্রভাবিত হতে পারলে আধ্যাত্মিক সাধনার পাশাপাশি মানবতার বিকাশ সাধন করা সম্ভব হয় তা তুলে ধরতে চেষ্টা করা হবে নিম্নোক্ত আলোচনার মাধ্যমে।

মানবতার বিকাশে শীল

'মানবতা' শব্দটির গভীর তাৎপর্য আছে। তবুও সাধারণ দৃষ্টিতে মানবতা হলো মানুষের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য দ্বারা একজন মানুষ পুর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারে। যদিও প্রচলিত নিয়মে বা স্থান, কাল, ধর্ম ইত্যাদির উপর নির্ভর করে মানবতার রূপ ভিন্ন হতে পারে। মহামানব বুদ্ধ পৃথিবীতে মানবতার এক মহান দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন। যেখানে তিনি একজন মানুষ হয়ে সকল মানুষকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে পরিণত করার চেষ্টা করেছেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্রে মানবতার পূর্ণ বিকাশের জন্য বিশিষ্ট সাধন-প্রণালী উদ্ভাবিত হয়েছে। আর সেই সাধন-প্রণালীর অন্যতম একটি হলো শীল। মহামানব বুদ্ধ তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মে দশবিধ সদ্‌গুণের বিকাশ সাধন করতে করতে গৌতম সিদ্ধার্থ জন্মে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বুদ্ধ এই জন্মে এসে দশবিধ সদ্‌গুণের অন্যতম ও দ্বিতীয় যে গুণটি সাধন করেছিলেন তা হলো শীল। শীলোক্ত অনুশাসনগুলো পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করে অভ্যাসে পরিণত করতে হয়। প্রাণি-হিংসা হতে বিরতি পরস্বাপহরণ হতে বিরতি, ব্যভিচার হতে বিরতি, মিথ্যা ভাষণ হতে বিরতি বৌদ্ধ শাস্ত্রে এগুলো

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চশীল নামে অভিহিত। সংসারের যাবতীয় দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ ও অশান্তি উপদ্রবের মূল কারণ উক্ত পঞ্চবিধ পাপ কর্ম। এই সমস্ত পাপ কর্ম হতে বিরত না হলে মানবতার বিকাশ আদৌ সম্ভবপর নহে। একারণে মানবতার অগ্রগতির জন্য কার্যকরী পন্থা রূপে বুদ্ধ নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন যে, 'পঞ্চশীল' প্রত্যেকেরই অবশ্য অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক কর্তব্য। শীল বা সদাচারকে উপেক্ষা করে কোনো ব্যক্তি বা সমাজ উন্নতি লাভ করতে পারে না। কান্তারে যেমন পথ প্রদর্শকই একমাত্র আশ্রয়, সেইরূপ জগতে একমাত্র শীলকে আশ্রয় করেই চলতে হয়। শীলই একমাত্র মিত্র, বন্ধু, রক্ষা, ধন ও বল। অত্রএব শীলের বিশুদ্ধি সম্পাদনে চেষ্টা করা আবশ্যক।[১]

মানবতার সাধক বোধিসত্ত্বগণের প্রতিপাল্য শীল বা সদাচার অসংখ্য বলে শাস্ত্রে কথিত আছে। তন্মধ্যে চিত্ত-শোধনরূপ সর্বাগ্রে অবশ্য আচরণীয়। আচার্য্য শান্তিদেব বলেন, বাহিরের অসংখ্য দুর্জন ব্যক্তির মধ্যে কতজনকে আমি বধ করব? একমাত্র আমার ক্রোধশত্রুকে বধ করলেই তো সকল শত্রুর নিধন হয়ে যায়। বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে-

ভূমিং ছাদয়িতুং সর্বাং কুতশ্চর্ম ভবিষ্যতি।
উপান চ্চর্ম মাত্রেন ছন্না ভবতি মেদিনী।।
বাহ্যা ভাবা ময়া তদ্বচ্ছক্যা বারয়িতুং নহি।
স্বচিত্তং বারয়িষামি কিং মমান্যৈ নির্বারিতৈঃ।।[২]

অর্থাৎ, সমস্ত পৃথিবী আচ্ছাদন করার মত চর্ম কোথায় পাওয়া যাবে? নিজের পায়ে জুতা পরলেই ঐ চর্ম দ্বারা পৃথিবী আবৃত হয়ে যায়। সেইরূপ প্রতিকূল সমুদয় বাহ্য বস্তুকে নিবারণ করার সামর্থ আমার কোথায়? আমার নিজের চিত্তকেই বারণ করব, অন্যকে বারণ করার আমার কি প্রয়োজন ?

একবিংশ শতাব্দিতে অত্যন্ত দুর্লভ মনুষ্য জীবন। এ জীবনের সার্থকতা প্রতিভাত হয় পরহিত ব্রতের কল্যাণকামী ত্যাগে। এ ত্যাগ যশ-খ্যাতি ও গৌরবের আকাঙ্খা করে নয়, এটি জীবনের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ হতেই আসে। এ ধ্রুব সত্য আজ সকলেরই জানা কারণ এটি সম্ভব হয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে। যা ইতোমধ্যে সকলেরই কাছে প্রশংসনীয় হয়েছে। মানুষের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চৈতন্যেও প্রাবল্যে জীবনের গতি অন্যভাবে পরিচালিত হচ্ছে। যদিওবা পরকাল বলতে বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও মানুষের স্ব স্ব ধর্মতত্ত্বের কথা

বলতেই হয়। কিন্তু ধর্মতত্ত্ব বা অদৃশ্য শক্তি হোক, যে যেই বিশ্বাসের মধ্যে আস্থাবান হোক না কেন মৃত্যুর পরে সুখ বা শান্তি লাভের জন্য চলমান জীবনে আদর্শবান হওয়ার কথা সকল শাস্ত্রেই পাওয়া যায়। বর্তমান জীবনের কর্ম প্রবাহ সকল শাস্ত্রে অত্যন্ত গুরত্বের সাথে বিবেচিত হয়েছে।

তথাগত বুদ্ধের জীবন দর্শন সর্বজনীন কল্যাণে নিবেদিত। গভীরভাবে মনোনিবেশ করার মধ্যে দিয়েই তা উপলব্ধি করা সম্ভব। মহামানব বুদ্ধ কোনো খণ্ডিত বা বিভাজিত কোনো মানব সমাজের বা মানব জাতির কথা চিন্তা করেননি। তিনি ভেবেছেন সমগ্র জাতিসত্ত্বার যা বলার অপেক্ষা রাখে না। সমগ্র মানব জাতি তথা জীব সত্ত্বা তাঁর দর্শনের উপাদান।[৩] এখানে গোত্র, গোষ্ঠী, বর্ণ উঁচু, নিচু, গরীব, ধনী ইত্যাদির কোনো ভেদাভেদ দৃশ্যমান নয়। প্রয়োজন শুধু উপলব্ধির। তাঁর এ দর্শন বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। জীবনযাত্রার সাথে অত্যন্ত সংগতি পূর্ণ তাঁর এ দর্শন। জীবনযাত্রার এ পথকে সুন্দর করার জন্য প্রয়োজন শীলচর্চা করা। শীলই মানবিক মূলবোধের জন্ম দিতে পারবে।

শীল অনুশীলনের মূল্যবোধকে নৈতিকতার দিক থেকে বিচার করে সর্বজনীন মানবিক কল্যাণে এর বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এ সম্পর্কিত তথাগত বুদ্ধের দার্শনিক আদর্শকেও সরল ব্যাখ্যায় এবং জীবনের বাস্তবতায় সম্যক দৃষ্টিতে অবলোকনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা তিনি উপস্থাপন করেছেন। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক চৈতন্যের বিকাশের জন্য শুধু নয় মানুষের চলমান জীবনের প্রপঞ্চময় সমস্যা সমাধানে এ তত্ত্বের গুরুত্ব অপরসীম।

বৌদ্ধধর্ম শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। বৌদ্ধধর্ম নিজেদের মত সকল প্রাণিসহ অন্যদেরকেও ভালোবাসতে উদ্বুদ্ধ করে। বৌদ্ধধর্ম মানুষকে নিজের, স্বজনের, স্বদেশের তথা বিশ্ববাসীর কল্যাণের জন্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ও ত্যাগ স্বীকারে প্রেরণা যোগায়। আর তাতেই বিশ্ববাসীর জীবন ধারায় নেমে আসে প্রশান্তি এবং বিদূরিত হয় অশান্তি, হিংসা, বিদ্বেষ এবং হানাহানি। বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা হলো মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই। সাদা-কালো সকল মানুষই তাঁর অতীত কর্মের ফলস্বরূপ এ পৃথিবীতে আসে। বস্তুত মানব জাতি একটি দেহের মত।

মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনে প্রাণি ও প্রাকৃতিক সম্পদ আবশ্যক। তাই পৃথিবীতে শান্তি ও সমৃদ্ধির লক্ষ্যে বৌদ্ধধর্ম শুধু মানুষের প্রতিই সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দেয়নি, উপরন্তু প্রাণির

পরিচর্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও উদ্ভিদের যথার্থ ব্যবহার সম্পর্কেও বৌদ্ধধর্মে গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

মোটকথা সমস্ত সৃষ্টি জড়, অজড়, প্রাণী ও প্রকৃতি সকলেই বৌদ্ধধর্মের উদারতায় উদ্ভাসিত। বৌদ্ধধর্ম শুধু বিশ্বাসভিত্তিক ধর্ম নয়; বরং তা বিশ্বাস ও কর্মের এক সুষম সমন্বয়ের বাস্তব অভিব্যক্তি।

প্রতিটি মানুষকে নিজের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, পরের জন্য, দেশের জন্য, জাতির জন্য তথা বিশ্বের জন্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করে। কর্মই মূলত মানুষের মানবীয় পরিচয় বিকাশের এবং মনুষত্ব প্রকাশের সুযোগ এনে দেয়। কাজেই প্রত্যেক মানুষকেই তার নিত্যদিনের চিন্তা-কর্মে এ কথা প্রমাণ করতে হবে।

প্রতিটি মুহূর্তে মানুষ তার কৃতকর্মকে স্মরণ করবে এবং বৈষয়িক লোভ-লালসায় পড়ে কেউ পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী না হয়ে যায়। প্রতিদিনের কাজকর্মে শীল পালন ও শীলের আদর্শ অনুসরণ করতে হবে।

মহামানব বুদ্ধ মানব সমাজের সর্বৈধ মঙ্গল ও কল্যাণ সুখের কথা শুধু বলেননি পরন্তু সমগ্র প্রাণিজগতের মঙ্গলের বিষয়ও বারংবার উচ্চারণ করেছেন। উপাসক ও উপাসিকাগণের মানসিক উন্নতি, স্বাধীনতা, স্বনির্ভরতা, স্বচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য জীবন-জীবিকা প্রতিপালন এবং আদর্শ ধার্মিক জীবনের নীতিমালা প্রকাশ করে মনুষ্য সমাজের পরম হিতাকাঙ্খীরূপে আজ বিশ্বনন্দিত মহামানব। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জের যুগ সন্ধিক্ষণে আদর্শ উপাসক ও উপাসিকার প্রয়োজন জরুরি। নতুবা জ্ঞান বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির জয়যাত্রায় মানবতা ও মনুষ্য বিকাশের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা বুদ্ধবাণী আমাদের কল্যাণে কতটুকু ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে অন্তরে বড় প্রশ্ন। সেজন্য দায়ী বুদ্ধবাণী নয় বরং বুদ্ধ বাণী স্বমহিমায় অতীতেও দেদীপ্যমান ছিল এখনো অম্লান আছে এবং থাকবে। শীল সম্পর্কে অজ্ঞানতা সামাজিক দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, The crown and glory of life is character. চরিত্র বা শীল মানবের মহার্ঘতম বস্তু শ্রেষ্ঠতম অলংকার। মানব জীবনে শীলের গুরুত্ব অপরিসীম। মানুষের সব সম্পদের মধ্যে শীলই বড় সম্পদ। মহাকারুণিক বুদ্ধ তাঁর ধর্মদেশনায় শৃঙ্খলাবদ্ধ

জীবনকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। শীল গৌরবে বলীয়ান মানুষ দেবতার মহিমায় পৃথিবীতে বিরাজ করে। শীল মানুষকে ন্যায়, সত্য, সংযম ও শ্রদ্ধাবোধ শিক্ষা দেয় এবং সৎপথে চলতে উদ্বুদ্ধ করে। শীলবান ব্যক্তি সমাজের শিখা স্বরূপ। কথায় আছে, 'রাজার জোর অর্থের আর শীলবান ব্যক্তির জোর হৃদয়ের'। হৃদয়িক মহিমায় উজ্জ্বল শীলবান ব্যক্তি সদালাপী, বিনয়ী এবং জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। শীলবান ব্যক্তি মহাপুরুষরূপে সমাজে সমাদৃত। ধর্মপদে বলা হয়েছে, 'শ্রদ্ধাসম্পন্ন, শীলবান, যশস্বী ও বিত্তবান পুরুষ যেখানেই গমন করেন সেখানেই সম্মানিত হন'।[৪] কোনো ধর্মেই উশৃঙ্খলতার কোনো স্থান নেই। বৌদ্ধধর্মেও এর কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। প্রব্রজিত হোক বা গৃহী হোক প্রত্যেকে শীল পালন করা একান্ত কর্তব্য। বুদ্ধ নিজেই সর্বজ্ঞতা লাভে শীলের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। জীবনকে সুন্দর, সুখময় ও সত্যনিষ্ঠ নান্দনিক সফলতায় উজ্জীবিত করার জন্য শীলের গুরুত্ব অত্যাধিক। কারণ শীল হলো একটি সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি যা মানুষকে শুভ কাজে উদ্বুদ্ধ করে এবং শুভ কর্মফলের অধিকারী করে তোলে। শীল শক্তিতে বলীয়ান হলে মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে। শীলবান ব্যক্তি সদা প্রফুল্ল চিত্তের অধিকারী। জীব হিংসা ও নিষিদ্ধ কর্মাদি হতে চিত্ত বিরতি লাভ করতে পারলেই শীল সাধনে পূর্ণতা লাভ করা যায়।

বোধিচর্যাবতার গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যে সকল আচারের মাধ্যমে চিত্তের বিশুদ্ধতা জন্মে তা অবশ্যই পালন করা উচিত। কাম-ক্রোধ-মোহাদি রিপুর আক্রমণ হতে চিত্তকে সুরক্ষিত করার জন্য বৌদ্ধধর্মে দুটি উপায়ের কথা বর্ণিত হয়েছে। যথা : স্মৃতি[৫] ও সংপ্রজন্য[৬]।

যে'কটি মৌলিক মানবিক গুণ মানুষকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে এবং অন্যান্য সৃষ্ট জীব হতে তাকে আলাদা করেছে তার মধ্যে শীল প্রধানতম। এটি একটি মৌলিক মানবীয় গুণ। কর্ম, বিদ্যা, ধর্ম ও শীলসমৃদ্ধ উত্তম জীবন-এগুলো দ্বারাই মানুষ শুদ্ধ হয়, গোত্র ও ধন দ্বারা নয়। চরিত্র যার কলঙ্কিত হয় সে মানুষের মর্যাদা হারিয়ে পশুত্বের পর্যায়ে নেমে আসে।

মানুষের জীবনের শ্রেষ্ঠ ও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ তার সুন্দর ও আকর্ষণীয় চরিত্র। কুৎসিত চরিত্রের লোককে সকলে ঘৃণার চোখে দেখে। ভালো চরিত্র বিশিষ্ট লোক জীবনের সকল পর্যায়েই শান্তি ও স্বস্তিতে থাকে। ধর্মপদে বলা হয়েছে, যিনি শীলবান, দার্শনিক, ধার্মিক, সত্যবাদী এবং স্বীয় কর্তব্যে নিয়োজিত, তিনি সকলেরই প্রিয় হয়ে থাকেন।[৭]

মানুষের ইহ জীবনের সকল রকমের সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা তার উত্তম চরিত্রের ওপর নির্ভর করে। চরিত্রবানকে সকলে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। বিপদে-আপদে সকলেই সাহায্যের হাত প্রসারিত করে। এভাবে শীলবান মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বহন করে।

সুন্দর চরিত্র ছাড়া পৃথিবীতে কোনো কাজেই স্থায়ী সফলতা লাভ করা সম্ভব না। খারাপ চরিত্রের লোকেরা সাময়িক উন্নতি বা বৈষয়িক অগ্রগতি লাভ করে থাকে। কিন্তু তা তাদেরকে কোনো শান্তি দিতে পারে না। পরকালেও তারা চরম ব্যর্থতার শিকার হয়। খারাপ চরিত্রের জন্য চিরদিন থাকতে হয় নরকে। যে জন্য ইহকালের পাশাপাশি পরকালের কল্যাণ নিশ্চিত করার জন্যও শীল গুরুত্বপূর্ণ। ধর্মপদে বলা হয়েছে- ধম্মং চরে সুচরিতং ন তং দুচ্চরিতং চরে, ধম্মচারী সুখং সেতি অস্মিং লোকে পরম্হি চ।[৮]

অর্থাৎ, উত্তমরূপে ধর্মানুশীলন করো, দুশ্চরিত্রভাবে তা অনুশীলন করবে না। ধর্মাচরণকারী ইহ-পরলোকে সুখে থাকেন। শীল রত্নই ইহ-পরকালে শ্রেষ্ঠ ফল প্রদান করে পরে নির্বাণ প্রাপ্ত করায়। ইহলোক-পরলোকের সুখকামনায় যাগযজ্ঞ বা বাহ্যক্রিয়াকলাপকে বুদ্ধ সুদৃঢ়কণ্ঠে একান্ত নিস্ফল বলে ঘোষণা করেছেন এভাবে; ইন্দ্রিয়বিজয় ও চরিত্রসংশোধন করে, দয়া-দাক্ষিণ্য মৈত্রীমূলক কল্যাণের মাধ্যমে শ্রেষ্ঠত্বকে অর্জন কর।[৯]

শীল মানুষকে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলে। ভালো চরিত্র ছাড়া মানুষের ভালোবাসা পাওয়া যায় না। শীলবান মানুষকে সকলে ভালোবাসে। মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও স্নেহ ভালো চরিত্র ছাড়া আশা করা যায় না। যিনি শীলবান, প্রজ্ঞাবান, ভাবিতাত্মা, সমাহিত, ধ্যানরত, স্মৃতিমান, ক্ষীনাস্রব এবং অন্তিমদেহধারী, তাঁর সকল শোক বিগত পরিত্যক্ত। তাদৃশ ব্যক্তিকে শীলবান প্রজ্ঞাবান বলা হয়, তাদৃশ ব্যক্তি দুঃখ অতিক্রম করে চলেন এবং দেবতারা তাদৃশ ব্যক্তিকেই পূজা করেন।[১০]

মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব, আভিজাত্য, উন্নতি, যশ ও খ্যাতির মাপকাঠি তার চরিত্র। ধন-সম্পদ মানুষকে ধনী প্রমাণ করে, শক্তি-ক্ষমতা-ঐশ্বর্যের কারণে মানুষ ভীতিকর হিসেবে আখ্যায়িত হয়। কিন্তু তা মানুষকে শ্রেষ্ঠত্বে অধিষ্ঠিত করে না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হয় তার চরিত্রে। যার চরিত্র ভালো তার শ্রেষ্ঠত্ব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নাতীত বিষয়। কাজেই সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার মাধ্যম এবং

Dhaka University Institutional Repository

মর্যাদা লাভের মাপকাঠি হিসেবে শীলের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। Morals and Sheafor (1986 : 206), 'Each person has an inherent capacity and drive toward change that can make life more fulfilling.'[১১]

সুন্দর চরিত্র সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। কেননা শীলবান মানুষ অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করে না। অন্যের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের ক্ষতি হয় এমন কোনো কাজ করে না। বরং সর্বোতভাবে অন্যকে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করে। ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও শীলকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়।

শীল মানুষকে সুন্দরতম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী করে তোলে। তার নৈতিক স্খলন ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। এ ক্ষেত্রে তার মধ্যে কোনো অস্থিরতা থাকে না। সে নিবিড়ভাবে নিজের অবস্থা ও করণীয় সম্পর্কে ভাবতে পারে। শীলের মাধ্যমে ব্যক্তি নৈতিকভাবে সুদৃঢ় সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে। ব্যক্তির চরিত্রে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঈর্ষণীয় দৃঢ়তা আসে। অচল সুপ্রতিষ্ঠিত শিলাময় পর্বত যেমন ঝঞ্ঝা বায়ুতেও কম্পিত হয় না, স্বীয় স্থানেই স্থিত থাকে, তদ্রুপ তুমিও কুশল কর্ম সম্পাদনে নিশ্চল হও। এরূপে অসীম ধীরতাপূর্ণ অটল চিত্ত প্রবাহই সম্বোধি লাভে সমর্থ হয়।[১২]

শীল ব্যক্তির মধ্যে পরিশুদ্ধ চেতনার জন্ম দেয়। সে নৈতিক দিক দিয়ে পরিশুদ্ধ হয়ে উঠে। মন্দ, নিষিদ্ধ ও অশ্লীল আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখে। তার মধ্যে এ সকল অনৈতিক আচরণ প্রতিরোধের মানসিকতা তৈরি হয়। ফলে সমাজ অশালীন আচরণ থেকে মুক্তি পায়।

মানুষের অন্যতম প্রশংসনীয় গুণ হলো সহানুভূতি। ব্যক্তির বিপদে-কষ্টে, দুঃখ-বেদনায় তার পাশে দাঁড়ানো, সাহস যোগানো মানবিকতার অন্যতম দাবি। সহানুভূতিশীল না হলে একজন মানুষকে মানুষ বলা যায় না। কাজেই সুন্দর শীলবান হতে হলে সহানুভূতিশীল হতে হয়।

জীবনে সফল হওয়ার জন্য যে সকল কাজ অবশ্য করণীয় এবং নিষ্ঠার সাথে যে সকল কাজ সম্পন্ন করার নাম কর্তব্যপরায়ণ। ব্যক্তি কর্তব্যপরায়ণ হওয়া ছাড়া ভালো শীলের অধিকারী হতে পারে না। কেননা কেবল সুন্দর শীলবান লোকের পক্ষেই নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, সততা ও বিশ্বস্ততার সাথে দায়িত্ব পালন করা সম্ভব। শীল সুন্দর না হলে ব্যক্তি কাজে ফাঁকি দেবে। কর্তব্যে অবহেলা করে তার নিজের এবং দেশ ও জাতির ধ্বংস ডেকে আনবে।

শঠতা, ভণ্ডামি, ধোঁকাবাজি, ঠকানো, ঠকবাজি করা হলো প্রতারণা। কোনো শীলবান ব্যক্তি এ কাজ করতে পারে না। তাই সুন্দর শীলবান হওয়ার জন্য তাই প্রতারণা পুরোপুরি পরিহার করতে হবে। হিংসা, অহংকার, ঘৃণা, নিজেকে বড় এবং অন্যকে নীচ মনে করার হীন মানসিকতা সুন্দর শীলের সম্পূর্ণ বিরোধী বিষয়। হিংসা-অহংকার মানুষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাই গৌতম বুদ্ধ তার শিষ্যদের বারবার হিংসার পথ পরিহার করার জন্য বলেছেন। ধর্মপদে বলা হয়েছে, ঈর্ষান্বিত, মাৎসর্যপরায়ণ ও শঠব্যক্তি কখনো মধুর বাক্য ভাষণ করে দেহসৌষ্ঠব দ্বারা সাধু হতে পারে না।[১৩] আবার শীলের দ্বারা কায়িক, বাচনিক, মানসিক বিশৃঙ্খলা দূর হয়ে ইন্দ্রিয় নিশ্চয় সুদান্ত সুসংযত হয় এবং দ্বেষ বা হিংসা ধ্বংস হয়। আত্মসুখ অভিলাষী হয়ে যিনি অপর প্রাণিগণকে দণ্ড দ্বারা হিংসা করেন না, তিনি পরলোকে সুখ লাভ করেন।[১৪]

শীল পালন দ্বারা আমরা আত্মশুদ্ধি লাভ করতে পারি। শীল আমাদেরকে পাপাচার, মিথ্যাভাষণ, প্রাণীহত্যা, ব্যভিচার, মদ্যপান ইত্যাদি থেকে বিরত রাখে। যাতে করে আমরা আমাদেরকে পরিশুদ্ধ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করতে পারি। সেজন্য প্রত্যেকের শীল পালন করা উচিত।

চুরি, ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মতো আর্থিক অপরাধ শাস্তিযোগ্য। এর মধ্যে অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করা, জীবন-সম্পদ ও সম্মানের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরির মতো অন্যায় সাধিত হয় বলে শীলবান হতে হলে এগুলো থেকে পুরোপুরি দূরে থাকতে হয়। সুত্তনিপাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি গ্রামে কিংবা অরণ্যে অপরের অধিকারভুক্ত ধন-সম্পত্তি চুরি করে আনয়ন পূর্বক তা নিজে ভোগ করে তাকেও জাতিচ্যুত বলে জানবে।[১৫]

মিথ্যা হলো সকল পাপের জননী। সুন্দর শীল অর্জনের অন্যতম উপায় হলো মিথ্যা বর্জন করা। কথা, আচরণ, বক্তব্য বা নীতি সকল জায়গা থেকেই মিথ্যাকে নির্বাসিত করতে হবে। কাজেই শীলবান ব্যক্তির জন্য মিথ্যাচার বর্জন করা অনিবার্য। আর শীলবান ব্যক্তিদের উচিত মিত ও স্নিগ্ধভাষী হওয়া। কারো সঙ্গে কর্কশ বাক্য না বলা, সতত সকলের প্রতি সরল দৃষ্টি রাখা, যা দ্বারা জনসাধারণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তাঁর বাক্যে বিশ্বাস করে। সদা কর্মকুশল হওয়া এবং সত্ত্বদের প্রতি হিতসুখ বিধানের জন্য যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। কোন কার্যে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে

Dhaka University Institutional Repository

স্বয়ং সম্পাদন করাই উত্তম। ভিক্ষুদের পক্ষে পাতিমোক্ষতে যে সমস্ত বিধি নিষেধ আছে তা যথাযথ আচরণ করা অবশ্য কর্তব্য।[১৬]

সুন্দর শীল অর্জনের অন্যতম উপায় হলো মাদকদ্রব্য পরিহার করা। কাজেই সুন্দর চরিত্রের ধারণার সাথে অনিবার্যভাবে সব ধরনের মাদকদ্রব্য বর্জন করা। মাদক সেবন করে কেউ সুন্দর শীলে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। আমরা আসক্তদের মধ্যে অনাসক্ত হয়ে সুখে বাস করি; আসক্তিপরায়ণ মানুষের মধ্যে আসক্তিবিহীন হয়ে সুখে জীবন যাপন করি।[১৭]

নৈতিক অধঃপতন এমন এক সমস্যা যা মানবজাতির ধ্বংস ডেকে আনে। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হওয়ার নেপথ্যে তার উন্নত চরিত্র নিঃসন্দেহে সর্বাধিক প্রভাবক বিষয়। গৌতম বুদ্ধ মানুষকে সুন্দর নৈতিক চরিত্র গড়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছে। নীতি ও চরিত্রহীনতার সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য মানুষকে সৎ গুণে গুণান্বিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। মানুষকে নৈতিক স্খলন ও নীতিহীনতা থেকে রক্ষার জন্য বৌদ্ধ ধর্মে সব রকমের পাপাচার, বিদ্রূপ দোষারোপ, দোষান্বেষণ, ভিত্তিহীন অনুমান অন্যায় ও অশালীন কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। এক কথায় নৈতিকতা বিবর্জিত মানুষ প্রকৃতিগত দিক দিয়ে কখনো মানুষ হয় না। কেউ মনুষ্যত্ব নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়।

বস্তুত মানুষকে নৈতিক দিক থেকে শুদ্ধ রাখার ব্যাপারে শীল ছাড়া আর বিকল্প কোন পথ নেই। উত্তম চরিত্র মানুষকে শান্তি ও সমৃদ্ধির পথ দেখায়। শীল এমন একটি নৈতিক গুণ যা অন্যান্য নৈতিক গুণ অনুশীলনের প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ করে। নৈতিক জীবনের উৎকর্ষতা শীলগুণ, সমাধি ও প্রজ্ঞার মধ্যে নিহিত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গে প্রত্যেক অঙ্গ জুড়ে শীল বিশুদ্ধিতা বিদ্যমান। শীল হচ্ছে নির্বাণ লাভের ভিত্তি এবং আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গই সাধনভূমি। এ প্রসঙ্গে মিসেস রীচ ডেভিডস এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-It has now and again been put forward the Buddhism is neither a religion nor philosophy but only a system of morals or ethics, in so far as it contains anything beyond mere negation.[১৮]

আমাদের সমাজব্যবস্থায় মানুষকে সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলিতে বিভূষিত করার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়নীতি, দায়িত্বনিষ্ঠা, প্রভৃতি গুণাবলি অর্জনে উৎসাহ দেয়ার পাশাপাশি মিথ্যাচার, প্রতারণা, চুরি, ব্যভিচারসহ সকল পাপাচার পরিহারের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রয়োজনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়। আর শীল পালনে মানুষ সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী হয়।

কাজেই বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিক বিধি মেনে মানুষ প্রয়োজনীয় গুণাবলি অর্জন ও অনুশীলনের চেষ্টা করবে-এটাই তার মূল দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন ছাড়া প্রকৃতপক্ষে সে সুন্দর চরিত্রের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে পারবে না।

মানব জীবনে চিত্তের ঈপ্সিত লক্ষ্য পূরণের ভিত্তি হলো শীল। উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছাড়া জীবনে কিছু অর্জিত হয় না। উৎসাহের কারণেই কর্ম শক্তি সৃষ্টি হয়। তাই নিজেকে হীন দুর্বল ভেবে হতাশ হওয়া উচিত নয়। আর পরকালের সুখ-শান্তি ও উত্তম জীবন লাভ করা ছাড়াও ইহজীবনে শীল পালনের প্রতিপত্তি কম নয়। শীল পালনে চিত্তের অস্থিরতা, দুরক্ষণীয় এবং দুর্ণিবার তিরোহিত হয়। সংযত চিত্তই সুখ প্রদান করে। আর বিক্ষুব্ধ চিত্ত কখনো পূর্ণতা লাভ করে না। শীল চর্চায় ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই কল্যাণময় ও সমৃদ্ধময় জীবন লাভ হয়ে থাকে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে নিয়ম শৃঙ্খলার উপযোগিতা অপরিহার্য। অসংযম, উশৃঙ্খলতা, অমিতব্যয়িতা, দুঃশীলতা প্রভূতি সমস্ত প্রকার উন্নতির পরিপন্থী। অপরদিকে নিয়ম শৃঙ্খলা, সংযম, আত্মত্যাগ, চরিত্রবল, শীল, নিয়মানুবর্তিতা, উদ্যম-উৎসাহ সকল প্রকার উন্নতির মূল। শীলবান ব্যক্তির প্রব্রজ্যাজীবন সুখকর হয়। বিশুদ্ধিমার্গ গ্রন্থে শীলকে কুশল কর্মের আদি বলা হয়েছে। ভিক্ষুদের জীবনপ্রণালীর জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমনি ধ্যান সাধনার প্রথম সোপান শীল।[১৯]

পালি সাহিত্যের ভিত্তিই হচ্ছে নৈতিক জীবনবোধ। বুদ্ধ ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে বিশ্বের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য কল্যাণধর্ম প্রচার করেছিলেন। শীল বা চারিত্রিক শিক্ষায় সংযত মানুষকে পাপ ভীরু করে তোলে, সুষ্ঠ জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে। বৌদ্ধধর্মে নিয়মানুবর্তিতা বা শৃঙ্খলাবদ্ধ জীবনযাপনের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। সদাচার সামগ্রিক জীবনের ভিত্তিভূমি। কামনা বাসনার জীবনভূমিতে মনের শান্ত সমাহিত ভাব, পরিশুদ্ধ জীবনচর্চার ওপর

নির্ভরশীল। বিশ্বজগৎ নিয়ম শৃঙ্খলায় নিয়ন্ত্রিত। অনিয়ম ও উচ্ছৃঙ্খলভাবে কোন বন্ধু থাকতে পারে না। অসংযম, অমিতব্যয়িতা, প্রমত্ততা, দুঃশীলতা প্রভৃতি উন্নতির পরিপন্থী। নৈতিক জীবন পঙ্গু হলে সে ব্যক্তির কোনো মূল্য নেই। কায়, বাক্য ও মনোময় কর্মের মাধ্যমে শীল প্রতিপালন করতে হয়। ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনকে এ কর্মপ্রভাব নিয়ন্ত্র করে থাকে। শীল দুঃশীলতাকে বিনষ্ট করে। শীল অনুশীলনের প্রত্যক্ষীকরণ হচ্ছে লজ্জা ও বিবেক-ভয়। এ দুটি শর্ত বিশ্বে আইনশৃঙ্খলা বিধান করে আসছে লোকপালন ধর্ম হিসেবে। শীলসমূহ অনুশীলন করলে, মনে অহিংসা উৎপন্ন হয়, বিরাগ উৎপন্ন হয়, মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটে।

পরিশুদ্ধ জীবন প্রণালীই শীল। নৈতিক শিক্ষা 'শীল' এবং উপাসনা পদ্ধতি ধর্ম। সুতরাং উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। জীবনযাপনের প্রণালী বোঝাতে ধর্মের ব্যবহার হয়। নিজে বাঁচা এবং অপরকে বাঁচতে দেবার উপায়মাত্র। যে উপদেশ মনের বিকারসমূহ থেকে মুক্ত থাকার উপায় শিক্ষা দেয়, সেটায় জীবনযাপনের যথার্থ উপায়।

উপসংহার

পরিশেষে বলা যায় যে, সমৃদ্ধিময় জীবনের জন্য শীল প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। শীলের মাধ্যমেই ঘোষিত হয় জীবনের গৌরব। শীল হচ্ছে স্নান তীর্থ, যেখানে স্নাত হয়ে পরাজ্ঞানের পারপ্রাপ্ত ঋষিগণ আসক্তি দেহে নির্বাণের পারে উত্তীর্ণ হন। শীলবান ব্যক্তি মহাপুরুষরূপে সমাজে সমাদৃত। বস্তুত শীল মানুষের মনুষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণের একমাত্র উপায়। মহামানব বুদ্ধ কখনো কোনো খারাপ কাজের আদেশ দেননি। কোনো ভালো কাজ করতে নিষেধ করেননি। কাজেই কেউ যদি শুধু তাঁর আদেশ ও বিধিবিধান মেনে চলেন তাহলে সে এমনিতেই সুন্দর শীলের বা চরিত্রের এবং মানবতার বিকাশের অধিকারী হবে। কাজেই প্রচলিত বিবেচনায় শীলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে জন্য কোনোভাবেই শীলকে উপেক্ষা করা যায় না। আর শীলসমূহের উপেক্ষা করতে না পারলে মানবতার বিকাশ পরিপূর্ণভাবে সাধিত হবে তা আর বলার অবকাশ থাকে না।

Dhaka University Institutional Repository

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১. প্রসূন বসু সম্পাদিত, *সৌন্দরানন্দম্* (কলিকাতা : ১৯৮০), ১৩/২৮

২. প্রাগুক্ত, ৫ । ১৩-১৪

৩. সব্বে সত্ত্বা সুখীতা ভবন্তু ।

৪. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), প্রকীর্ণ বর্গ, পৃ. ১০৩-১০৪

৫. স্মরণ রাখা এবং বিষয় এবং কর্মে সচেতন থাকা ।

৬. কায় চিত্তের অবস্থা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করা ।

৭. ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), প্রিয় বর্গ, পৃ. ৮১

৮. প্রাগুক্ত, লোক বর্গ, পৃ. ৬৮

৯. শরৎ কুমার রায়, *বুদ্ধের জীবন ও বাণী* (কলিকাতা : ১৩৯৪), পৃ. ৬৫

১০.শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৪০০, বাংলা), পৃ. ৩৭

১১.Armando T. Morales, Bradford W. Sheafor, *Morals and Sheafor* (Colorado State University : 1986, Reprient 2004 : 206) p.206

১২.জ্যোতিঃপাল সম্পাদিত, বুদ্ধবংস, (রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস : ১৯৩৪), পৃ. ২৩৩-২৩৪

১৩.ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), ধর্মার্থ বর্গ, পৃ. ৯৩

১৪.প্রাগুক্ত, দণ্ড বর্গ, পৃ. ৫৬

১৫.শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্তনিপাত* (বান্দরবন : ২০০৭), পৃ. ৩০

১৬.শীলাচার শাস্ত্রী ভিক্ষু, *মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন* (চট্টগ্রাম : ১৯৭৮), পৃ, ১৯৩

১৭.ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে ধম্মপদ* (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি), সুখ বর্গ, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

১৮. Mrs Rhys Davids, *Buddhism : A Study of the Buddhist Norm* (London : 1966, William and Nogate), p. 144

১৯.গোপালদাস ও শ্রমণ পুর্ণানন্দ স্বামী অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ* (কলিকাতা : ১৯২৩), পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

অবতরণিকায় উল্লেখ করেছি, সামাজিক জীবনে পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের (বিধি-বিধান) প্রায়োগিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মহামানব বুদ্ধের শীল সম্পর্কিত অমোঘ মহামূল্যবাণ বানী জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানবের নৈতিকতার শিক্ষাকে আরো সুদৃঢ় করবে। আমাদের সমাজজীবনে, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক অঙ্গনে যেন কোনো কর্মের মধ্যে নৈতিকতার পরাজয় না সংঘটিত হয়। এছাড়া বৌদ্ধ গৃহী ও নির্বাণগামীদের জন্যও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংযোজন ও জ্ঞানভান্ডার হবে এমনটা ইচ্ছে পোষন করা যেতেই পারে। বর্তমান বিশ্বে মানবের নৈতিকতার শিক্ষা ফলপ্রসু হওয়া বেশ জরুরী। এসকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এই অভিসন্দর্ভটি রচনা করা। এ উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণ করার ঐকান্তিক ইচ্ছা থেকে আলোচ্য বিষয়টিকে পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত করে অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছি। বিশেষ করে, পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ, শীলের প্রকারভেদ, পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্ব, শীলচর্চা ও সুফল ও মানবতার বিকাশে শীল প্রয়োগ সবকিছুই উদার নৈতিকার চর্চা ও আহবানের সাথে জড়িত যা পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের প্রায়োগিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে নিরুপন করার চেষ্টা করেছি।

অভিসন্দর্ভটি মূলত পবিত্র ত্রিপিটক, মূল পালি সাহিত্য, পরবর্তীকালের পালি সাহিত্য ও অন্যান্য গ্রন্থ হতে প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে রচিত হয়েছে। একারণে প্রথম অধ্যায়ে পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এখানে শীল কী? শীলের অর্থগত বিশ্লেষণ, শীলের সংজ্ঞা, বিভিন্ন পণ্ডিতদের শীল সম্পর্কিত নানা মতবাদ, কবি অশ্বঘোষের শীল সংক্রান্ত ধারণা, অট্ঠকথাকার আচার্য বুদ্ধঘোষের শীলময় প্রাজ্ঞেয় প্রতিভা প্রদর্শন, সংখ্যাতাত্ত্বিক বিচারে শীলের অবস্থান, শীল ও জীবনের উদ্দেশ্য, শীলের অন্তরায় ও কারণ, শীল গঠনের উপায়, শীলের লক্ষণ, শীল চর্চা জাতকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে, পালি সাহিত্যে শীলের বিন্যাসশৈলী ও পর্যালোচনা, শীলের বৈশিষ্ট্য, দার্শনিক তাৎপর্যতায় শীল ইত্যাদি বিষয়ের লক্ষণীয় আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ অধ্যায়ে। এ ধরণের আলোচনার মাধ্যমে শীল সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা ও সার্বজনীন গ্রহনযোগ্য আবেদন সৃষ্টি করে। ফলে পালি সাহিত্যে শীলের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলা যায় শীলের আবেদন সাংসারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জীবনে খুবই নিবিঢ় ও ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শীলের শ্রেণিবিন্যাসের আলোচনা করা হয়েছে এই কারণে যে, শীলের প্রকৃত স্বরূপ সংক্রান্ত ধারণা অর্জন করতে হলে শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত জ্ঞান থাকার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শীলের শ্রেণিবিন্যাসের আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে, আচার্য বুদ্ধঘোষ এক থেকে পাঁচ পর্যন্ত সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকার শীল শ্রেণিবিন্যাসের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন। সকল শীল মূলত এক প্রকার। যেহেতু এগুলো আত্মসংগঠনে মুখ্য উদ্দেশ্য সম্পাদন করে। এইজন্য শীলসমূহ প্রথমত এক প্রকার এবং এক শ্রেণিভুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার শীল এর শ্রেণিবিন্যাসে প্রত্যেকটিকে দুইটি করে সাত ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তৃতীয় প্রকার শীলের শ্রেণিবিন্যাসে প্রত্যেক ভাগকে তিনটি করে পাঁচ ভাগে বিন্যস্ত করা হয়েছে। শীলের চতুর্থ প্রকার শ্রেণিবিন্যাসে চারটি বিভাগের প্রত্যেকটিতে চারটি করে শীল উপস্থাপিত করা হয়েছে। শীলের যেসকল শ্রেণিবিন্যাস আলোচিত হয়েছে তা সবগুলো বিসুদ্ধিমগ্‌গো বর্তমানরূপে বিদ্যমান ছিল না এ কথা বলাই সমীচীন। বিমুক্তি মার্গ গ্রন্থে শীলের শ্রেণিবিন্যাসের মধ্যে দুই প্রকার শীলের পর্যায় রয়েছে দশটি, তিন প্রকার শীলের পর্যায় রয়েছে আটটি, চার প্রকার শীলের পর্যায় রয়েছে পাঁচটি। শীলের পঞ্চম শ্রেণিবিন্যাসে প্রত্যেকটি অংশে পাঁচটি করে দুই শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন : প্রথম শ্রেণি হলো : পরিয়ন্ত পারিসুদ্ধি, অপরিয়ন্ত পারিসুদ্ধি, পরিপূণ্ন পারিসুদ্ধি, অপরামট্‌ঠ পারিসুদ্ধি এবং পটিপস্‌সদ্ধি পারিসুদ্ধি শীল। দ্বিতীয় শ্রেণি হলো : পহান, বেরমণী, চেতনা, সংবর এবং অবিতক্কম শীল। এছাড়া পঞ্চশীল, উপোসথ বা অষ্টশীল, দশশীল, পটিজাগর উপোসথশীল, পটিহারিয় উপোসথ শীল গুলোর আলোচনা দৃষ্টিগোচর হয়নি। এ আলোচনার পরবর্তীতে ধুতঙ্গের আলোচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যদিও আমরা জানি ধুতঙ্গগুলো শীল নয় তবুও শীলগুলোকে বিশুদ্ধিতা অর্জনের জন্য ধুতঙ্গের জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এমনি ধারাবাহিকতার মাধ্যমে শীলের শ্রেণিবিন্যাস সংক্রান্ত জ্ঞান ও ধারণা তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্বের কথা তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ সামাজিক জীব এবং সমাজবদ্ধভাবে আদিকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আধুনিককাল পর্যন্ত বসবাস করে আসছে। সেকারণে এ সমাজবদ্ধ মানুষের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কীভাবে শীল একটি সুন্দর সমাজ বির্নিমাণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে সেটি প্রভাবিত করতে জ্ঞান ও ধারণা দেবার চেষ্টা

করা হয়েছে। এখানে প্রাণীহত্যা হতে বিরতি, অদত্তবস্তু গ্রহণ হতে বিরতি, ব্যভিচার হতে বিরতি, মিথ্যাবাক্য ভাষণ থেকে বিরতি ও মদ-সুরা-জাতীয় দ্রব্য সেবন হতে বিরতি থাকলে কীভাবে পরিবার, সমাজ, দেশ ও জাতি উপকৃত হতে পারে তা উল্লেখ করা হয়েছে। পঞ্চশীল পালনের সুফল, গৃহীদের নিত্যকর্ম, পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হওয়া, পরার্থপরতা ও ন্যায়-অন্যায়বোধে দায়িত্বজ্ঞান, পূর্বদিকরূপী মাতাপিতার প্রতি দায়িত্ব ও দানধর্ম, দক্ষিণ দিকরূপী আচার্য বা শিক্ষকের প্রতি দায়িত, স্বামী-স্ত্রীর উভয়ের প্রতি কর্তব্য পালন, উত্তর দিকরূপী আত্মীয়ের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন, গৃহীদের ইহজীবনের শিক্ষণীয় উপদেশ, গৃহীর পরকালের সুখ-সমৃদ্ধি বিষয়ক শিক্ষা, গৃহীদের দৈনন্দিন করণীয় কর্ম, পঞ্চশীলের নৈতিক মূল্যবোধ, পঞ্চশীলের সামাজিক গুরুত্বের নানা দিক নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা তুলে ধরা হয়েছে। এ ধরণের আলোচনা ধর্মীয় মনোভাবকে দৃঢ় করে এবং সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি আরও বেশি সচেতন করে তুলতে সহায়ক হবে সেই প্রয়াস ব্যক্ত করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যবহারিক যে নিয়ম পালনের মাধ্যমে মানুষ উন্নত থেকে উন্নতর জীবন লাভ করতে পারে, সমাজ জীবন সুন্দর হয় এবং পরিবেশ শান্ত থাকে তা শীলের মাধ্যমে হয়ে থাকে। শীলের বহুমাত্রিক গুণাবলী মানবজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে থাকে। তৃতীয় অধ্যায়ে পঞ্চশীলের যেসকল সামাজিক গুরুত্বের কথা আলোচনা করা হয়েছে সেগুলোর সাথে সমন্বয় করে মানবজীবনে শীলেরচর্চা এবং এর সুফল সম্পর্কে বিশ্লেষণধর্মী ধারণা প্রদান করা হয়েছে। মানবজীবনে শীলের চর্চা, শীলের তাৎপর্য, বিভিন্ন প্রকার ধুতাঙ্গ পালনের সুফল, ধুতাঙ্গের অষ্ট বিংশতি গুণ, মিলিন্দ-প্রশ্ন গ্রন্থে ধুতাঙ্গ পালনের সুফল সংক্রান্ত মতবাদ, পুগ্‌গল-পঞ্‌ঞত্তিতে ধুতাঙ্গ পালনে সুফল ও আশ্বাস সংক্রান্ত মতবাদ, ধুতাঙ্গ পালনে দশ প্রকার যোগ্য ব্যক্তি, ধুতাঙ্গ পালনকারীদের বৈশিষ্ট্য, শীলহীনতা ও শীলের লঙ্ঘন। শীলের চর্চা ও শীলের সুফলের সাথে সাথে ধুতাঙ্গ পালনের সুফল সম্পর্কিত আলোচনা করে এ সংক্রান্ত ধারণা ও বিশ্লেষণধর্মী জ্ঞান প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে মানবতার বিকাশে শীল কীভাবে প্রয়োগ করা হয় বা ব্যবহার করা হয় তা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের কল্যাণ সাধন করা যায় তা পঞ্চম অধ্যায়ে পর্যালোচনা করতে চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করা হয়েছে। কাজেই প্রচলিত বিবেচনায় শীলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যে জন্য কোনোভাবেই শীলকে উপেক্ষা করা যায় না। এ অধ্যায়ের বিশ্লেষণে আরও দেখানো হয়েছে কীভাবে আমাদের সাংসারিক, সমাজ ও জাতীয় জীবনে শীলের প্রয়োগ করে একটি সুন্দর সমাজ, দেশ ও জাতি বির্নিমাণ করা যায় তা গবেষণাধর্মী আলোকপাতের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। মানবতার বিকাশে শীলের প্রয়োগ হলে সমগ্র পৃথিবীব্যাপি মানবতা যে বিকাশিত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না একারণে শীলকে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক জীবনে পালি সাহিত্যে বর্ণিত শীলের প্রায়োগিক বিশ্লেষণ হতে শীল সংক্রান্ত বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা আমাদের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি সুন্দর সমাজ বির্নিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। মহামানব বুদ্ধ পবিত্র ত্রিপিটকে যে সকল শিক্ষনীয় বাণী প্রদান করে গিয়েছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো শীল। যদি সত্যিকার অর্থে শীলের সঠিক প্রয়োগ করা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের ধর্মীয় জীবনের পাশাপাশি সামাজিক কর্মময় জীবন অনেক বেশি সুন্দর হবে এবং একটি সুখসমৃদ্ধ ও শান্তিময় পৃথিবী প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব তা খুব সহজেই অনুমেয় সেই ধারারই ইতিবাচক ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা বই

পবিত্র ত্রিপিটক (দশম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ড) (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

পবিত্র ত্রিপিটক (অষ্টম খণ্ড) *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

শ্রীমৎ প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির ও ভদন্ত করুণাবংশ ভিক্ষু অনূদিত, *পবিত্র ত্রিপিটক* (দ্বিতীয় খন্ড) *বিনয়পিটকে পাচিত্তিয় ও মহাবর্গ* (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি, ২০১৭)

ধর্মাধার মহাস্থবির, *মধ্যম নিকায়, ১ম খণ্ড* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৪৮)

ভদন্ত প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনুদিত, *সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তরনিকায়, দশক ও একাদশ নিপাত*, আনিশংস বর্গ (রাঙ্গামাটি : ২০১১)

রাজগুরু শ্রীধর্ম্মরত্ন মহাস্থবির, সঙ্কলিত ও অনূদিত, *মহাপরিনিব্বান সুত্তং* (তাইওয়ান : ১৯৪১)

শ্রীশান্তরক্ষিত স্থবির, *ধম্মপদ*, ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৫৪)

পবিত্র ত্রিপিটক, (একাদশ খণ্ড) *খুদ্দকনিকায়ে ইতিবুত্তক* (রাঙ্গামাটি : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৭)

বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, *বৌদ্ধ সাহিত্য* (কলিকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৫)

ড. আশা দাস, *বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি* (কলিকাতা : ১৯৬৯)

অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া অনূদিত, ধম্ম*পদট্ঠকথা*, তৃতীয় খণ্ড (কোলকাতা : ২০১০)

করুণাবংশ ভিক্ষু, *পাচিত্তিয়া* (চট্টগ্রাম : ২০০৭)

গিরিশ চন্দ্র বড়ুয়া অনূদিত, *ধম্মপদ* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৭৭)

চারুচন্দ্র বসু অনূদিত, *ধম্মপদ* (কোলকাতা : মহাবোধি সোসাইটি, ২০১০)

ড. শুভ্রা বড়ুয়া অনূদিত, *মহাবংশ* (কলিকাতা : প্রকাশক, গোবিন্দ প্রসাদ বড়ুয়া, ২০০৪)

Dhaka University Institutional Repository

ধর্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বও বড়ুয়া অনূদিত, *খুদ্দক পাঠো* (কলিকাতা : ১৯৫৫)

নিরোধানন্দ ভিক্ষু, *শীলে আত্ম প্রতিষ্ঠা* (চট্টগ্রাম : ২০০৮)

প্রজ্ঞানন্দ স্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ* (কলিকাতা : ১৯৩৭)

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, দশম ও একাদশ নিপাত (রাঙ্গামাটি : ২০১১)

প্রজ্ঞাদর্শী ভিক্ষু অনূদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, পঞ্চম নিপাত (রাঙ্গামাটি : ২০০৮)

প্রণব কুমার বড়ুয়া, *গৌতম বুদ্ধের জীবন ও দর্শন* (ঢাকা : ২০১২)

বেনী মাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যম নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৪০)

শিশির বড়ুয়া চৌধুরী সংকলিত, *সদ্ধর্ম-রত্ন সংগ্রহ* (চট্টগ্রাম : অমিতাভ প্রকাশনী, ২০১৬)

সত্যপ্রিয় মহাথের অনূদিত, *চূল্লবর্গ* (রাঙ্গামাটি : ২০০৩)

ভদন্ত মেত্তাবংশ স্থবির অনুদিত, *ইতিবুত্তক* (রাঙামাটি : সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ, ২০১২)

প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু সম্পাদিত, *পারিবারিক সম্প্রীতি* (চট্টগ্রাম : বুডি-স্ট রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন সেন্টার, ২০১০)

হেনরী ওয়ারেন ক্লার্ক সম্পাদিত, *বিসুদ্ধিমগ্‌গ* (লন্ডন : হার্ভার্ট ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৯৫০)

জিওন আবে, *সঙ্খেপত্থজোতনী : সীল-ধুতঙ্গ বিসুদ্ধিমগ্‌গ চুল্লটীকা* (পুণা : ১৯৮১)

মূল রচনা-অর্হৎ উপতিষ্য স্থবির, বঙ্গাঁনুবাদক-মহিম চন্দ্র বড়ুয়া, *বিমুক্তি মার্গ*, প্রকাশক, প্রিয়ানন্দ মহাথের, নব-পণ্ডিত বিহার, কাতালগঞ্জ (চট্টগ্রাম : প্রবারণা পূর্ণিমা ২৫৩২, বাংলা ১৩৯৫)

ভদন্ত জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম রত্নচৈত্য* (তাইওয়ান : ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)

প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, *ভিক্‌খু পাতিমোক্‌খং* (কলিকাতা : ১৯৮৭)

জ্যোতি পাল স্থবির অনূদিত, *আচার্য্য শান্তিদেবের বোধিচর্যাবতার* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪)

বিমলাচরণ লাহা অনূদিত, *সৌন্দরানন্দ কাব্য* (কোলকাতা : ২০০৩)

বিশ্বনাগরিক অধ্যাপক ড. ধর্মকীর্তি ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্ন সম্ভার* (চট্টগ্রাম : ২০০৩)

সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর-নিকায়*, (চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম, অষ্টম, নবম নিপাত), (রাঙ্গামাটি : ২০০৫)

সাধনকমল চৌধুরী, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ২০০১)

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* প্রথম খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ বাংলা)

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ বাংলা)

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* তৃতীয় খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ বাংলা)

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ বাংলা)

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* পঞ্চম খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ বাংলা)

শ্রী ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনূদিত, *জাতক* ষষ্ঠ খণ্ড (কলকাতা : করুণা প্রকাশনী, ১৩৮৫ বাংলা)

ধর্মাধার মহাস্থবির, *শাসনবংশ* (কলিকাতা : ১৯৬২)

গোপলাদাস চৌধুরী এবং শ্রমণ পূর্ণানন্দ স্বামী অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯২৩)

ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *কথায় ধর্মপদ* (ঢাকা : অভয়তিষ্য প্রকাশনী, ১৯৬৮)

ড. সুকোমল চৌধুরী সম্পাদিত, *গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন*, ২য় সংস্করণ (কলিকাতা : ২০০৮)

ড. সুকোমল বড়ুয়া ও ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, পালি সাহিত্যে ধম্মপদ (ঢাকা : ১৯৯৭, বাংলা একাডেমি)

ড. জিনবোধি ভিক্ষু, *তথাগত বুদ্ধের বোধি-বিধি* (চট্টগ্রাম : বুডিস্ট রির্সাচ এন্ড পাবলিকেশন, ২০০৩)

পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, *মিলিন্দ প্রশ্ন* (কলিকাতা : ১৯৭৭)

ড. রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : ১৯৮০, বাংলা একাডেমি)

সাধনকমল চৌধুরী অনুদিত, *মিলিন্দপঞ্হ* (কলকাতা : ২০০১, করুণা প্রকাশনী)

শ্রীমতি রিস্ ডেভিডস্ অনূদিত, *বিভঙ্গ* (লন্ডন : ১৯০৪)

জ্যোতি বিকাশ বড়ুয়া, *গৌতম বুদ্ধ* (ঢাকা : অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ২০১৬)

ড. নীরু বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যে মানবাধিকার প্রসঙ্গ সমীক্ষা* (ঢাকা : ২০১৬, ঢা.বি.)

দিলীপ কুমার বড়ুয়া, *পালি ভাষার ইতিবৃত্ত* (ঢাকা : ২০১০, বাংলা একাডেমি)

সুকোমল বড়ুয়া ও সুমন কান্তি বড়ুয়া, *ত্রিপিটক পরিচিতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* (ঢাকা : ২০০০, বাংলা একাডেমি)

শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চাক্মা প্রনীত, *ত্রিরত্ন মঞ্জুরী* (চট্টগ্রাম : ১৯৭২)

শান্তিদেব, শিক্ষা সমুচ্চয়, রচনাকাল সপ্তম শতক।

আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্যদর্শন* (কলিকাতা : ১৯৫৩)

বিসি লাহা অনূদিত, *সাসনবংশ* (লন্ডন : ১৯৫২)

সম্পা : ই. হার্ডি সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৮৯৬)

টি. ডব্লিউ. রিস ডেভিডস্ ও জে. ইস্টলিন কার্পেন্টার সম্পাদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৮৯০)

ভি. ট্রেন্‌কনার সম্পাদিত, *মজঝিম নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৯৪৮)

শ্রীমতি রিস্ ডেভিডস্ সম্পাদিত, *বিভঙ্গ* (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৯০৪)

আরনোল্ড সি. টেইলর, সম্পাদিত, *পটিসম্ভিদামগ্‌গ*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৯৪৮)

হাঃ ও সিঃ *বিসুদ্ধিমগ্‌গ*, ৪১ খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৯৫০)

বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, *থেরী গাথা* (ঢাকা : ২০০৪)

বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী, *মধ্যম নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৯৩)

সুমঙ্গল বড়ুয়া, *বুদ্ধবাণীর মূলমন্ত্র* (ঢাকা : পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢা.বি., ২০১০)

ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৬১ বাংলা)

ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৬১ বাংলা)

শ্রীবিধূ শেখর শাস্ত্রী অনূদিত, *মিলিন্দ পঞ্‌হো* (বোলপুর : ১৩১৫ বাংলা

রিচার্ড মরিস সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৮৮৫)

হাঃ ও সিঃ *বিসুদ্ধিমগ্‌গ*, ৪১ খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৯৫০)

রবার্ট চালমার্স সম্পাদিত, *মজ্‌ঝিম নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৯৫১)

বীরেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, *অভিধর্মার্থ সংগ্রহ* (চট্টগ্রাম : নালন্দা নিবাস, ১৯৪০)

শ্রীমতি রিস্ ডেভিডস্ সম্পাদিত, *বিভঙ্গ* (লন্ডন : ১৯৬৪)

গোপেন্দ্র কুমার চৌধুরী অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ* (কলিকাতা : ১৯২৩)

ঞানমোলি ভিক্‌খু, *দি পাথ অফ পিউরিফিকেশন* (কান্ডি : ১৯৬৪)

Dhaka University Institutional Repository

রবার্ট চালমার্স সম্পাদিত, মজঝিম নিকায়, ২য় খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৮০৮)

টি. ডব্লিউ. রিস্ ডেভিডস্ সম্পাদতি, *দীর্ঘনিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৮৯০)

ভি ট্রেনকনর সম্পাদিত, *মজঝিম নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৯৪৮)

ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *থেরী গাথা* (কলিকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৩৫৭, বাংলা)

ভিক্‌খু জে. প্রজ্ঞাবংশ, (*দি*) *অভিধম্ম ফিলসফি* (সারনাথ : ১৯৪৩)

এহেরা, এন. আর. এম. *বিমুক্তিমগ্‌গো* (কলম্বো : ১৯৬১)

আরনোল্ড সি. টেইলর সম্পাদিত, *পটিসম্ভিদামগ্‌গো*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : ১৯০৫)

ই. হার্ডি সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : ১৮৯৬)

ঞানমোলি ভিক্‌খু, (*দি*) *পাথ অফ পিউরিফিকেশন* (কান্ডি : ১৯৭১)

শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র চাকমা প্রনীত, *ত্রিরত্ন মঞ্জুরী* (চট্টগ্রাম : ১৯৭৫)

জিওন আবে, *সজ্ঞেপখজোতনী সীল-ধুতঙ্গ* (পুনা : ১৯৮১)

সমঙ্গল বড়ুয়া ও বেলু রানী বড়ুয়া অনূদিত, *দ্বীপবংশ* (ঢাকা : ২০০৪)

সুকোমল চৌধুরী, *মহামানব গৌতম বুদ্ধ* (কলিকাতা : ১৯৯৫)

বীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, *আর্য্য-অষ্টাঙ্গিক-মার্গ*, বোধিসত্ত্ব বিহার (চট্টগ্রাম : ১৩২৮ বাংলা)

শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির অনূদিত, *উদান* (কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৩০)

সুমন কান্তি বড়ুয়া ও শান্টু বড়ুয়া, *জাতক সন্দর্শন* (ঢাকা : অ্যার্ডন পাবলিকেশন, ২০১১)

শ্রী শান্তিকুসুম দাশ গুপ্ত, *বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম এবং প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ* (কলিকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ১৯৯৮)

হেনরী ওয়ারেন ক্লার্ক সম্পাদিত, *বিসুদ্ধিমগ্‌গ* (লন্ডন : হার্ভার্ট ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৯৫০)

ভিক্‌খু জে. প্রজ্ঞাবংশ (*দি*) *অভিধম্ম ফিলসফি* (সারনাথ : ১৯৪৩)

রিচার্ড মরিস সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ১ম খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৮৮৫)

ই. হার্ডি সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : ১৮৯৬)

এহেরা, এন. আর. এম. *বিমুক্তিমগ্‌গো* (কলম্বো : ১৯৬১)

ভিক্‌খু জে প্রজ্ঞাবংশ, *পরমার্থশীল ধুতাঙ্গ অনুশীলন ও গৃহী কর্তব্য* (রাঙামাটি : কল্পতরু, ১৯৯৮)

শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত, সাধক প্রবাত চন্দ্র কর্তৃক অনুবাদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধসাধনা* (তাইওয়ান : ১৯৩৬)

হেনরী ওয়ারেন ক্লার্ক সম্পাদিত, *বিসুদ্ধিমগ্‌গ* (লন্ডন : হার্ভাট ওরিয়েন্টাল সিরিজ, ১৯৫০)

গোপেন্দ্র কুমার চৌধুরী অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ* (কলিকাতা : ১৯২৩)

রেবতপ্রিয় বড়ুয়া, *বিশুদ্ধি মার্গে বৌদ্ধতত্ত্ব* (ঢাকা : ১৯৯৩, বাংলা একাডেমি)

হা. ও সি. সম্পাদিত, *বিসুদ্ধিমগ্‌গো* (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৯৫০)

ই. হার্ডি সম্পাদিত, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ৩য় খণ্ড (লন্ডন : পি.টি.এস., ১৮৯৬)

বিধুশেখর ভট্টাচার্য, *মিলিন্দ পঞ্‌হো*, প্রথম ভাগ, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩১৫ বাংলা)

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, *যার যা ধর্ম* (ঢাকা : ঐতিহ্য প্রকাশনী, ২০০৯)

ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্মরত্নাকর* (রেঙ্গুন : ১৯৩৬)

সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সূত্তনিপাত* (রাঙ্গামাটি : ১৯৮৭)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *ছিন্নপত্রাবলী* (কলিকাতা : ১৮৯৪)

ধম্মজ্যোতি স্থবির ও নীলাম্বর বড়ুয়া, *খুদ্দকপাঠো* (কলিকাতা : ১৯৫৫)

শ্রীমৎ ধর্মদীপ্তি স্থবির সংকলিত '*বুদ্ধের জীবন ও বাণী*' (চট্রগ্রাম : ১৩৯৯ বঙ্গাব্দ)

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮০)

বেণীমাধব বড়ুয়া অনূদিত, *মধ্যমনিকায়*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : ১৯৪০)

মহম্মদ কাওছার উদ্দিন, *ধর্মীয় জীবন ও যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী* (ঢাকা : ২০০১)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৪০০)

ভদন্ত ধর্মতিলক থেরো ও রীরেন্দ্র মুৎসুদ্দি, *সদ্ধর্ম-রত্নাকর* (তাইওয়ান : ১৯৩৬)

ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্মরত্নাকর*, মহামঙ্গল সূত্র (রেঙ্গুন : ১৯৩৬)

ঈশান চন্দ্র ঘোষ, *জাতক*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৮৪ বাংলা)

ভিক্ষু শীলভাদ্র অনূদিত, *দীর্ঘনিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৬১)

Dhaka University Institutional Repository

প্রফেসর বাদল বরণ বড়ুয়া প্রফেসর সুমঙ্গল বড়ুয়া ও প্রফেসর ড. জিনবোধি ভিক্ষু, সম্পাদিত, *পারিবারিক সম্প্রীতি* (থাইল্যাণ্ড : , ধম্মকায় ফাউণ্ডেশন, ২০০৭)

স্থবির বিমলানন্দ, *সদ্ধর্মদীপিকা* (কলিকাতা : ১৯৩৬)

সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর নিকায়*, ১ম খণ্ড (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৪)

জিনবংশ মহাস্থবির, *সদ্ধর্ম্ম-রত্ন-চৈত্য* (তাইওয়ান : ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ)

ধর্মাধার মহাস্থবির, *ধম্মপদ* (কলিকাতা : বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা, ১৯৫৪)

ধর্মতিলক স্থবির, *সদ্ধর্মরত্নাকর*, মহামঙ্গল সূত্র (রেঙ্গুন : ১৯৩৬)

শ্রী বঙ্কীম চন্দ্র চাক্‌মা প্রনীত, *সদ্ধর্ম নীতি মঞ্জুরী* (চট্টগ্রাম : ১৯৭৫)

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *পালি সাহিত্যের ইতিহাস*, ২য় খণ্ড (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৮৮)

করুণানন্দ ভিক্ষু, *পালি সাহিত্যে নগর বিন্যাস ও নগর জীবন* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪)

আর্চায্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধদর্শনে সত্য-দর্শন* (কোলকাতা : ১৯৫৩)

ড. এম মতিউর রহমান, *বৌদ্ধ দর্শন : তত্ত্ব ও যুক্তি* (ঢাকা : জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৩)

রণব্রত সেন সম্পাদিত, *ধম্মপদ* (কলিকাতা : ১৯৮৮)

ড. মোঃ নুরুল ইসলাম, *সমাজকর্মের ধারণা ও তত্ত্ব* (ঢাকা : তাসমিয়া পাবলিকেশন, ২০১৩)

কৌসাম্বী সূত্র, মজ্‌ঝিম নিকায়, *সূত্র পিটক*।

রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, *কথায় ধম্মপদ*, প্রথম সংস্করণ (ঢাকা : অভয়তিষ্য প্রকাশনী, ১৯৬৮)

মহাপরিনিব্বাণ সুত্ত, *দীর্ঘনিকায়*, *সূত্রপিটক*।

সুত্তপিটক, দীর্ঘনিকায়, টীকা গ্রন্থ সুমঙ্গল বিলাসিনী, পুরাণো বজ্জিধর্ম দ্রস্টব্য।

সুমঙ্গল বড়ুয়া, *অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম খণ্ড* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯৪)

উ, ধম্মরতন, *গাইড থ্রু দি বিসুদ্ধিমগ্‌গ* (সারনাথ : ১৯৬৪)

শ্রমণ পূর্ণনন্দ, বিনয়াচার্য বংশদীপ, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ, ধর্মকথিক বুদ্ধরক্ষিত, সাধক প্রভাত চন্দ্র কর্তৃক অনুবাদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ ও বৌদ্ধসাধনা* (তাইওয়ান : ১৯৩৬)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনুদিত, *সংযুক্ত নিকায় (১ম ও ২য় খণ্ড)* (কলিকাতা : ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী ১৯৯৬)

Dhaka University Institutional Repository

ভিক্ষু শীলভদ্র কর্তৃক অনুদিত, *পবিত্র ত্রিপিটক, (চতুর্থ খণ্ড) সূত্রপিটকে দীর্ঘনিকায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড)* (রাঙামাটি : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইটি বাংলাদেশ, ২০১৭)

শ্রীমৎ বিমলানন্দ স্থবির সঙ্কলিত, *সদ্ধর্ম্ম-দীপিকা* (চট্টগ্রাম : ১৩৪৩ বাংলা)

ভদন্ত জ্ঞানালঙ্কার মহাথের, *ত্রিশরণ* (রাঙামাটি : মেয়েরেগা ফগদাঙি, ২০১০)

ড. ধর্মকীর্তি ভিক্ষু, *সদ্ধর্ম রত্ন সম্ভার* (চট্টগ্রাম : ২০০৩)

ড. রেবতপ্রিয় বড়ুয়া অনু. *বিশুদ্ধিমার্গ ভদন্তাচারিয় বুদ্ধঘোষ* (চট্টগ্রাম : ২০১৫)

পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক অনুদিত, *মিলিন্দ-প্রশ্ন*, পুণঃমুদ্রণঃ (কোলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০০৫)

ভদন্ত জ্যোতিপাল মহাথের অনুদিত, *পুগ্গল পঞ্ঞত্তি, পুদগল প্রজ্ঞপ্তি (মানব চরিত্রের স্বরূপ)*, (লাকসাম, কুমিল্লা : ১৯৬৩)

সূত্রপিটকে অঙ্গুত্তর নিকায়, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলাদেশ : ত্রিপিটক পাবলিশিং সোসাইট, ২০১৭)

প্রসূন বসু সম্পাদিত, *সৌন্দরানন্দম্* (কলিকাতা : ১৯৮০)

প্রফেসর বাদল বরণ বড়ুয়া ও প্রফেসর সুমঙ্গল বড়ুয়া অনূদিত, *পারিবারিক সম্প্রীতি* (চট্টগ্রাম : ২০১০)

শরৎ কুমার রায়, *বুদ্ধের জীবন ও বাণী* (কলিকাতা : ১৩৯৪)

শীলানন্দ ব্রহ্মচারী অনূদিত, *সংযুক্ত নিকায়*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা : ১৪০০ বাংলা)

কবি জ্যোতিঃপাল সম্পাদিত, *বুদ্ধবংস* (রেঙ্গুন : বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩৪)

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *সুত্তনিপাত* (বান্দরবন : ২০০৭)

শীলাচার শাস্ত্রী ভিক্ষু, *মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন* (চট্টগ্রাম : ১৯৭৮)

গোপালদাস ও শ্রমণ পুর্ণানন্দ স্বামী অনূদিত, *বিশুদ্ধিমার্গ* (কলিকাতা : ১৯২৩)

পালি-বাংলা অভিধান

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা : ২০০১, বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট)

Dhaka University Institutional Repository

শান্তরক্ষিত মহাস্থবির সংকলিত, *পালি-বাংলা অভিধান*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ২০০৮)

শীলরত্ন ভিক্ষু সম্পাদিত, *পালি-বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ২০০২)

বাংলা অভিধান

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সম্পাদিত, *সহজ বাংলা অভিধান* (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, ১৯৯৯)

জামিল চৌধুরী সম্পাদিত, *ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (ঢাকা : ২০১৩, বাংলা একাডেমি)

ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক সম্পাদিত, *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, (ঢাকা : বাংলা একাডিমি, ২০১৫)

পত্রিকা

নালন্দা, ১৭শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা (কলিকাতা : ১৯৮২), প্রবন্ধ, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী : বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গ, পৃ. ৩৯

দীপঙ্কর, বাংলাদেশ বুদ্ধিস্ট ফেডারেশন-এর মুখপত্র (ঢাকা : ২০০০), পৃ. ২৯

সৌগত পত্রিকা, ১৯তম বর্ষ, মে ২০১৬, পৃ. ১৯

English Books

V. Trenckner and R. Chalmers, *Majjhima Nikāya*, Vols. 3 (London: P.T.S., 1888-1902)

R. Morris and E. Hardy, *Aṅguttar Nikāya*, Vols. 5 (London: P.T.S., 1885-1900)

T. W. Rhys Davids, and J. Estin Carpenter, (ed.), *Dīgha Nikāya*, Vols. 3 (London: P.T.S., 1890-1911)

W. Stede (ed.), *Cūllaniddesa* (London: P.T.S., 1956)

L. Feer (ed.), *Saṃyutta-Nikāya*, Vols. 5 (London: P.T.S., 1884-1898)

D. Andersen and H. Smith (ed.), *Sutta-Nipāta* (London: P.T.S., 1913)

Wilhem Geiger (ed.), *The Mahāvaṃsa* (London: P.T.S., 1958)

Dhaka University Institutional Repository

L. de La Valle Poussin and E. J. Thoman (ed.), *The Niddesa* (London: P.T.S., 1916)

Herman Oldenberg (ed.), *Vinaya Pitaka*, Vols. 5 (London: P.T.S., 1879-1883)

Henry Clarke Warren and Dhamanada Kosambi, *Visuddhimagga of Buddhaghosācariya*, (Massachuestts: 1950)

Mrs. Rhys Davids, *Buddism: A study of Buddist Norm*, Williams & Norgate, (London: 1912)

Nyanatiloka, (*The*) *Buddha's path to Deliverence* (Colombo: The Buddha Shahitya Sabha, 1959)

Dipak Kumar Barua, (*An*) *Analytical Study of the Four Nikayas* (Calcutta: Rabindra Bharati University, 1971)

Mrs Rhys Davids, *Buddhism*: *A Study of the Buddhist Norm* (London: William and Nogate, 1966)

Sumongal Barua, *Buddhist Councils and Development of Buddhism*, (Calcutta: Atisha Memorial Publishing Society, 1997)

Rebirth Smitheram Translated, The Five Precepts (USA : 2011)

Kanai Lal Hazra, *Pali Language and Literature*, Vol.i (London : 1994)

Narada Thera, *The Buddhist and His Teachings* (Colombo: 1973)

Kanai Lal Hazra, *Pali Language and Literature*, Vol.ii (London : 1994)

B C Law, *A History of Pali Literatuer*, Vol. 1 (Delhi: 1983)

Dr. Herman Oldenberg, *Buddha His Life His Doctrin, His Order* (Delhi: 2013)

Bela Bhatachary, *Facts of Early Buddhism* (Calcutta: 1995)

Bhikkhu Nanamali, *The Path of Purification* (SSBMC: 1956)

Dhaka University Institutional Repository

Petter Harvey, *An introduction to Buddhist Ethics* (Cambridge: 2000)

T. W. Rhys Davids, *Buddhism* (London: 1910, P.T.S.)

Trasnlated By various Oriental Scholars and edited By F. Max Mullar, *The Sacred Book of the East* (Delhi: 1989)

K. Shri Dhammananda, *Buddhism in the eyes of Intellectuals* by, The Corporate Body of Buddha Educational Foundation (Taiwan: 2006)

Armando T. Morales, Bradford W. Sheafor, *Morals and Sheafor* (Colorado State University: 1986, Reprient 2004

Encyclopedia

Husting's, *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Vols. Vi.

English Dictionary

Oxford English dictionary, United Kingdom, (Oxford University Press: 1884)

Alan Spooner, *Oxford Dictionary Of Synonyms & Antonyms* (Oxford University Press: 1999)

Davids, Rhys and Stede, W. ed., *Pali-English Dictionary* (London: Pali Text Society, 1925)

Internet

http://kalpataruboi.org

http://www.web.singnet.com.sg/˜alankhoo/precepts.html

Tripitaka-bangla.blogspot.com

http://www.angelfire.com/indie/ann_ionesl/sila.html

https://m.facebook.com>phots

https://nirvanapeace.com>vinaya-pitaka